নিরীক্ষা

ডিসেম্বর ২০২১

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৭তম সংখ্যা

সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

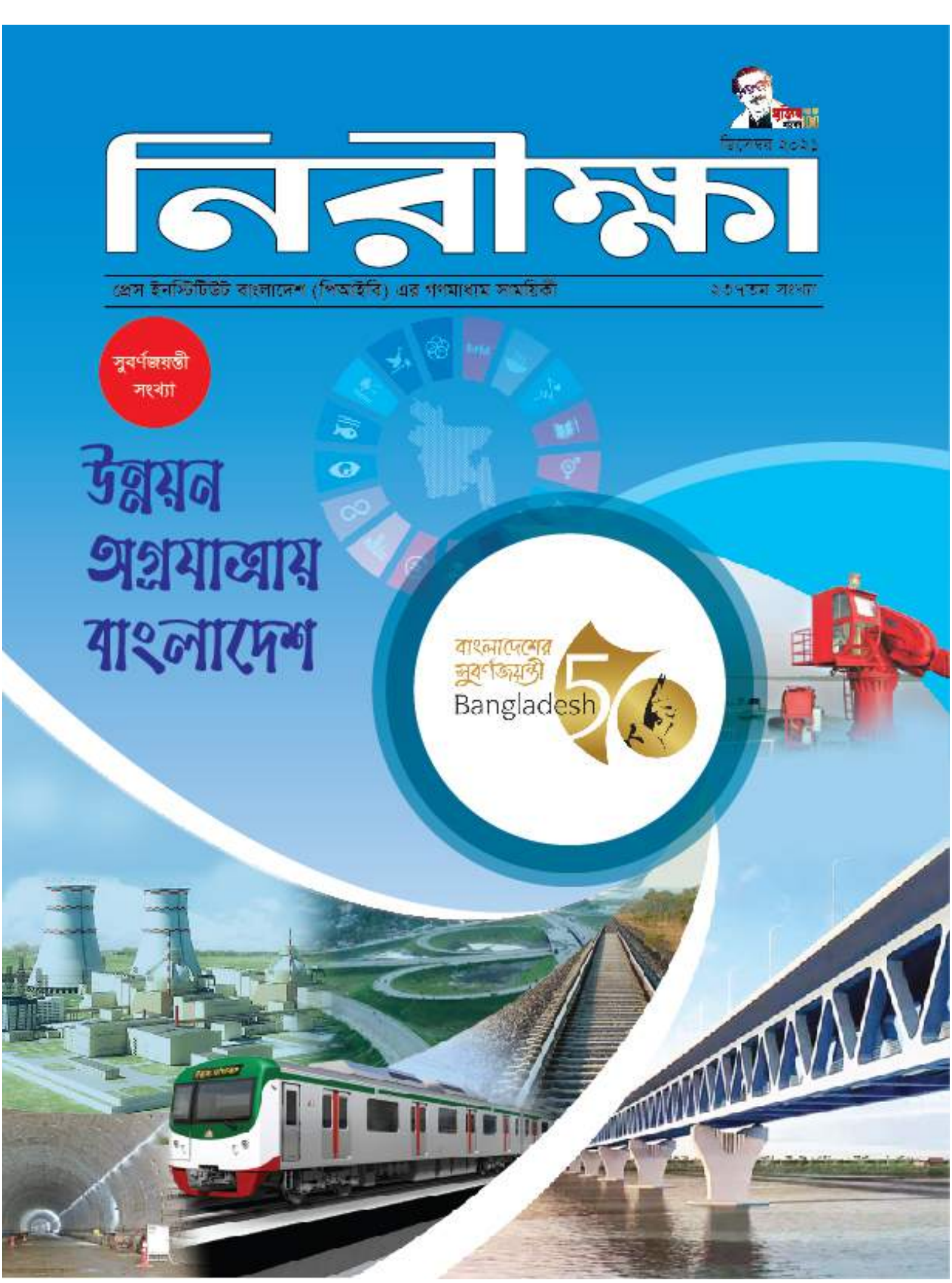

নিরীক্ষা

২৩৭তম সংখ্যা: ডিসেম্বর ২০২১ (বিশেষ সংখ্যা)

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ। ১৯৭১ থেকে ২০২১–এই দীর্ঘ যাত্রাপথে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজকের বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। একই সঙ্গে জাতি উদ্‌যাপন করছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এই দীর্ঘ যাত্রার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-প্রত্যাশার বিশ্লেষণ চলছে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন অঙ্গনে। পাকিস্তান নামক ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের শৃঙ্খল থেকে বাঙালির আরাধ্য পুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ ২৩ বছরের কঠিন ত্যাগ ও প্রাণপণ সাহসী সংগ্রাম, আর সেই সংগ্রামের স্মৃতি আজ আমাদের চেতনায় দেদীপ্যমান। যুবনেতা শেখ মুজিব বুঝেছিলেন পাকিস্তানের অধীনে থাকা স্বাধীনতায় বাংলার মানুষের মুক্তি মিলবে না। তাই সেই '৫৪, '৬৬, '৬৯ আর '৭০-এর ধারাবাহিক স্বাধিকারের সংগ্রাম এসে উপনীত হয় একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে।

যে কঠিন মূল্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। একদিন যারা 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে অপমানের অপচেষ্টা করেছিল, আজ তারাই বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে দেখার জন্য স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোকে পরামর্শ দিচ্ছে। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন–তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসাবে দেখতে চান। এই আগ্রহের অভিষেকও ঘটেছিল তাঁরই হাত ধরে। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এগিয়েছিলও অনেক দূর। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সেই স্বপ্নকেও হত্যা করে। প্রায় ২১ বছর অবহেলা-বঞ্চনার পর বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে দেশকে এগিয়ে নিয়েছেন শত বাধায়, কখনো জীবন শঙ্কায়। তাঁর হাতেই দেশ রূপান্তরিত হয়ে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মূল্যায়ন–'একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য জোরদারে সাহায্য করেছে। আর সেটি হলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। দেশটির ঊর্ধ্বমুখী বাঁকবদলে তিনি একটি আবশ্যকীয় অবদান রেখেছেন। ৫০ বছরের ট্র্যাক রেকর্ডের দেশটির কর্মচঞ্চল অর্থনীতি এই সফলতারই সাক্ষ্য।'

বিশেষ করে গত ১৩ বছরে বাংলাদেশের নানা সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, কর্ণফুলি বহুমুখী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্পগুলোও। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী ও প্রসারিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা প্রতিবেশী দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলাম; আর এখন বাংলাদেশই হয়ে উঠেছে শরণার্থীদের আশ্রয়দাতা। বিদ্যুদায়ন, গ্রামীণ সড়কের ঘনত্ব, শিল্পায়ন, গৃহায়ন, নগরায়ণ, ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার, দারিদ্র্যবিমোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পঁচাত্তরের পর বিচারহীনতার রাজনীতি সমাজকে নানাভাবে কলুষিত করেছিল। জাতির পিতা হত্যার বিচারই হবে না–সংবিধানেও এমন ধারা সংযোজিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সাজা পেয়েছে। শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দৃশ্যমান অর্জনও করেছে। সহজ করে বললে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

আজ আমাদের গর্ব–উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি; বিজয় দিবস তার পূর্ণতার স্মারক। বাঙালি জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গৌরব করবে, অহংকার করবেই। এসব কারণে বিজয় দিবসের এই ক্ষণে পিআইবির প্রকাশনা 'নিরীক্ষা' সাজানো হয়েছে ৫০ বছরের সাফল্যের অগ্রযাত্রা নিয়ে। আশা করি, এই সংখ্যাটি পাঠক ও গবেষকদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আগামীর পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ–এই প্রত্যাশায়।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূচিপত্র

আমরা পথ হারাব না ৩
আবেদ খান

একুশ সালের বাংলাদেশ ৬
মোস্তাফা জব্বার

গণমাধ্যম এখন সবার নিয়ন্ত্রণে! ১৯
অজয় দাশগুপ্ত

স্থানীয় সরকার প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ ২৪
তোফায়েল আহমেদ

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: গণমুখী নেতৃত্বের পরম্পরায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ২৮
ড. আতিউর রহমান

সুবর্ণ সময় সুবর্ণজয়ন্তী ৩৬
মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বিজয়ীবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে ৩৯
স্বদেশ রায়

৫০ বছরে আইনের জগতে উত্থানপতনের ইতিহাস ৪৩
বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছরের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ৪৭
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিশ্বে অনুকরণীয় ৫২
ড. আর এম দেবনাথ

সৌরভ, গৌরব আর অহংকারের বাংলাদেশ ৫৫
আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা: বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা ৫৮
অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতের ৫০ বছর ৬৩
মোল্লাহ আমজাদ হোসেন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং আমাদের ব্যাংকিং খাত ৬৮
নিরঞ্জন রায়

৭৩ **পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি**
আলী হাবিব

৭৭ **আমাদের ক্রীড়াঙ্গন ও বঙ্গবন্ধু পরিবার**
পবিত্র কুন্ডু

৮১ **নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতাভিত্তিক অগ্রযাত্রা**
ইয়াসমীন রীমা

৮৫ **পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত শূন্য থেকে বঙ্গভ্যাক্সের যুগে**
অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

৮৭ **পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্য**
প্রণব মজুমদার

৯৩ **৫০ বছরে শিক্ষার রূপ-রূপান্তর**
ড. মিল্টন বিশ্বাস

৯৭ **বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতে ৫০ বছর**
রাজন ভট্টাচার্য

১০৪ **বিজয়ের ৫০ বছর: গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিক**
রীতা ভৌমিক

১০৮ **বিজয়ের ৫০ বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ**
মোতাহার হোসেন

১১১ **সুবর্ণজয়ন্তীতে অনন্য উচ্চতায় টেলিভিশন সাংবাদিকতা**
মিনহাজ উদ্দীন

১১৩ **মেগা প্রকল্প নিয়ে নতুন উচ্চতায় বাংলাদেশ**
পপি দেবী থাপা

১১৮ **দ্বার খোলার অপেক্ষায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু**
দুলাল আচার্য

১২২ **মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ সাময়িকীপত্র**
জাফর ওয়াজেদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

প্র ব ন্ধ

আমরা পথ হারাব না

আবেদ খান

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জন জাতিকে তার বহুল কাঙ্ক্ষিত একটি সার্বভৌম দেশ, স্বাধীন জাতিসত্তা, একটি সংবিধান, নিজস্ব মানচিত্র ও একটি পতাকা উপহার দিয়েছে। আর আজ বিজয়ের ৫০ বছরে পদার্পণ করে যাকে প্রথমেই স্মরণ করতে হয়, যাকে ছাড়া অধরাই থেকে যেত বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন, মুক্তির স্বপ্ন–তিনি হলেন বাঙালি জাতির কান্ডারি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বিশ্বের চিরবিস্ময়–আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ইতিহাস, সৃষ্টি হয়েছে গাঙ্গেয় বদ্বীপের একটি বিশাল জাতির জন্মগাথা। এই একটি মানুষ, যার কর্মজীবনের প্রতিটি স্তরে রচিত হয়েছে এক মহান মুক্তিসংগ্রামের অমর পঙ্‌ক্তিমালা। বাঙালির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান ছিল না, কখনো তার আত্মপরিচয়ের ইতিহাস ছিল না। এই মহান মানুষটি এই জাতির অপ্রাপ্তির যাতনার অবসান ঘটিয়েছেন। অথচ পঁচাত্তরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ভেবেছিল বাংলাদেশের হৃদয় থেকে তাঁর নাম চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; একাত্তরে পরাজিত শক্তির করতলে আবার দেশটাকে নিপতিত করবে। কিন্তু সত্য এটাই যে–যতই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততই তিনি অধিকতর ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পরিব্যাপ্ত হচ্ছেন। তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর জাদুকরী সাংগঠনিক ক্ষমতা, তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য সারা জীবনের সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে একটি জাতিকে শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন–সেই ইতিহাস, সেই অমর কীর্তিকে ঘাতকরা কি মুছে দিতে পেরেছে? বরং সেই দেশটিই আজ পৃথিবীর বিস্ময়, ৫০ বছরে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ পুরো বিশ্বকে সম্মোহিত করে এগিয়ে চলেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ করি, এটা পরিষ্কার যে–এ অর্জনের পেছনে রয়েছে বাঙালির দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ২৩ বছর বৈষম্যে জর্জরিত হয় পূর্ব পাকিস্তান নামের এই ভূখণ্ডটি। আমরা দেখতে পাই–বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে বীজ প্রোথিত হয়েছিল, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় হিংস্র পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বহুল কাঙ্ক্ষিত বিজয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৪৮ সাল থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে আসে একাত্তর। ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে জাতির পিতার সেই উদাত্ত কণ্ঠের উচ্চারণই ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির চূড়ান্ত উচ্চারণ, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

আজ স্বাধীনতার ৫০টি বছর পেরিয়ে যদি একটু ফিরে দেখি কেমন ছিল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ও ব্যবচ্ছেদ, তাহলে সহজেই দেখা যাবে স্বাধীনতার ৫০ বছর একটি দীর্ঘ সময় মনে হলেও এ দেশটি তার বেশির ভাগ সময়ই অতিবাহিত করেছে সামরিক ফন্দিবাজ, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি, সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় মৌলবাদ আর ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতাপে। বিশেষ করে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরেই এ জাতির জীবনে নেমে এসেছিল এক দীর্ঘ অমানিশার কৃষ্ণবিবর। যারা পরবর্তী সময়ে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে নেতৃত্ব দেবেন, আমরা সেই জাতীয় চার নেতাকেও হারিয়ে ফেললাম। নির্মমভাবে জেলখানার মধ্যে তাঁদেরকে হত্যা করা হলো। বঙ্গবন্ধুকন্যাদ্বয়কে দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি, পরদেশে ভেসে ভেসে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়েছে। সেখানেও তাঁদেরকে হত্যার নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, 'বিশ্ব বেহায়া'র দীর্ঘ সামরিক স্বৈরশাসন। পাকিস্তানের চর রাজনীতিকে যিনি জটিল করে দেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন; দেশটাকে আবার পাকিস্তানের আদলে তৈরি করে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার মিশন নিয়েছিলেন; শত শত মুক্তিযোদ্ধা আর্মি অফিসারকে বিচারের নামে প্রহসন করে হত্যা করেছিলেন–সেই জিয়াউর রহমানের নির্মমতা ও অমানবিকতারও সাক্ষী আমরা। আমরা এ-ও দেখি–এই স্বাধীন বাংলাদেশে একাত্তরের পরাজিত মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তিকে নানাভাবে পুনরুজ্জীবিত করা, তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারের অংশীদার করা। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও জামায়াত-হেফাজতের তাণ্ডব দেখেছে দেশব্যাপী। অর্থাৎ দেশটাকে যারা মেনে নেয়নি, সেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির হাতেই পরিচালিত হয়েছে সুদীর্ঘকাল। এতৎসত্ত্বেও আজ আমরা যে দেশটিকে নিয়ে গর্ব করছি, সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি, যে অভাবিত উন্নতির জন্য পুরো বিশ্ব উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, একে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পথটি কি বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের জন্য এত সহজ ছিল?

অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত যে দেশটিকে বঙ্গবন্ধু ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলতে দিনরাত পরিশ্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় করলেন; জাতিসংঘ, ওআইসিসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্যপদ অর্জন যখন বাংলাদেশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিচিতি এনে দিল, তখনই বঙ্গবন্ধুকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হলো। তারপর দীর্ঘকাল দেশটি কানাগলিতে ঘুরপাক খেয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে চরে। তা সত্ত্বেও সময়ের পরিক্রমায় যখন আবার দুষ্টচক্রের হাত থেকে মুক্ত করে দেশটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির হাতে এসে পৌঁছেছে, তখন বঙ্গবন্ধুর দেওয়া রূপরেখা ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকের বাংলাদেশকে পেয়েছি; যেই দেশটি দুর্বার গতিতে নিরলস ছুটে চলেছে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে।

৫০ বছরের পথচলার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি আসলে কী? সুদূরপরাহত বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, রাজাকারের বিচার এই বাংলায় 'দেখে যেতে পারব কি না' বলে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর–সেটা সম্ভবপর হয়েছে; যা বাঙালি জাতিকে তার ইতিহাসের দায় ও কলঙ্ককে কিছুটা হলেও মোচন করেছে। যে দেশটিকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে পরিহাস করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার, সেই দেশটিই আজ তাদের কপালে ভাঁজ ফেলে দেওয়ার মতো সফলতা অর্জন করেছে। আধুনিক কৃষি, তৈরি পোশাক, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনীতি, রেমিট্যান্স, গড় আয়ু, আমদানি, রপ্তানি, রিজার্ভ, মাথাপিছু আয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার, নারী শিক্ষা, কলকারখানায় উৎপাদনসহ অনেক সূচকে এখন বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে। দেশে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। একসময় বৈদেশিক অর্থ তথা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির অর্থ ছাড়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যেত না। এখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে। সারা দেশের হাজার হাজার মাইলের মহাসড়ক নির্মাণ-সংস্কার, মেট্রোরেল, টানেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, রূপপুর পারমাণবিক প্ল্যান্ট, ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন, রেল উন্নয়ন, নৌপথ তৈরি, নাগরিকদের জন্য প্রায় শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত ছাড়াও সীমাহীন উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সুবিধা পাওয়া যায়। সামাজিক অনেক সূচকে বাংলাদেশ পাশের দেশ ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। কীভাবে দেশের এই অভাবিত উন্নতি ঘটেছে, তা শেখ হাসিনার বিগত বছরগুলোর কর্মযজ্ঞের দিকে তাকালেই চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্যস্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষিবিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরি, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। তাঁকে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের কারণে উন্নয়নের সেই গতি থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন-২০২১', 'ভিশন-২০৪১' এবং শতবর্ষ মেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' গ্রহণ করেছেন। এসব পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলি বহুমুখী টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য।

জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশকে অভিভাবকশূন্য করে মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণহীন চেতনার যে রাষ্ট্র-দর্শন, একেও হত্যা করার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। দেশটাকে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এর বিষদাঁত আজও বাংলাদেশকে খুবলে খাচ্ছে! বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনকালে যেসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এত বছর পেরিয়েও দেশে-বিদেশে আজও অনুরূপ ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকন্যাকেও। জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় বলেছিলেন:

'আজকে আমার একটিমাত্র অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে, আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, যুদ্ধ করতে হবে শত্রুর বিরুদ্ধে। আজকে আমি বলব বাংলার জনগণকে এক নম্বর কাজ হবে দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করতে হবে।...আমি গ্রামে গ্রামে নামবো। এমন আন্দোলন করতে হবে যে, যে ঘুষখোর, যে দুর্নীতিবাজ, যে মুনাফাখোর, যে আমার জিনিস বিদেশে চোরাচালান দেয়, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।...আপনারা সংঘবদ্ধ হন। ঘরে ঘরে আপনাদের দুর্গ গড়তে হবে। সে দুর্গ করতে হবে দুর্নীতিবাজদের খতম করার জন্য, বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের দুঃখমোচন করার জন্য।'

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিধ্বস্ত করা, বাঙালি চেতনাকে বিনষ্ট করা, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বোধকে মূলোৎপাটন করার যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের সূচনা করা হয়েছিল, যেই অন্ধকার গ্রাস করেছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্নের দেশমাতৃকাকে ঘিরে, সেই ষড়যন্ত্র কিন্তু আজও থেমে যায়নি। তারা যে আজও সোচ্চার এবং সময় ও সুযোগ পেলেই যে ঘাড় মটকাবে, তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। তারপরও ৫০ বছর পর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই ক্ষণে এ কথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে–বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের পথেই আছে বাংলাদেশ; যার জন্য তিনি জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন, 'রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব!' প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।' রক্ত দিয়েই ঋণ শোধ করেছিলেন তিনি আর তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের গুরুভার তাঁরই সুযোগ্য কন্যা কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং সব ষড়যন্ত্র ও অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে 'মুক্তির দূত' হয়ে জাতির মুক্তির সূর্যকে ঠিকই ছিনিয়ে আনবেন–এ বিশ্বাস এখন বাংলার মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত।

লেখক: সম্পাদক ও প্রকাশক, দৈনিক জাগরণ

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্র ব ন্ধ

একুশ সালের বাংলাদেশ

মোস্তাফা জব্বার

বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন বা বাংলা ভাষাভিত্তিক একমাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরে ২০২১ সালে আমরা কোথায় আছি, সেটি মূল্যায়ন করার চেষ্টা আমাদের সবার মাঝেই আছে। হেনরি কিসিঞ্জার যে দেশটাকে তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ বলেছিল, সেই দেশটা বিদেশি আগ্রাসন-দখলদার এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে কোথায় এখন দাঁড়িয়ে আছে, সেটি জানতে চাই আমরা। পাকিস্তানের আগের কাহিনি বা হিসাবনিকাশ আমাদের কাছে তেমনভাবে নেই। ওরা যে সোনার বাংলার সম্পদ লুট করেছে, তা আমরা জানি। পাকিস্তানিরাও লুটেরা ছিল। ছিল শোষক, ঘাতক, নির্যাতনকারী, অত্যাচারী, সাম্প্রদায়িক ও নৃশংস শাসক। মনে রাখা দরকার, এই ৫০ বছরের ২৯ বছর বাংলাদেশের পাকিস্তানিরা দেশটা শাসন করেছে এবং এই দেশটাকে পাকিস্তান বানানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনা দেশটি পরিচালনা করেছেন মাত্র ২১ বছর সাত মাস। স্বাধীনতা অর্জনের অর্ধেকেরও কম সময়। আমরা এই সময়ে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ মিস করার পর বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার হাত ধরে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে শরিক হওয়া এবং শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত ধরে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ডিজিটাল যুগে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গাটাও একটু আলোচনা করব।

অর্থনীতি

আমাদের অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'বর্তমান সরকার আগামী ৫ বছর ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে এশিয়ার পঞ্চম টাইগারে

পরিণত হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেক বেশি। আমরা গত ১০ বছর করোনার আগ পর্যন্ত অসাধারণ গতিশীলতায় এগিয়েছি। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চারটি দেশকে এশিয়ান টাইগার ধরা হয়। তারা ৬, ৭, ৮ এই অনুপাতে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আর আমরা একই ধারাবাহিকতায় ৬, ৭, ৮-এ চলে গেছি। আমরা যদি আর ৫ বছর থাকি, তাহলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসাবে আসতে পারব।'

২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটের আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ বছরে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫৯ বছর। বর্তমানে প্রায় ৭৩ বছর। এখন শিশুমৃত্যুর হার কমে প্রতি হাজারে ৮৪ থেকে ২৮ এবং মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ৩৭০ থেকে ১৬৫ জনে দাঁড়িয়েছে। ওই সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭৩ কোটি টাকা। এই খাতে চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪ হাজার ৯০০ মেগাওয়াট থেকে ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৪৭ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার দাঁড়িয়েছে ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার ৩৩ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫.৫৭ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছর বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করবে বলে আশা করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮-০৯ বছরের ৭ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে এ হার প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে প্রথম।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ ধাপ।

ইতোমধ্যে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। টেকসই উত্তরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, দেশব্যাপী ডিজিটাল সংযুক্তি, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পসহ বেশকিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। এগুলোর কোনোটা চালু হয়েছে এবং কিছু আগামী বছর চালু হবে। এছাড়া সারা দেশে একশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দুই ডজনের বেশি হাই-টেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। কাজ চলছে তৃতীয় সাবমেরিন কেবল ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এবং দেশব্যাপী মোবাইল ও ওয়াই-ফাই সংযোগের।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান: আসুন দেখে নিই ২০২১ সালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন দেশ কেমন আছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ।

জাতীয় আয়: বাংলাদেশের ৪১ হাজার ৮০ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানের ২৯৬ বিলিয়ন ডলার। এটি তুলনাযোগ্য নয়। মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের ২ হাজার ৫৫৪ ডলার, পাকিস্তানের ১ হাজার ৫৪৩ ডলার। প্রায় অর্ধেক।

রপ্তানি আয়: বাংলাদেশ ৩৭৮৮ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তান ২৫৬৩ বিলিয়ন ডলার।

এক দশকে গড় প্রবৃদ্ধি: বাংলাদেশে শতকরা ৬.৭৬, পাকিস্তানের শতকরা ৩.৯৬।

দারিদ্র্যের হার: বাংলাদেশে ২০.৫, পাকিস্তানে ৩৯.২০ (প্রায় দ্বিগুণ)।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ: বাংলাদেশে ৪৮ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানে ২৪ বিলিয়ন ডলার। একদম দ্বিগুণ।

মুদ্রামান: বাংলাদেশের এক টাকা সমান পাকিস্তানের ২ টাকা ৬ পয়সা।

গড় আয়ু: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭৩ বছর আর পাকিস্তানের ৬৭ বছর।

শিশুমৃত্যু: পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে হাজারে ২৫ জন, পাকিস্তানে প্রতি হাজারে মারা যায় ৫৯ জন।

শিশুশিক্ষা: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষ করছে ৯৮ শতাংশ শিশু, পাকিস্তানে ৭২ শতাংশ।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক পরামর্শ সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল (ডব্লিউইএলটি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে জিডিপির আকারের ভিত্তিতে বৃহৎ অর্থনীতির দেশের তালিকায় ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের অবস্থান ৪৪তম।

বাংলাদেশ ও ভারত: আগামী ৫ বছর মাথাপিছু জিডিপিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশ। বেশকিছু সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ এখন ভারতের চেয়ে এগিয়ে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রীলংকাকে ঋণ দিয়েছে এবং সোমালিয়াকে দেওয়া ঋণ মওকুফ করে দিয়েছে। খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, ভারতের সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রামানিয়ান বলেছেন, কয়েক দশক ধরে এই বাংলাদেশ ছিল অবজ্ঞার পাত্র; কিন্তু এখন আর নয়। এটি এখন উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল মডেল। দেশটির যেভাবে জন্ম হয়েছে, এর কাছ থেকে দেশগুলোর অনেক কিছু শেখার আছে।

দারিদ্র্য: দরিদ্র দেশ হিসাবেও বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের একসময় একটি পরিচয় ছিল। বিশ্বের মোট দরিদ্র জনসংখ্যার ৩ দশমিক ৩২ শতাংশ মানুষ বাস করত এই বাংলাদেশেই। তবে দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে গত ১৩ বছরে। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত সাড়ে ৮২ শতাংশ মানুষ। ১৯৯১ সালে এই হার ছিল ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ। আর ২০১০ সালে এই হার কমে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৮ সালের জুন শেষে এই হার ছিল ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। ২০১৯ সালের জুন শেষে দেশের দারিদ্র্যের হার সাড়ে ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। এদিকে একই বছর জুন শেষে অতি দারিদ্র্যের হার নেমেছে সাড়ে ১০ শতাংশে। এর এক বছর আগে এই হার ছিল ১১ দশমিক ৩ শতাংশ।

এই বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। এগিয়ে নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা: কিছুদিন আগে স্নেহভাজন রেজা সেলিম আমার কাছে একটি লেখা পাঠিয়েছে। লেখাটি তার নিজের। এটি ২০১৮ সালের ৫ জানুয়ারি বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকায় ছাপা হয়। লেখাটি পড়ে এবং এর প্রকাশনার তারিখ দেখে অনুভব করেছি–আমি ২০১৮ সালের ২ জানুয়ারি মন্ত্রী হিসাবে প্রথম শপথ নেওয়ার পর রেজা সেলিম এটি লিখেছে। ওই লেখাটিরই সংশোধিত রূপ একই পত্রিকায় ১০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। আমাকে লেখাটি এতদিন পর পড়তে

বলার প্রধান কারণ আমি বুঝেছি যে রেজা সেলিম এখন জানতে চায় একুশ সালে কতটা পথ এগিয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণাকালে ২০২১ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নির্বাচনি ইশতাহার লেখার সময় ৬ ডিসেম্বর এই ঘোষণাটি ইশতাহারে যুক্ত করি, সেটি ১১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত হয় এবং এর পরদিন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

রেজা সেলিমের লেখা, "২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর দিনবদলের সনদ যেদিন ঘোষণা করা হলো, ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলা হবে, এই কথা শুনে সেদিন আমরা কী বুঝেছিলাম? নিশ্চয়ই এই রূপকল্পের কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো সে ঘোষণায় ছিল না বা শেখ হাসিনা কিছু না বুঝেই এই স্বপ্নের কথা তার ভোটের অঙ্গীকারের অংশ করে নেননি। কিন্তু আমরা যারা বহুদিন ধরে তথ্যপ্রযুক্তির সীমাহীন সম্ভাবনার স্বপ্নের জগতে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, আমরা ভেবে নিলাম এখন সরকার যদি এ কাজে সত্যি সত্যি সচল হয়, আমাদের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেবে, সেখানে আপাতত কোনো রূপের কাঠামো থাকুক বা না থাকুক।

> রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশের এতটা পথ আসা সম্ভব ছিল না। শেখ হাসিনার সেই অঙ্গীকারটুকু আছে বলেই আজ যথাসময়ে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত

যে স্বপ্নের জগতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তা মোটেও অবাস্তব ছিল না। এই স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছেন মোস্তাফা জব্বার, সেই আশির দশকে যখন বাংলা হরফে কম্পিউটারে লেখা শুরু করলেন। এর পরে যুক্ত হলেন কম্পিউটার জগতের কাদের ভাই, আর অগ্রজ সাংবাদিক নাজিমউদ্দিন মোস্তান, যারা এই স্বপ্নকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিলেন গরিবের জন্য প্রযুক্তির সেবা হিসাবে। তাদের এই সৃজনশীল অনুপ্রেরণায় আমরা ভাবতাম–এই দেশের সবাই একদিন ডিজিটাল প্রযুক্তির সেবা পাবে। আমরা ভাবতে শুরু করলাম কেউ যদি কম্পিউটার না-ও কিনতে পারে, সে অবশ্যই কম্পিউটার কী কী কাজ করে তা বুঝতে পারবে এবং তার ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করতে পারবে। একজন দরিদ্র কৃষক বা দিনমজুর পিতামাতার পক্ষে সে সময় ৪০-৫০ হাজার টাকা খরচ করে কম্পিউটার কিনে দেওয়া অসম্ভব ছিল (এখনো অনেকের পক্ষে তা অসম্ভব)। কিন্তু আমরা যদি গ্রামে গ্রামে এমন ব্যবস্থা করে নিতে পারি যে, সবাই কম্পিউটার দেখতে, ছুঁয়ে দেখতে ও ব্যবহার শিখে নিতে পারবে। তাহলে ঘরে ঘরে কম্পিউটার পরিচিত হবে ও একটি প্রজন্ম জীবনের শুরু থেকেই এই প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত হবে। ২০০৮ সালে যে শিশুর বয়স পাঁচ বছর, ২০২১ সালে তার বয়স হবে ১৮। মাঝখানের এই ১৩ বছরে তাদের পাশাপাশি যাদের বয়স প্রতিবছর পাঁচ হবে, তাদের হালশুমারি হাতে রেখে ক্রমে ১২, ১১, ১০, ৯ করে কমিয়ে এনে ২০২০-২১ সালে আমরা গ্রামের ছেলেমেয়েদের কোথায় পৌঁছে দিতে পারব, ভেবে কয়েকটি রাত ঘুমাতে পারিনি।

একদিন এসব শুনে মোস্তাফা জব্বার ভাই উৎসাহ দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিয়েই এই স্বপ্ন বাস্তব করতে হবে। তুমি লেনিনের অফিসে আসো, আমরা সব প্ল্যান ঠিক করে নিই'।"

রেজা সেলিম একদম সঠিক পথের ঠিকানার কথাই বলেছে। সেদিন তো বটেই, আমি বলি রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশের এতটা পথ আসা সম্ভব ছিল না। শেখ হাসিনার সেই অঙ্গীকারটুকু আছে বলেই আজ যথাসময়ে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত।

রেজা সেলিম আমাদের গ্রাম নিয়ে কাজ করে। কুমিল্লার মানুষ বাগেরহাটের রামপালের শ্রীফলতলা তার কাজের এলাকা। তার লেখায় আছে ২০০৯ সালের ২-৩ অক্টোবর সে ডিজিটাল বাগেরহাট প্রতিপাদ্য নিয়ে শ্রীফলতলায় জ্ঞানমেলার আয়োজন করে। আমি সেই মেলায় অংশ নিই। এর পরেও প্রায় প্রতিবছরই আমি অংশ নিয়েছি।

এরপর সে লিখেছে: 'বাগেরহাট প্রেস ক্লাবের সদস্যরা ডিজিটাল বাংলাদেশে সংবাদকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে একটি সেমিনার করে। আরেকটি সভা হয় তাদের উদ্যোগে শুধুমাত্র মোস্তাফা জব্বারকে নিয়ে 'মোস্তাফা জব্বার সন্ধ্যা'। সেখানে স্থানীয় সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অনেক সাধারণ মানুষ মোস্তাফা জব্বারের সঙ্গে আড্ডা দেন। আর তার সারা জীবনের কাজ বিশেষ করে কম্পিউটারে বাংলা অক্ষরবিন্যাস, বিজয় কীবোর্ড–এসব নিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চান। বাগেরহাটের সেই উৎসবে পুলিশের এসপি ও র‍্যাবের আঞ্চলিক কর্মকর্তাসহ অংশ নেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও। সাধারণ মানুষের কাছে একটি সেমিনারে তারা তুলে ধরেন–ডিজিটাল বাংলাদেশে তাদের ভূমিকা কী হবে, কেমন করে অপরাধ দমনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার হবে। জেলা প্রশাসন এই আয়োজনে ব্যাপক সমর্থন দেয়। জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন, এমনকি ওই অনুষ্ঠানেই প্রথম বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করা হয়, যেখানে স্থানীয় ভূমির ডিজিটাল তথ্য প্রকাশিত হয়।...আমরা মোস্তাফা জব্বারের নেতৃত্ব ও কর্মদক্ষতার প্রতি আস্থাশীল। তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাষা বুঝেন। তিনি জানেন ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে শুধু যন্ত্র নয়, আলো ঝলমলে স্টুডিয়ো সেবা নয়। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো এই দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের রূপক। আশা করি, নানা রকম অনুষ্ঠানের আলোকচ্ছটায় তাকে ব্যস্ত রেখে, মূল কাজ থেকে তার দৃষ্টি কেউ সরিয়ে রাখতে পারবে না।'

ডিজিটাল বাংলাদেশ যখন ২১ সালে পৌঁছেছে এবং আমিও যখন মন্ত্রিত্বের চার বছর পার করছি, তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ তেরো বছর

পার করছে এবং আমি একটু পেছনে তাকাই, বর্তমানে তাকাই এবং সামনের দিকে নজর দিই।

ডিজিটাল বাংলাদেশের আজ-কাল-পরশু : বাংলাদেশের রূপান্তরের স্বর্ণালি অভিযাত্রায় একুশ সালের ১২ ডিসেম্বর ছিল এক ঐতিহাসিক সোপান, বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অবিস্মরণীয় দিন। ২০০৮ সালের এই দিনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ বা দিনবদলের সনদ ঘোষিত হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিক জননেত্রী শেখ হাসিনার কণ্ঠে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম একটি দেশের নামের আগে ডিজিটাল শব্দ উচ্চারিত হওয়ার দিন। এই সাহসী উচ্চারণ বাঙালির দুঃসাহসিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি উন্নয়নের এক যুগান্তকারী দর্শনের নাম, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অঙ্গীকারে পথচলার শপথ। এই উচ্চারণ ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক মহাপরিকল্পনা-জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার। ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার এই মন্ত্র শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে গত ১৩ বছরে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ঘোষণার পর একটি গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করলেও এ দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠী এর মর্মার্থ বুঝতে ভুল করেনি। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনে আকাশচুম্বী বিজয় অর্জনের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের আজকের বাংলাদেশ বিশ্বের এক বিস্ময়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি পালটে দিয়েছে চিরচেনা বাংলাদেশ, অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে মানুষের জীবনযাত্রার। অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র্য এবং অনুন্নত যোগাযোগসহ অভাব, মঙ্গা আর অপ্রতুলতার মতো শব্দ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এই জনপদ থেকে। বঙ্গবন্ধুকন্যার মমতাময়ী হাতের ছোঁয়ায় চিরায়ত দুঃখিনী বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল, ডিজিটাল দুনিয়ার অহংকার। জাতি হিসাবে আমরা ধন্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে টেলিযোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণ, ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ভাবন, উৎপাদন ও রপ্তানি এবং ডিজিটাল ডিভাইসের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ডিজিটাল কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণসহ বহুমুখী ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

জাতির হাজার বছরের ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের বীজ বপন করে গেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন্স ইউনিয়ন ও আইটিইউ-এর সদস্যপদ অর্জন এবং টিএন্ডটি বোর্ড গঠন করার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করেন, রচিত হয় ডিজিটাল অভিযাত্রার ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কৃষিভিত্তিক এই ভূখণ্ডের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী প্রযুক্তিতে শত শত বছর পিছিয়ে থেকেও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণের দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর কুচক্রী মহল দীর্ঘ ২১ বছর তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণের সেই শুভ সূচনাকে কেবল পদদলিতই করেনি, বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিতে সব আয়োজন সম্পন্ন করে। ১৯৯২ সালে বিনা মাশুলে সাবমেরিন কেবল সংযোগ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর শুরু করা তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে শরিক হওয়ার পদযাত্রায় শেষ পেরেকটি গেঁথে দেওয়া হয়। দুর্ভাগা এ জাতি অতীতের দুটি শিল্পবিপ্লব মিস করার ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে শুরু হওয়া তৃতীয় শিল্পবিপ্লব বা ইন্টারনেটভিত্তিক শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ পৈশাচিক শক্তি পরিকল্পিত উপায়ে থামিয়ে দেয়। ব্যতিক্রম হচ্ছে ওই সময়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের মধ্যেও বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করে মুদ্রণ ও প্রকাশনায় বিপ্লব ঘটানো ও দেশের মানুষের হাতে কম্পিউটার পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। আমার সৌভাগ্য যে, এই আন্দোলনটির পুরোভাগে আমি থাকতে পেরেছিলাম। একই সঙ্গে এটিও স্মরণ করা দরকার যে শেখ হাসিনা হচ্ছেন দেশের প্রথম রাজনীতিবিদ, যিনি কম্পিউটার ব্যবহার করেন এবং যিনি তাঁর নিজের দলকে ডিজিটাল করেন। সেই সময়ে তিনি বিরোধী দলে থেকেও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশে ব্যাপক সহায়তা করেন। নিজে বাংলা টাইপিং শেখেন ও সংবাদপত্র ও প্রকাশনায় আমি যখন বিপ্লবটা সম্পন্ন করি, তখন প্রতিটি কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রথমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনকালে এবং তার দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের পথচলা আবার নতুন করে শুরু হয়। এককথায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বপন করা বীজটি সযত্নে চারা গাছে রূপান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সময়কালে কম্পিউটারের ওপর থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার, মোবাইল ফোন সাধারণের নাগালে পৌঁছে দিতে চারটি মোবাইল অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদান, ভি-স্যাটের মাধ্যমে ডায়াল-আপ থেকে অনলাইন ইন্টারনেট সেবা চালু, প্রযুক্তিকে উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে প্রয়োগের জন্য করণীয় নির্ধারণে ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে ডিজিটাল প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন এবং কমিটির ৪৫টি সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল সেবা প্রবর্তন, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পদক্ষেপ গ্রহণ, সাবমেরিন কেবলের সংযোগ গ্রহণের উদ্যোগসহ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে ডিজিটাল মহাসড়ক বা কানেকটিভিটি নির্মাণের মাধ্যমে উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশকে পৌঁছে দিতে অভাবনীয় পদযাত্রাটি শুরু হয়। শেখ হাসিনা বস্তুত বাংলাদেশকে বিশ্বের সমতালে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে শামিল করেন। কিন্তু ২১ বছর কেউই এই বিষয়টি চিন্তায়ও আনেনি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয়দীপ্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় গৃহীত যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরের অভিযাত্রায় জল-স্থল-অন্তরিক্ষে দেশের টেলিকম খাতের অর্জন এখন ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। করোনাকালে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে ডিজিটাল সংযুক্তি সহায়তায় বাংলাদেশ তার সক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বস্তুতপক্ষে ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির গৌরবোজ্জ্বল

আলোকচ্ছটা ২০০৯ থেকে বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে ইংল্যান্ড, ভারত, মালদ্বীপ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের দেশে দেশে উদ্ভাসিত হয়েছে, বিশ্বের দেশে দেশে অনুকরণীয় হচ্ছে। পিতৃভূমি কেনিয়ার রূপান্তরে বাংলাদেশকে অনুসরণ করার জন্য কেনিয়াবাসীকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পরামর্শ প্রদান বাংলাদেশের অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক দলিল।

বারাক ওবামার বাংলাদেশকে অনুসরণ করার এই পরামর্শ তারই পূর্বসূরি সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যানরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে কটূক্তি করার কঠিন জবাব। আগামী ১০ বছরের মধ্যে পাকিস্তানকে উন্নয়নে বাংলাদেশের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রতি সে দেশের টিভি টকশোতে দেশটির বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রত্যাশা বাংলাদেশকে মহিমান্বিত করেছে। কোভিডকালে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখার মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫ দশমিক ২ অর্জন ডিজিটাল সংযুক্তিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? অথচ অনেক উন্নত দেশেরও এ সময়কালে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি আমরা দেখেছি। অতীতের সব পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশ আজ নেতৃত্বের যে সক্ষমতা অর্জন করেছে, তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকনির্দেশনায় ডিজিটাল কানেকটিভিটির সফলতার পথ বেয়েই সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্বভার গ্রহণকালে বাংলাদেশের টেলিডেনসিটি ছিল ৩০ শতাংশ। বর্তমানে এই হার শতভাগ অতিক্রম করেছে। ২০০৮ সালে যেখানে মোবাইল গ্রাহক ছিল ৪ কোটি ৪৬ লাখ, বর্তমানে তা ১৭ কোটি ৬৪ লাখ অতিক্রম করেছে। এই সময়ে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল মাত্র ৮ লাখ, বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৯ লাখ। ব্যান্ডউইথের ব্যবহার যেখানে ছিল ৭ দশমিক ৫ জিবিপিএস, বর্তমানে তা ২ হাজার ৭০০ জিবিপিএস অতিক্রম করেছে। ২০০৮ সালে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত লাইসেন্স ছিল ৬০৮টি, বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এ সংখ্যা ৩,৩৯৬টি। ২০০৮ সালে এক এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ চার্জ ছিল ২৭ হাজার টাকা, যা ২০২১ সালে সর্বনিম্ন একশ টাকার নিচে নেমে এসেছে।

সেবা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কয়েক বছরে ফাইভজি প্রযুক্তির নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনা ও বিচারবিশ্লেষণ করেই ফাইভজি যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। গুগলের দেওয়া তথ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ১০টি দেশ ৫জি প্রযুক্তি চালু করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫জি প্রচলনের হার ২৮.১, সৌদি আরবে সেই হার ২৬.৬, কুয়েতে ২৬.৩, হংকংয়ে ২৫.৩, আমেরিকায় ২০.৮, থাইল্যান্ডে ১৮.৩ এবং তাইওয়ানে ১৫.৮। এর বাইরে জাপানের নাম রয়েছে। যদিও চীনা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ের মতে, ১৭৬টি দেশে ৫জি কোনো না কোনোভাবে চালু হয়েছে। ফাইভজি প্রযুক্তি সেবা কেবল গ্রাহকদের জন্য মোবাইল ব্রডব্যান্ড ও ভয়েস কলের প্রযুক্তি নয়। অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে বিপ্লব হবে। ৬০ মিলি সেকেন্ডর ল্যাটেন্স ১ মিলি সেকেন্ডে নেমে আসবে। তবে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি, রোবোটিং, বিগডেটা, ব্লকচেইন, আইওটি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রযুক্তির আইওটি, হিউম্যান টু মেশিন, মেশিন টু মেশিন, প্রভৃতি প্রযুক্তি ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ক্রিটিক্যাল মিশন সার্ভিস, স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট সিটি, স্মার্ট হোম, ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল চিকিৎসা, ডিজিটাল শিল্প-বাণিজ্য, ডিজিটাল কৃষি, স্মার্ট ফ্যাক্টরির সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল গ্রাহকরা অধিকতর উন্নত গুণগত মানের ভয়েস কল ও ৪জি থেকে অন্তত পাঁচগুণ দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম হবে। মোবাইল ছাড়াও এই প্রযুক্তি অতি দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেবে।

প্রাথমিকভাবে টেলিটক ঢাকা শহরে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, ধানমন্ডি ৩২, বাংলাদেশ সচিবালয়, সংসদ এবং ঢাকার বাইরে সাভার ও টুঙ্গিপাড়া–এ ছয়টি এলাকা ফাইভজি কাভারেজের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে টেলিটক ঢাকা শহরের ২০০টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এ প্রযুক্তি সেবা চালু করবে। আগামী বছর মার্চে বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ নিলামে দেওয়ার পর বেসরকারি তিনটি মোবাইল অপারেটর এই প্রযুক্তি চালু করবে। ২ হাজার ২২ সালের পর টেলিটক ও বিটিসিএল-এর মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল বিশেষ করে স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলোয় এই সেবা চালু করার প্রস্তুতির কাজ চলছে। বিশেষ শিল্পাঞ্চলগুলোয় বিটিসিএল যে সংযোগ দিচ্ছে, তা ৫জি সমতুল্য করা হচ্ছে।

	১জি	২জি/টিডিএমএ	৩জি	৪জি	৫জি
বছর	১৯৮০-৯০	১৯৯৩	২০০১	২০০৯	২০২০
প্রযুক্তি	অ্যানালগ	অ্যানালগ	ডিজিটাল	ডিজিটাল	ডিজিটাল
ব্যান্ডউইথ	ন্যারো	ন্যারো	ন্যারো	ব্রডব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড
দেশে চালু	নয়	১৯৯৭	১৪ অক্টোবর ২০১২	১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২ ডিসেম্বর ২০২১

৫জি: ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল সংযোগ প্রতিষ্ঠায় ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে ২০১৮ সালের পর গত তিন বছরে অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ফাইভজি যুগে পদার্পণ করে।

২০১৮ সালে বিশ্ব যখন ফাইভজি প্রযুক্তি নিয়ে ভাবছে, আমরা সেই বছরই এই প্রযুক্তির পরীক্ষা সম্পন্ন করেছি। ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় দেশে ফাইভজির সফল এই পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এর আগে ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ফোরজি বেতার তরঙ্গ নিলাম এবং ২০ ফেব্রুয়ারি মোবাইল অপারেটরদের ফোরজি লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ফোরজি

ফাইভজি প্রযুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। ফাইভজি প্রযুক্তি হচ্ছে একটি শিল্পপণ্য। আগামী দিনের প্রযুক্তি এআই, রোবটিক্স, আইওটি, বিগডেটা কিংবা ব্লকচেইনের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কিংবা মৎস্য ও কৃষির জন্য ফাইভজি অপরিহার্য। এমনকি শিল্পকারখানায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও ফাইভজি ছাড়া বিনিয়োগ করবে না। এজন্য প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ফাইভজি সংযোগ দেওয়ার জন্য বিটিসিএল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট: মহাকাশে বাংলাদেশের পদচারণার প্রথম সোপান 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক সূচনা অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রা। এই অগ্রযাত্রা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় চলমান ডিজিটাল দেশ বিনির্মাণের সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার উজ্জ্বল সোপান অতিক্রম করা। অবিস্মরণীয় এই যাত্রা উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশক।

২০১৮ সালের ১২ মে শনিবার ভোর ২টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ অভিষিক্ত হলো ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সুবিধার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–সমগ্র বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচারের নিশ্চয়তা, বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বার্ষিক ১৪ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়, ট্রান্সপন্ডার লিজের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়, টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল লার্নিং, ডিজিটাল এডুকেশন, ডিটিএইচ প্রভৃতি সেবা প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাবমেরিন কেবল বা টেরিস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সুবিধা প্রদান, স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি ও সেবার প্রসারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মার্কিন কোম্পানি স্পেসএক্সের সর্বাধুনিক রকেট ফ্যালকন-৯ স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। ২০১৯ সালের ৩১ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলগুলোর বাণিজ্যিক সম্প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। বর্তমানে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডসহ দেশের ৩৬টি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আফ্রিকায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ভি-স্যাট এবং রেডিয়ো স্টেশনগুলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দ্বীপসহ দুর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২: মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর পর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। নির্বাচনি ইশতাহার অনুযায়ী, ২০২৩ সালের মধ্যে এটির কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রথম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটনির্ভর সম্প্রচার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করে। অন্যান্য প্রকৃতি ও ধরনের স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তির সক্ষমতা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ জাতীয় জীবনের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হতে যাচ্ছে।

সাবমেরিন কেবল ও ডিজিটাল সংযুক্তি: ১৯৯২ সালে বিনামূল্যে সিমিউই-৩-এ সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকলেও সেই সময়কার খালেদা জিয়া সরকার সেই সংযোগ নেয়নি। ১৪ বছর পর ২০০৬ সালের মে মাসে খালেদা সরকার চাপের মুখে সিমিউই-৪-এ যুক্ত হয়। এরপর ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনার সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কুয়াকাটায় সিমিউই-৫-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সংযোগের পর দেশের তৃতীয় সাবমেরিন কেবলের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বহুল প্রত্যাশিত তৃতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সি-মি-উই (SE-ME-WE)-৬ কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেনটেইন্যান্স অ্যাগ্রিমেন্ট এবং কনসোর্টিয়ামের সরবরাহকারীদের সঙ্গে ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার আনুষ্ঠানিক এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

> ২০১৮ সালের ১২ মে শনিবার ভোর ২টা ১৪ মিনিটে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ অভিষিক্ত হলো ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের মর্যাদায়

দেশে ডিজিটাল সংযুক্তি বিকাশের অনন্য এ কার্যক্রমের শুভ যাত্রা ঘোষণা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ২০২৪ সালের মধ্যে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলটি চালু হবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদী। এটি চালু হওয়ার পর দেশে ডিজিটাল সংযুক্তি বিকাশে আরও একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে।

আগামী দিনে ডিজিটাল সংযুক্তির বর্ধিত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে সিমিউই-৬ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনে অভাবনীয় অবদান রাখবে। তৃতীয় সাবমেরিন কেবল সংযুক্তি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ অগ্রযাত্রায় আরও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। সেই সঙ্গে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ, ফাইভজি নেটওয়ার্ক চালু এবং তৃতীয় সাবমেরিন কেবল সংযোগে নির্বাচনি ইশতাহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের একটি বড়ো সফলতা।

নির্বাচনি এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০১৯ সাল থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি। এছাড়াও এই সময়ের মধ্যে সাব সাবমেরিন কেবল স্থাপনের তিনটি প্রস্তাবকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে একনেক সভায় তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির কারণে কনসোর্টিয়াম কর্তৃক সরবরাহকারী নির্বাচনে বেশ বিলম্ব হয়। এ কারণে ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কনসোর্টিয়ামের প্রস্তাবিত কার্যক্রমটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও তা পিছিয়ে ২০২৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে নির্ধারণ করা হয়।

২০০৬ সালের প্রথমার্ধে দেশে প্রথম সাবমেরিন কেবল কমিশনিং করা হয়। ২০২৪ সাল নাগাদ দেশে ৬০০০ জিবিপিএস-এরও বেশি আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি ভিএসএনএল-এর কাছে ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ রপ্তানির জন্য নতুন করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া বিএসসিসিএল দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের পশ্চিমদিকের তথা ইউরোপের দিকের অব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ দীর্ঘমেয়াদে লিজ দেওয়ার জন্য সৌদি আরব ও ফ্রান্সের সঙ্গে দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, মালয়েশিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। ভুটান ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সিমিউই-৬ কনসোর্টিয়ামে যোগদানকারী ১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সিংটেল সিঙ্গাপুর, বিএসসিসিএল বাংলাদেশ, টেলিকম মালয়েশিয়া, এসএলটি শ্রীলংকা, ধিরাগু মালদ্বীপ, এনআইটুআই ভারত, টিডব্লিউএ পাকিস্তান, জিবতি টেলিকম, জিবতি মবিলিঙ্ক-সৌদি আরব চায়না মোবাইল ইন্টারন্যাশনাল, চায়না টেলিকম গ্লোবাল লিমিটেড চায়না, ইউনিকম চায়না, মাইক্রোসফট যুক্তরাষ্ট্র, টেলিকম ইজিপ্ট মিসর এবং অরেঞ্জ ফ্রান্স।

এছাড়াও আরও সংযোগ: এই সময়ের মধ্যে ডিজিটাল সংযুক্তি ও টেলিকম খাতে আনা হয় আমূল পরিবর্তন। নীতি ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ককে সচল সজীব রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বিটিসিএলসহ ৭টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে International Terrestrial Cable (ITC) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জনগণের কাছে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে বিদ্যমান দুটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিটিসিএল এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে Broadband Wireless Access (BWA) প্রদান করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য প্রায় ১ হাজার ৮০০টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

এমএনপি: সময়ের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও গ্রাহকস্বার্থ সুরক্ষায় মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (এমএনপি) ও টাওয়ার শেয়ারিংয়ের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। Mobile Number Portability (MNP) চালু করার ফলে গ্রাহক তার নম্বর ঠিক রেখে পছন্দ মতো মোবাইল অপারেটরের সিম ব্যবহার করতে পারবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর এমএনপি সেবার উদ্‌বোধন করেন।

এসএমপি: ২০১৮ সালের নভেম্বরে টেলিযোগাযোগ খাতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় সিগনিফিকেন্ট মার্কেট পাওয়ার বা এসএমপি নীতিমালা। এই নীতিমালা অনুসারে কোনো টেলিকম অপারেটর গ্রাহকসংখ্যা, রাজস্ব ও তরঙ্গের যে কোনো একটির ক্ষেত্রে বাজারের ৪০ শতাংশ দখল করলে সেটিকে এসএমপি হিসাবে ঘোষণা করে এর কার্যক্রমের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

তরঙ্গ নিলাম ও আইএমআই: মোবাইল ফোনের নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতিমালার পাশাপাশি সর্বশেষ ২০১৮ সালের পর ২০২১ সালের ৮ মার্চ নিলামে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ২২ জানুয়ারি উদ্‌বোধন করা হয়েছে আইএমইআই ডেটা সেন্টার। রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানে অনিবন্ধিত সিমকার্ড বিক্রি, অনুমোদনহীন মোবাইল হ্যান্ডসেট বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থায়ী ফোন ও ফাইবার কেবল: ১৫০ টাকায় বিটিসিএল ল্যান্ড ফোনে যত খুশি তত কথা বলা চালু লাইনরেন্ট মওকুফ এবং ৫২ পয়সা মিনিটে অন্য অপারেটরে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৭ আগস্ট এই সেবাটি চালু করা হয়। এর পরপরই বিটিসিএল আলাপ নামে একটি অ্যাপ চালু করে, যা দিয়ে স্বল্পমূল্যে মোবাইল ফোনেও কথা বলা যায়। বিটিসিএল আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেলিকম সেবা আধুনিকায়নে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এমওটিএন প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষ হলে টেলিফোন সেবায় দেশে নতুন যুগের সূচনা হবে। গ্রাহক সাধারণ টেলিফোন থেকে কথা বলার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা পাবে। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় GPON (Gigabit Passive Optical Network), FTTx (Fiber to the Ofiice/home/building System, Triple Play (Voice, Data and Video) সেবা পাওয়া যাবে। সাবমেরিন কেবলের ব্যান্ডউইথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের (প্রটেকশন) অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ জিবিপিএস ক্ষমতার বর্তমান অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ জিবিপিএস ক্ষমতায় রূপান্তর করা হয়েছে।

বিটিসিএল কর্তৃক এক হাজার ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ১১৪টি উপজেলা থেকে ১ হাজার ১০৪টি ইউনিয়নে প্রায় ৮ হাজার কিমি. অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক, বেসামরিক, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৮ হাজার ৯০০ কিমি. অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপিত হয়। ইতোমধ্যে ৬ হাজার ৬৫ কিমি. অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে এবং ২০২টি উপজেলায় যন্ত্রপাতি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় সব উপজেলার জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাচ্ছে।

ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট: বিনামূল্যে দেশের ৫৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্রি ওয়াই-ফাই জোন স্থাপনের কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়ন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় দ্বীপ, চর ও হাওড় অঞ্চলসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ডিজিটাল কানেকটিভিটি পৌঁছে দিতে আমরা কাজ করছি। আরও ১২ হাজার ফ্রি ওয়াই-ফাই স্থাপনের কাজ চলছে। ৮০টি দুর্গম ইউনিয়নে স্যাটেলাইট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ৬১৬টি দুর্গম ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্স তার বসানো হচ্ছে। ইনফো সরকারের মাধ্যমে এরই মধ্যে ২ হাজার ৬০০

ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্স তার বসানো হয়েছে। আরও ১৬০টি দুর্গম ইউনিয়নে তার বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর: সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থে আমরা ইতোমধ্যে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলের ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ডিজিটাল শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি। এর মধ্য দিয়ে দেশে ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে চলেছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলগুলোর ক্লাসরুমগুলো ডিজিটাল করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ডিজিটাল উপাত্ত দিয়ে লেখাপড়া করানো হবে।

আইএসপি ও এক দেশ এক রেট: ২০২১ সালে আমরা আইএসপি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। ফলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেটের এক দেশ এক রেট নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এক দেশ এক রেট চালু করা হয়। এর ফলে ২০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথের মূল্য ৮০০ টাকায়, ১০ জিবিপিএস-এর দাম ৭০০ এবং ৫ জিবিপিএস-এর দাম ৫০০ টাকায় কমে এসেছে।

টাওয়ার শেয়ারিং: মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষেণ ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় বিপুল ব্যয়ের পাশাপাশি টাওয়ারের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা, ভূমি ও বিদ্যুতের সংকট ছাড়াও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর ৪টি কোম্পানিকে এ লাইসেন্স দেওয়া হয়। টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সের ফলে মোবাইল টাওয়ার লাইসেন্স রোল আউটের ওপর ভিত্তি করে মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো কোনো নতুন টাওয়ার স্থাপন করতে পারবে না। এছাড়া এক অপারেটর আরেক অপারেটরের কাছে আর টাওয়ার ভাড়া দিতে পারবে না। কিন্তু লাইসেন্স পাওয়া টাওয়ার কোম্পানির কাছে তাদের টাওয়ার বিক্রি করতে পারবে।

মোবাইল সেবা: মোবাইল ফোন ও নেটওয়ার্ক এখন মানুষের জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। কোভিডকালে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত শতভাগ টাওয়ার ফোরজি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। মোবাইল ফোন এবং এর বিভিন্ন অ্যাপের ব্যবহার, উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট, ওভার দ্য টপ (ওটিটি) অ্যাপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে।

আমাদের মূল লক্ষ্য সবার কাছে মানসম্মত, নিরাপদ ও সুলভমূল্যে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়া। এদেশের মেধাবী, তারুণ্যদীপ্ত ও প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ প্রতিটি গ্রাম ডিজিটাল গ্রামে রূপান্তর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিচ্ছে প্রান্তিক মানুষ, ঘরে বসে পাচ্ছে টেলিমেডিসিন সেবা, সেই সঙ্গে শহরের মতো গ্রামেও ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো থেকে কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকবে না। ৩টি দুর্গম পার্বত্য জেলার সব উপজেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা সম্ভব হয়েছে। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনে সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নেটওয়ার্ক তথা মোবাইল যোগাযোগ পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নসাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

গ্রাম হচ্ছে শহর: হাওড় ও দুর্গম দ্বীপ অঞ্চলে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসওএফ-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধীন হাওড়গুলোয় এবং মাতারবাড়ী, হাতিয়া, ভাসানটেক প্রভৃতি দ্বীপ অঞ্চলে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিটিআরসির (সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল) এসওএফ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রকল্পটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

> ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণ প্রক্রিয়া স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতেই সম্পন্ন হবে–এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে

ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণ প্রক্রিয়া স্বাধীনতার এই সুবর্ণজয়ন্তীতেই সম্পন্ন হবে–এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। আজকের তরুণ প্রজন্ম ডিজিটাল দক্ষতা নিয়ে বেড়ে উঠছে। তাদের ডিজিটাল শিক্ষা দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণের ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন এবং তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এর উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন।

টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত হাওড়, দ্বীপ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি স্থাপনে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ) ১ হাজার ৫২৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ৫০৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি স্থাপন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর

মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনে ৪৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, টেলিটকের মাধ্যমে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, বিটিসিএল-এর মাধ্যমে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়-বাঁওড় ও প্রত্যন্ত ব্রডব্যান্ড ওয়াই-ফাই সম্প্রসারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনে ৬৩ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ব্যয়ে এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ডিজিটালকরণে ৮৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ৯ নভেম্বর আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের জন্য এবং অপারেটরগুলোর প্যাকেজ বিড়ম্বনা যৌক্তিক মাত্রায় নির্ধারণ করার মাধ্যমে গ্রাহক সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি অ্যাপ চালু করেছি। গত ৯ নভেম্বর বিটিআরসি কর্তৃক মোবাইল ডেটা প্যাকেজ নির্দেশিকা এবং টেক্সটের মাধ্যমে ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও ডিসকভার অ্যাপ উদ্‌বোধন করা হয়।

এর ফলে এখন থেকে কোট ডেটা প্যাকেজ ক্রয় করা না থাকলেও গ্রাহক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং চাকরি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে খোঁজ করতে পারবেন।

২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রা থেকে শুরু করে ডিজিটাল অবকাঠামো সম্প্রসারণে ১৩ বছরে গৃহীত যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে ডিজিটাল সেবা দেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের হাতে মুঠোয় পৌঁছে গেছে। ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সারা দেশের ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়ন পরিষদে একটি করে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি) একযোগে উদ্‌বোধন করেন। পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ৪ হাজার ৫১৬টি (ইউআইএসসি) স্থাপন করা হয়। দেশের সব ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো–ইউনিয়ন পরিষদকে একটি তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, যাতে এই সেবাপ্রতিষ্ঠান ২০২১ সালের মধ্যে একটি তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব কেন্দ্র থেকে ৩০০টি সরকারি সেবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ গ্রহণ করতে পারছে। এর পাশাপাশি দেশের ৮ হাজার ৫০০ ডাকঘর থেকে ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা এখনই বিশ্বের আশিটি দেশে বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করি। এমনটি আমরা ডিজিটাল ডিভাইসও রপ্তানি করি।

ডিজিটাল বাংলা ভাষা: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) কর্তৃক ২০১৬ সালের ৪ অক্টোবর ডটবাংলা ডোমেইন বাংলাদেশের অনুকূলে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'বাংলা' ডোমেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন।

'ডটবাংলা' ডোমেইন চালুর ফলে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলা ভাষায় ইন্টারনেটে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে ইন্টারনেটে বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধিসহ বাংলা কনটেন্ট তৈরি উৎসাহিত করবে। এছাড়া 'বাংলা' ডোমেইন সর্বস্তরের বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

২০১৮ সালে কম্পিউটার বাংলা ভাষার প্রমিত মান তৈরি করা হয়েছে। বিডিএস ১৫২০: ২০১৮, বিডিএস ১৭৩৮: ও বিডিএস ১৯৩৫ মান প্রমিত করায় বাংলা ব্যবহার মানসম্মত হয়েছে।

ডিজিটাল ডাকঘর: ৫০০টি উপজেলা ও সাব-পোস্ট অফিস এবং আট হাজার গ্রামীণ অবিভাগীয় শাখা ডাকঘরকে পোস্ট ডিজিটাল সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। দ্রুত ও নিরাপদে ডাক সেবা প্রদানের লক্ষ্য সামনে রেখে মেইল ও ক্যাশ পরিবহণের জন্য ১১৮টি মেইল গাড়ি ডাক পরিবহণ বহরে যুক্ত করা এবং এবং ৩৩টি গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। পোস্ট ডি-কমার্স সার্ভিস প্রদান কার্যক্রম ডাক অধিদপ্তরের নতুন সেবা কার্যক্রম হিসাবে চালু করা হয়েছে। ডাক বিভাগ কর্তৃক মোবাইল ফিন্যান্স সার্ভিস নগদ এবং ডিজিটাল ডাক টাকা চালু করা হয়েছে। ডাক সেবাকে ডিজিটাল ডাক সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে ডাক বিভাগের অবকাঠামোকে কার্যকর ডিজিটাল কমার্সের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডাকঘরের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক ও বিশাল অবকাঠামো আমাদের বিশাল সম্পদ। এই সম্পদকে জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। ডিজিটাইজেশনের প্রভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিঠি আদান-প্রদানের যুগ শেষ হয়ে গেলেও পণ্য পরিবহণে ডাক বিভাগকে শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি পুরো ডাক ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করছি আমরা। ডিজিটাল সেবা প্রদানের বদৌলতে উদ্ভাবনের হাত ধরেই আগামীর ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের পৃথিবীতেও ডাক সেবার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে। ডাকঘরকে ডিজিটাইজেশনের জন্য ডিজিটাল সার্ভিস ল্যাব করেছি। সেখান থেকে ডিজিটাল প্রক্রিয়া কীভাবে করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি: ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ আমদানীনির্ভর দেশ ছিল। ডিজিটাল যন্ত্রের ক্ষেত্রে সেটি শতভাগ ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় ঘোষণা করেন যে, এই দেশ আমাদনিকারক থেকে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে। ২০২১ সালে তিনি ঘোষণা করেছেন, এই দেশ থেকে ডিজিটাল যন্ত্র রপ্তানি অন্য সব খাতকে ছাড়িয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রযুক্তিবান্ধব বিনিয়োগ নীতির ফলে দেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনের চাহিদার শতকরা ৬৩ ভাগই বাংলাদেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। স্যামসাং, শাওমিসহ দেশে ১৪টি মোবাইল কোম্পানি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে মেড-ইন বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের ফাইভজি মোবাইল রপ্তানি করছে।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা ডিজিটাল ডিভাইস নির্মাণের উপযোগী করে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বাইরে বাংলাদেশের তৈরি ল্যাপটপ ও কম্পিউটার রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিবান্ধব প্রদত্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে নেপাল, নাইজেরিয়ায় কম্পিউটার ও ল্যাপটপের বড়ো অঙ্কের চালান রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানির বিষয়টি পাইপলাইনে রয়েছে। টেলিটক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ডিজিটাল কমার্স একটি বড়ো প্ল্যাটফরম হিসাবে গড়ে উঠেছে। আগামীর বাংলাদেশ শুধু বাণিজ্যেই নয়, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা ও কলকারখানাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল মহাসড়ক দিয়েই এগিয়ে যাবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা: ডিজিটাইজেশনের প্রসারের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য এখন বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ। সে সংকটও অতিক্রম করতে আমরা কাজ করছি। ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে ডিজিটাল নিরাপত্তা

আইন ২০১৮ প্রণয়ন ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই আইনের আওতায় একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। এই এজেন্সির মাধ্যমে ২২ হাজার পর্ন সাইট ও ৬ হাজার জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে। ফেসবুক-ইউটিউবে যে ধরনের পর্ন-সংক্রান্ত বা নোংরা-অশ্লীল তথ্য-উপাত্ত দেওয়া হয়, সেগুলো অপসারণ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে এ অবস্থাগুলো তৈরি হয়েছে। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বাংলাদেশের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এগুলো পরিচালিত হয় আমেরিকার সামাজিক, পারিবারিক আইন দিয়ে। তারা মূলত আমেরিকা স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে চলে। ফেসবুক-ইউটিউব আগে আমাদের কথা শুনত না। এখন তারা আমাদের কথা শুনছে। সেই সক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি। তবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পেছনে ফেসবুক-ইউটিউবকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না। যখন দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দাপট ছিল না, তখনও এ ধরনের (সাম্প্রদায়িক হামলা ও গুজব) ঘটনা ঘটেছে। এগুলো রোধ করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা।

আমরা সামগ্রিকভাবে শুরু থেকে যে কথাটা বলে আসছি, আমাদের দায়িত্ব ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণের। এই মহাসড়ক নির্মাণের দায়িত্বটা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করছি এবং আমরা ভবিষ্যতে নিজেরাও যাতে নিরাপদ থাকতে পারি, সেই চেষ্টাও করছি। আমরা অনেক আগে থেকে লড়াই করছিলাম–আমরা ডিজিটাল হচ্ছি, একই সঙ্গে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী হব। আমরা যত ডিজিটাল হব, তত ডিজিটাল নিরাপত্তার দিকটা থাকবে। সামাজিক যোগাযোগনির্ভর কিছু গুজব রটানো অথবা সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিষয়টি একটি দিকমাত্র। আমারা লেনদেন, ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে সবকিছু যখন ডিজিটাল, তখন আমার তথ্যের নিরাপত্তা যদি দিতে না পারি, তাহলে ডিজিটাইজেশন তো উলটো আমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই অবস্থা উত্তরণে 'ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের আইনের আওতায় যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেগুলো আমরা নেব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার হয় এবং এই অপব্যবহারগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ্য এটা শুধু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেই নয়, অন্য আইনের ক্ষেত্রেও হয়। এবার যখন কুমিল্লার ঘটনা ঘটে এবং এর পরবর্তী সময়ে যখন ঘটনাগুলো ঘটেছে, তখন আমরা ৩০০ লিংকে রিপোর্ট করেছি। তারা ৩০০ লিংকের ভেতরে ২৬৪টি বন্ধ করেছে। আগে হয়তো ১০/১৫টা বন্ধ করত। অর্থাৎ তারা আগে আমাদের কথা সেভাবে শুনত না, এখন শুনছে। সেই সক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি। তারা (ফেসবুক-ইউটিউব) এরই মধ্যে বাংলাদেশে কর নিবন্ধিত হয়েছে, ভ্যাট দিচ্ছে। ফেসবুক বাংলাদেশের জন্য একজন বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে। আমি প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশের রীতিনীতি এবং বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা মেনে নিয়েই তারা এখানে কাজ করবে। আমাদের কাছে যে প্রযুক্তি আছে, সেই প্রযুক্তি দিয়ে আমরা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কোনো সাইট যদি বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, সেটা আমরা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকেই করতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এখন ফেসবুকের ছবি বন্ধ করতে পারব, ইচ্ছা করলে ফেসবুকের ভিডিয়ো বন্ধ করতে পারব। ইউটিউবের লাইভ বন্ধ করতে পারব, ফেসবুকের লাইভ বন্ধ করতে পারব। কিন্তু ফেসবুক-ইউটিউব বন্ধ করে দেওয়া একমাত্র সমাধান নয়। মাথাব্যথা হয়েছে, ওষুধ দিয়ে সারাতে হবে। কেটে ফেলা যাবে না। আমরা এখন পর্যন্ত ফেসবুকের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি, তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমাদের জন্য খুশির বিষয় হলো–তারা এখন বুঝে ফেলেছে বাংলাদেশের বাজারটা বিশাল। ৪ কোটি ৮০ লাখের ওপরে মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে। এ থেকে তাদের বিশাল আয়। দিনদিন তাদের আয় বাড়ছে। তারা পরিস্থিতি উপলব্ধি করছে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি, একদিন আমাদের নির্দেশনা অনুযায়ীই তারা চলবে।

আমরা সামগ্রিকভাবে শুরু থেকে যে কথাটা বলে আসছি, আমাদের দায়িত্ব ডিজিটাল মহাসড়ক নির্মাণের। এই মহাসড়ক নির্মাণের দায়িত্বটা আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করছি এবং আমরা ভবিষ্যতে নিজেরাও যাতে নিরাপদ থাকতে পারি, সেই চেষ্টাও করছি

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা: গ্রাহকের আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ না করেই জাতীয় পরিচয়পত্রের (এআইডি) তথ্যের সঙ্গে গ্রাহকের তথ্য যাচাইপূর্বক পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার (৩১ মে ২০১৬) মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর ফলে মোবাইল ফোনে হুমকি, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন-২০০৯, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১ (সংশোধিত ২০১০), পোস্ট অফিস আইন-১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০), আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগযোগ সেবা নীতিমালা-২০১০, ব্রডব্যান্ড নীতিমালা-২০০৯, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠন (২০১৫), বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (২০১৭) প্রতিষ্ঠা এবং মেইলিং

অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ (২০১৩) গঠন করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উদ্যোগঃ ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি ছিল ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ সনদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। এরই ধারাবাহিকতায় দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যাবসাবাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন–প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাধান। দেশের সব মানুষের উন্নয়ন অগ্রাধিকার দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম ১৩ বছরে বাস্তবায়ন করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছতার সঙ্গে, হয়রানিমুক্তভাবে ও স্বল্পমূল্যে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করছে।

এসব কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো সেবাপ্রার্থী জনগণকে আগের তুলনায় স্বল্প সময়, স্বল্প খরচ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে আরও গুণগত ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে সরকারি সেবা গ্রহণের সময়, খরচ এবং যাতায়াতের সাশ্রয় ঘটেছে, যার ফলে জনগণ আরও বেশি সেবা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন। জনগণ সাধারণ তথ্য যেগুলো নিতে অফিসগুলোয় যেতে হতো, এখন তা অনলাইনে গ্রহণ করতে পারছেন। সরকারি সেবা প্রদান করে এই প্রক্রিয়া থেকে আরও বেশি রাজস্ব আয় সম্ভব হচ্ছে, যা উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ভোলার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ চরকুকরিমুকরি থেকে ইউএনডিপির প্রশাসক ও নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে এসব কেন্দ্র ডিজিটাল সেন্টার নামে পরিচিত।

২০১০ সালে তখনই নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোয় পুরুষের পাশাপাশি একজন করে নারীও সাধারণ মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সেবা দিতে কাজ করবেন। সেই ঘোষণার ১২ বছর পর জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বর্তমানে সারা দেশে ৮ হাজার ৭০টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৩০০-এর অধিক রকমের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিকদের যে সেবা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে গ্রহণ করতে হতো; কিন্তু ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সহজে কম সময়ে ডিজিটাল সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারছেন। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও স্বীকৃত। ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নাগরিকদের প্রায় ৫৯ কোটি ৫০ লাখেরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫ হাজার ৯০০-এর অধিক উদ্যোক্তা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে; তন্মধ্যে প্রায় ৮ হাজার নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে বাংলাদেশের প্রবেশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নারীরাও সমানভাবে প্রযুক্তির এই বিপ্লবে অংশগ্রহণের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। ২০০৮ সালের পর থেকে সরকার তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসতে যেমন কাজ করছে, তেমনই মূলধারার উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায়ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশের ১৮ হাজার ৫০০ সরকারি অফিস এখন একই নেটওয়ার্কের আওতায়। ৮ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৫ হাজার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত ডিজিটাল কমার্সের আকার ছিল ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা করোনা মহামারিতে দ্বিগুণ হয়েছে। আইটিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০ লাখ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৫ লাখের কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশে সাড়ে ৬ লাখ সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার, যারা বছরে ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করছে।

সরকারি নানা উদ্যোগে বর্তমানে স্টার্টআপ খাতে বিনিয়োগ প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫২ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্যবাতায়নে যুক্ত রয়েছে ৮ হাজার ৬৪৪ লাখেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট এবং ৬০০-এরও বেশি সেবা, যা সহজেই মানুষ অনলাইনে পাচ্ছে।

ই-নথিতে ১ কোটি ৬১ লাখ ফাইলের নিষ্পত্তি হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ২৬ লাখ ই-মিউটেশন করা হয় অনলাইনে। ৭টি হাই-টেক ও আইটি পার্কে ব্যাবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৫টিতে ১২০টি প্রতিষ্ঠান ৩২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ৩৯টি হাই-টেক বা আইটি পার্ক ও আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে পার্কগুলোয় ২৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

করোনাকালে ৩৩৩ জাতীয় হেল্প লাইনে নাগরিকরা ৬ কোটি ১৩ লাখেরও অধিকবার কলে বিভিন্ন তথ্য ও সেবা গ্রহণ করে। ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সুরক্ষার মাধ্যমে সারা দেশে সফলভাবে ভ্যাকসিন (টিকা) কার্যক্রম চলছে।

সরকার এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি) মতো ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগানো ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কার্যক্রম শুরু করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটির উচ্চপ্রযুক্তির ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বমানের 'ফোর টায়ার ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। করোনা মহামারি থেকে দেশের জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম, ভ্যাকসিনেশনের তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং সনদ প্রদানের লক্ষ্যে সুরক্ষা ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফরম চালু করা হয়েছে, যা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের জনগণ এর সুবিধা পাচ্ছে।

আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে সেন্ট্রাল এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ক্যামস) সফটওয়্যারটি নিজস্ব জনবল দিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তৈরি করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি বিনামূল্যে তৈরি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। এ ক্যামস সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্রের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৈশ্বিক কনফারেন্সিং অ্যাপ জুমের বিকল্প হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'বৈঠক' অ্যাপ তৈরি করে। আইসিটি বিভাগ কর্তৃক নিজস্ব প্রকৌশলীদের উদ্ভাবিত 'বৈঠক' নামে একটি অ্যাপ পরীক্ষামূলকভাবে ২৩ এপ্রিল থেকে যাত্রা শুরু করেছে। ডিজিটাল

বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারি ম্যানুয়াল সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রমে এটুআই ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২ হাজার নাগরিক সেবা ডিজিটাইজেশনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ হাজারের অধিক নাগরিক সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবান্ধব সেবা। প্রতিবছর দেশে প্রায় ২২ লাখ নামজারি মামলা দায়ের হয়। এসব মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করা গেলে জনগণের একদিকে যেমন সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস পাবে, অন্যদিকে এ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানি লাঘব হবে। পাশাপাশি মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

সব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সেবাগুলোকে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডিজাইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছে এবং দ্রুত ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসাবে সব দপ্তরে ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রোডম্যাপের পরবর্তী ধাপ হিসাবে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব নামক একটি অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। যার মাধ্যমে চিহ্নিত করা সরকারি সব সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে এবং একটি সমন্বিত প্ল্যাটফরমের ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। অদ্যাবধি ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন সব দপ্তর ও সংস্থার সব জনবান্ধব সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৬৭২টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

সরকারি সব সেবা এক প্ল্যাটফরমে আনার অঙ্গীকার নিয়ে 'আমার সরকার বা 'মাই গভ' প্ল্যাটফরম চালু করা হয়েছে। কেউ বিপদে পড়লে অ্যাপটি খুলে মোবাইল ফোন ঝাঁকালে সরাসরি ৯৯৯ নম্বরে চলে যাবে ফোন। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীরা ৩৩৩ নম্বরে কল করেও নানা ধরনের তথ্য ও সেবা নিতে পারবেন অ্যাপটি থেকে। প্রয়োজনীয় তথ্যের সেবার জন্য আবেদন, কাগজপত্র দাখিল, আবেদনের ফি পরিশোধ এবং আবেদন-পরবর্তী আপডেট জানা যাবে অ্যাপেই। শুধু ভয়েস ব্যবহার করেও সেবার আবেদন, আপডেটসহ অন্যান্য বিষয় জানা যাবে। আর আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিত করা হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাহায্যে। উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর (উত্তরাধিকার বাংলা) একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর, যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন হিসাব করা যায়। মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনব্যবস্থার জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকেই উত্তরাধিকার বাতায়ন এবং অ্যাপের যাত্রা। এখন পর্যন্ত ১ লাখেরও অধিক নাগরিক উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের সব তথ্যসমৃদ্ধ বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও জনমুখী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে এ বাতায়নের যাত্রা। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আদালতে, ৫টি দায়রা আদালতে এবং ৮টি ট্রাইব্যুনালে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন সক্রিয় রয়েছে।

ডিজিটাল মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে অনলাইনে এবং প্রয়োজনে অফলাইনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মোবাইল কোর্টের সব কার্যক্রম যেমন: অভিযোগনামা দায়ের, অভিযোগ গঠন, জব্দতালিকা প্রস্তুত, জবানবন্দি গ্রহণ ও আদেশ প্রদান করতে পারেন। এখন পর্যন্ত ডিজিটাল মোবাইল কোর্টে ৮ হাজারেরও অধিক ব্যবহারকারী রয়েছেন এবং ৩৯২ লাখেরও অধিক মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

২০৩০ সালে এসডিজি অর্জনের জন্য সঠিক নীতি নির্ধারণ এবং সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করতে এবং তথ্যনির্ভর নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী হালনাগাদ তথ্যভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এসডিজি ট্র্যাকার। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে একই প্ল্যাটফরমে রাখার ফলে সব প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারছে। এতে মন্ত্রণালয়গুলো তাদের অবস্থান সহজে জানতে পারছে বলে বাস্তবসম্মত নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে না। মোট ৮৩৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ট্র্যাকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের সব ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে। ফলে নাগরিকরা ডিজিটাল সেন্টার থেকে অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ধরনের ফি প্রদান প্রভৃতি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ৪ হাজার ৪৭০টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ২২ হাজার কোটি টাকারও অধিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

“সব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সেবাগুলোকে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডিজাইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেছে”

জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক বা অন্য কোনো সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা। অদ্যাবধি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ৮৯ লাখ ৪৮ হাজারেরও অধিক জনগোষ্ঠীর কাছে ডিজিটাল উপায়ে ভাতা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি আদায় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে চালান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে একজন নাগরিক বা সেবাগ্রহীতার যেমন অতিরিক্ত সময়, অর্থ ও যাতায়াত ব্যয় হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনিক চালানের হিসাব মেলানো, নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ যথাসময়ে প্রেরণ এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে বাড়তি সময় ব্যয় ও মানসিক চাপ তৈরি হয়। সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি ইলেকট্রনিক উপায়ে গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটির একটি ইলেকট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল চালান সিস্টেমে ৪৭টি সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক কর্তৃক ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকারও অধিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পার্সন-টু-বিজনেস (পিটুবি) পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষেবা বিল ও ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে 'একপে' নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফরম চালু করা হয়েছে। দেশের সব পরিষেবা বিল, শিক্ষাসংক্রান্ত ফি ও অন্যসব ধরনের ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিত করা হয়েছে 'একপে'-এর মাধ্যমে। এ পর্যন্ত ১৫টি আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একপে-এর পার্টনারশিপ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যাবধি এই সিস্টেম থেকে ২৭ লাখের অধিক নাগরিক উপকৃত হয়েছেন।

সহজ ও দ্রুত সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম রুরাল অ্যাসিস্টেড ডিজিটাল কমার্স প্ল্যাটফরম হলো একশপ। ইতোমধ্যে ৮ লাখেরও অধিক গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ডিজিটাল কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১০ হাজারেরও অধিক গ্রামীণ কারিকর একশপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছেন। ইতোমধ্যে একশপ ৭৫২৪ লাখেরও অধিক পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

কিশোর বাতায়ন কিশোর-কিশোরীদের জন্য নির্মিত একটি শিক্ষামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফরম, যেখানে কিশোর-কিশোরীরা একই সঙ্গে বাতায়নে বিদ্যমান কনটেন্ট দেখতে পারছে এবং নতুন কনটেন্ট যুক্ত করতে পারছে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষক বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। যাতে সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের অডিয়ো, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, চিত্র, ডকুমেন্ট, প্রকাশনা প্রভৃতি কনটেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষক বাতায়নের নিবন্ধিত সদস্য ৫ লাখ ৮৭ হাজারেরও অধিক। কনটেন্টের সংখ্যা ৫ লাখ ২৪ হাজারেরও অধিক এবং মডেল কনটেন্ট সর্বমোট ৯৫৩টি, যা শিক্ষকরা পাঠদানে ব্যবহার করছেন।

'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফরম, যেখানে অনলাইনে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। মুক্তপাঠে এ পর্যন্ত ১১ লাখ ৫৯ হাজারেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধিত রয়েছে, যারা ১৮৭টি কোর্সের বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে এবং ১০ লাখ ১৬ হাজারেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করায় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটুআই প্রোগ্রাম বিভিন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরি এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সব পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে ডিভাইস বা সিস্টেম অথবা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাব। ইতোমধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করতে এটুআই প্রোগ্রাম ১৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনোভেশন হাব' তৈরি করেছে।

নাগরিক সমস্যার উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান গ্রহণের একটি অনলাইন সিস্টেম আইডিয়া ব্যাংক, যেখানে যে কোনো উদ্ভাবক তাদের আইডিয়া জমা দিতে পারেন। আইডিয়া ব্যাংক ব্যবহার করে উদ্ভাবকরা প্রস্তাবিত সমাধান বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা কিংবা স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে পারেন।

আইডিয়া ব্যাংকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সব পর্যায়ে তা দৃঢ়ভাবে মনিটরিং করার জন্য এবং প্রকল্পসংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে আইডিয়া ব্যাংকে প্রায় ১৯ হাজার জন ব্যবহারকারী রয়েছেন। এখন পর্যন্ত আইডিয়া ব্যাংকের মাধ্যমে এটুআই ইনোভেশন ফান্ড (এআইএফ), উইমেন্স ইনোভেশন ক্যাম্প, চ্যালেঞ্জ ফান্ড, ইনোভেশন প্রভৃতি ধাপের মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজার ৮৭১টি আইডিয়া এসেছে, যার মাধ্যমে ২৭২টি আইডিয়াকে অর্থায়ন করা হয়েছে।

বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আন্তালিয়ায় সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাউথ-সাউথ অ্যান্ড ট্রায়াংগুলার কো-অপারেশন নেটওয়ার্ক গঠনের আওতায় পাঁচটি বেস্ট প্র্যাকটিস চিহ্নিত করা হয়েছে। বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি এবং এসডিজি ট্যাকার। এছাড়া সোমালিয়া, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, ফিজি, ফিলিপাইন্স এবং প্যারাগুয়ের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে এসডিজি, ওপেন গভর্নমেন্ট ডেটা, চেঞ্জ ল্যাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও সেবা বা সিস্টেম আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ৬৪ জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের পরিবেশ এবং ভবিষ্যতের জন্য টেকনো-দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষ্যে মাদারীপুরের শিবচরে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট ফর ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি নামে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ব্রেইন চাইল্ড এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন বেকারত্ব দূর হবে, একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে একরকম উল্লম্ফন সৃষ্টি হবে। মূলত এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আশা করি, ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্ববাসী চিনবে।

লেখক: তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং বিজয় ডিজিটাল শিক্ষা সফটওয়্যারের উদ্ভাবক, ডিজিটাল প্রযুক্তির অনেক ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট ও কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী

গণমাধ্যম এখন সবার নিয়ন্ত্রণে!

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের গণমাধ্যম পাঁচ দশকে শাখা-প্রশাখা, ফুলে-ফলে, সৌরভে পল্লবিত। মান নিয়ে আলোচনা হতে পারে, মালিকানায় মুষ্টিমেয়র নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব নিয়ে এমনকি উদ্‌বেগ থাকতে পারে; কিন্তু তা এখন সবার নাগালে এসেছে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং হাল আমলের সামাজিক গণমাধ্যম–কত বিবর্তন, রূপান্তর এবং কী গভীরতা।

সাত দশকের হরতাল ও বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমাকে ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ সাল– এই ৭০ বছরের জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিদিনের কোনো না কোনো সংখ্যা পাঠ করতে হয়েছে। হরতাল ডেকেছে একটি রাজনৈতিক দল কিংবা একাধিক দলের জোট। কখনো কখনো একাধিক জোট মিলিতভাবে হরতাল ডেকেছে। হরতাল কেন ডাকা হয়েছে, কোন দল কিংবা জোট ডেকেছে, কীভাবে পালিত হয়েছে, পুলিশ অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল, হরতালের প্রভাব জনজীবনে কিংবা সরকারের ওপর কতটা পড়েছে–এসব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দল কিংবা জোটের কাছে তেমন তথ্য পাওয়া যায়নি। আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রধানত সংবাদপত্রের ওপর। বাংলাদেশের সংবাদপত্র যে তথ্যের আধার বা ভান্ডার! ইতিহাসের অমূল্য উপাদান সঞ্চিত থাকে এখানে।

পত্রিকার রকমফের আছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর মুসলিম লীগ সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশের মতো কোনো দৈনিক সংবাদপত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাংলা বা ইংরেজি ভাষার পত্রিকায় কখনো কখনো এ ধরনের খবর ছাপা হতো, যাকে মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রীরা অভিহিত করত পাকিস্তান ভাঙার জন্য ভারতীয় চক্রান্ত হিসাবে। তাদের অন্যায়-অনিয়ম-দুর্নীতি যেন প্রকাশ না পায়, সে বিষয়ে সদাসতর্ক ছিল তারা।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। এ খবরটি ২৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় 'পূর্ব বঙ্গে পাল্টা লীগ গঠন। লীগ কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত' শিরোনামে। শব্দসংখ্যা ছিল ৬০টির মতো। সম্মেলনে কী আলোচনা হয়েছে, প্রতিবেদনে এর বিবরণ ছিল না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গোয়েন্দারা যেভাবে প্রতিমুহূর্তে অনুসরণ করত, তার বিবরণ রয়েছে এ পর্যন্ত প্রকাশিত ১০টি খণ্ডে। পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে উত্তাল ছিল শিক্ষাঙ্গন। রাজনৈতিক অঙ্গনেও এর ছাপ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির রক্তে ঢাকা শহর রঞ্জিত হয়। দুই বছরের বেশি সময় ধরে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে তাঁর বিপুল প্রভাব। বামপন্থি মনোভাবের ছাত্রনেতারাও তাঁকে গুরুত্ব দেন। তিনি জেলে বন্দি থাকাবস্থায়ই চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে গোপনে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা হতো দফায় দফায়। পত্রিকায় এসব খবর প্রকাশের সুযোগ ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দাদের কাছে সব খবর পৌঁছে যায়। এখন তাদের প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, বাংলাদেশ ও বিশ্ব জানছে অজানা সব ঘটনা। ১৯৫১ সালের ৮ ডিসেম্বর এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, নিরাপত্তা বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজ খান এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে পুলিশের বিনা অনুমতিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৪ নম্বর কেবিনে কথা বলেছেন। (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩০)

১ জানুয়ারির (১৯৫২) গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধার অপব্যবহার করছেন। (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩৭)

ভাষা আন্দোলন কিংবা মুসলিম লীগবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সব খবর পত্রিকায় আসত না। ইত্তেফাক পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদক। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এ পত্রিকার মাধ্যমে রাজনীতির খবর জানতে পারত। দলীয় কর্মকাণ্ডের কথাও জানত। পত্রিকাটির প্রচার যেন বাড়ে, সেদিকে নজর দলের নেতাদের। ১৯৫২ সালের জুনে শেখ মুজিবুর রহমান (কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তখন তিনি দলের পূর্ব পাকিস্তান কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক) গিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে। সেখান থেকে মানিক মিয়াকে লিখেছেন, ইত্তেফাকের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৬)

এই গোয়েন্দা প্রতিবেদনের এক স্থানে রয়েছে ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ আজিজের লেখা একটি চিঠি। তিনি লিখেছেন দলের প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি লিখেছেন, 'মুজিব ভাই, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চট্টগ্রামে এসে একটি মামলা পরিচালনা করার জন্য ৫ হাজার টাকা পাবেন। এ থেকে এক হাজার টাকা তাকে দেওয়া হবে। বাকি চার হাজার টাকা প্রদান করা হবে ইত্তেফাক পত্রিকা পরিচালনার জন্য। তিনি চট্টগ্রাম অবস্থানকালে আরও বড় বড় মামলা পাবেন, যা থেকে ভাল অর্থ উপার্জন হতে পারে। আপনি বিষয়টি নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবেন।' (গোয়েন্দা প্রতিবেদন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৯)

সাত দশক আগে চার হাজার টাকার 'ক্রয়ক্ষমতা' কিন্তু অনেক। চালের দুই-তিন পয়সায়ই মিলত দৈনিক পত্রিকা। ১৯৫৬ সালের জুনে দৈনিক পত্রিকার মূল্য ছিল বর্তমানের ৬ পয়সা। রেশনে চালের সের ছিল আট আনা বা বর্তমানের ৫০ পয়সা, ৪০ সের বা এক মন ২০ টাকা।

ইত্তেফাক পত্রিকা জনপ্রিয় ও প্রচার বাড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অবদান এভাবে আমরা জানতে পারি। পত্রিকাটি দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর। পরের বছর মার্চে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার নির্বাচন। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটাতে সক্রিয় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দৈনিক ইত্তেফাক এ নির্বাচনের সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বামপন্থি ঘরানার সংবাদ পত্রিকাও তখন বাজারে। মর্নিং নিউজ ও অবজারভার নামে দুটি ইংরেজি পত্রিকা চালু ছিল। আর ছিল আজাদ ও মিল্লাত। শেরেবাংলার দলের পত্রিকা ছিল দৈনিক চাষী। বের হতো সন্ধ্যায়।

আওয়ামী লীগ বরাবরই ছিল এ ভূখণ্ডে প্রধান রাজনৈতিক দল। মানিক মিয়ার লেখনী ও সম্পাদনার গুণে এ পত্রিকাটি পাঠকপ্রিয়তা পায়। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। একই সময়ে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাও ভালো কাজ করতে থাকে। ১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তানে পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা চলছিল। সব মহলে ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে। কেন্দ্রেও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার গঠন করবেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ নির্বাচন যেন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, সেজন্যই জারি হয় সামরিক শাসন (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮)। এ সময়ে চলে তীব্র দমননীতি। কারাগারগুলো রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়।

ঢাকা বেতার বা রেডিয়ো বরাবরই ছিল সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। সামরিক শাসন জারির পর সংবাদপত্রে আরোপিত হয় কঠোর সেন্সর-শিপ। পত্রিকায় কী ছাপা হবে, কী ছাপা যাবে না–সব ঠিক করে দিত সেনা কর্মকর্তারা। প্রতিদিন সেনা অফিসাররা পত্রিকায় হানা দিত। চালের দাম বেড়েছে, সেটা পত্রিকায় লেখা যেত না। শুধু গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যক্তিপর্যায়েও নজরদারি। দিনাজপুরের এক পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পুত্রকে পোস্ট কার্ডে লিখেছিলেন–তোমার কাছে মাসিক খরচের টাকা পাঠাতে সমস্যা হচ্ছে। বাজারে চালের দাম বেড়েছে। সংসারে খরচ বাড়ছে।

নির্দোষ চিঠি। কিন্তু সেটা পড়ল গোয়েন্দাদের হাতে (প্রতিটি পোস্ট অফিসেই প্রতিদিন গোয়েন্দারা হাজির হতো চিঠি সংগ্রহের জন্য। 'আপত্তিকর' কিছু পেলেই রক্ষা নেই)। দিনাজপুরের পিতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া পুত্র, দুজনেরই স্থান হয়েছিল কারাগারে।

সামরিক শাসন জারির পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যেই কিন্তু ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট করে রাজপথে নেমে আসে। কোনো পত্রিকার খবর থেকে আন্দোলনের ডাক আসেনি, কেউ পোস্টার বা লিফলেট প্রকাশ করেনি। পত্রিকায় ছোটো একটি খবর–হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার। এর সূত্র ধরেই ছাত্রদের আন্দোলন সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং গোটা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।

এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে সংবাদপত্র। ইত্তেফাক ও সংবাদ এবং ইংরেজি দৈনিক অবজারভার গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ নেয়।

১৯৬২-১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে এ তিনটি পত্রিকা কার্যত তার মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং তার সাগরেদ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের উসকানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানো হয়। নানা স্থানে হিন্দুরা আক্রমণের শিকার হয়। এ সময় সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রতিবাদে সংবাদ, ইত্তেফাক, আজাদসহ কয়েকটি পত্রিকা অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। শিরোনাম কেউ দেয় 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' কেউ বা 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবল রুখতে সংবাদপত্রের এ ভূমিকা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ নিয়ে এখনো গবেষণা হতে পারে।

এ ভূখণ্ডে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে দিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনন্য। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ও জাতিগত অধিকারের পক্ষে তারা বলিষ্ঠ অবস্থান নেয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বরে কেন্দ্রের হাতে অর্থ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক সব ক্ষমতা রাখার কথা ছিল। কিন্তু ছয় দফায় প্রদেশের হাতে শুল্ক-কর ধার্য এবং তা আদায় ও ব্যয়ের ক্ষমতা প্রদানের দাবি জানানো হয়। রপ্তানি খাত এবং বৈদেশিক ঋণ-অনুদান বিষয়ে প্রদেশের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের কথাও তিনি বলেন। অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির পণ্ডিতদের বুঝতে সমস্যা হয়নি যে পাকিস্তানের কাঠামোতে ছয় দফা আদায় কার্যত অসম্ভব। ইত্তেফাক বিশেষভাবে দাঁড়ায় ছয় দফার পক্ষে। সম্পাদক মানিক মিয়ার লেখা এ ভূখণ্ডের মানুষ লুফে নেয়। ৭ জুন (১৯৬৬) হরতাল পালনের খবর যেন সংবাদপত্রে প্রকাশ না হয়, সেজন্য নির্দেশ জারি হয়। কিন্তু বামপন্থি ঘরানার দৈনিক সংবাদ এ নির্দেশের প্রতিবাদে ৮ জুন পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখে। আইয়ুব খান কয়েকদিন পর ইত্তেফাক প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং সম্পাদক মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে চলে।

ছয় দফা প্রদানের পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। তাঁর অনেক সহকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সর্বত্র ভীতিকর পরিবেশ। সংবাদসহ বিভিন্ন পত্রিকার ওপর সরকারের প্রবল চাপ যেন স্বায়ত্তশাসনের দাবি সামনে না আনে। কিন্তু নির্ভীক অবস্থান নেয় একাধিক পত্রিকা। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিতে গড়ে ওঠা প্রবল গণ-আন্দোলনের খবর প্রকাশে সংবাদপত্র সাহসের পরিচয় দেয়। এ বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হওয়ার পর সংবাদপত্র কার্যত অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর 'সংগ্রাম' বা এ ধরনের দুয়েকটি পত্রিকা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি আপামরসাধারণের সমর্থনকে ভারতের উসকানি হিসাবে চিহ্নিত করত; কিন্তু ইত্তেফাক তখন অপ্রতিহত–বাঙালি কণ্ঠ।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে সংবাদপত্রের ওপর ফের সেন্সরশিপ আরোপ করেন। কিন্তু অচিরেই বাঁধ ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রগুলো সামরিক সরকারের যাবতীয় 'পরামর্শ-নির্দেশ' উপেক্ষা করে।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনকে আমরা দেখি অনন্য এক ভূমিকায়। সামরিক শাসকরা একের পর এক বিধিনিষেধ ও কঠোর নির্দেশ জারি করতে থাকে গণমাধ্যমের ওপর। কিন্তু কেউ তা মানছে না। তারা মেনে চলে '৩২ নম্বরের' নির্দেশ। এখান থেকেই বিকল্প সরকার পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এমনকি জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকাও তাদের বদ মতলব লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। জনরোষ বলে কথা।

> স্বাধীনতার পর অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগ নেয় এমনকি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর একনিষ্ঠ সমর্থকরা। সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হতে থাকে

সেসময়ে ঢাকার ডিআইটি ভবনে কাজ চলত পাকিস্তান টেলিভিশন কেন্দ্রের। কর্ণধার থেকে শিল্পী-কলাকুশলী–সবাই মেনে চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। ২৩ মার্চ সেখানে ঘটে অনন্য এক ঘটনা, যা আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মাসুমা খাতুন পাকিস্তান টেলিভিশনে যোগ দেন ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে। অনুষ্ঠান ঘোষণা করতেন তিনি। সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টাদুয়েক অনুষ্ঠান হতো। সবকিছুই ছিল লাইভ।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে উত্তাল একসময়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরপরই বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এ ভূখণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা টেলিভিশন কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। শিল্পী-কলাকুশলীরা প্রায় সবাই বাঙালি। তারা কাজ করছিল

মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে। প্রতিরাতে অনুষ্ঠান শেষে অবশ্য পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো হতো এবং পতাকা প্রদর্শন করা হতো।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৩ মার্চ দেশের সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানায়। এ দিনটি পাকিস্তান দিবস হিসাবে পালিত হতো। খ্যাতিমান শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন। মার্চের প্রথম থেকেই টেলিভিশনে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন হচ্ছিল। ২৩ মার্চ দিনে মুস্তাফা মনোয়ার জানান, এ দিন অনুষ্ঠান শেষে পাকিস্তানের পতাকা দেখানো হবে না। তবে কাজটি করতে হবে খুব কৌশলে। পাকিস্তানের সৈন্যদের বোকা বানাতে হবে। মাসুমা খাতুনের কাছে জানতে চান–স্বাভাবিক সময়ের পরও ঘণ্টাদুয়েক টেলিভিশন কেন্দ্রে থাকতে পারবেন কি না। মাসুমা খাতুন গৌরবের এক মুহূর্তের সাক্ষী হতে খুবই উৎসাহের সঙ্গে রাত ১২টার পরও থাকতে রাজি হয়ে যান।

২৩ মার্চ নির্ধারিত সময়ের পরও দেশাত্মবোধক গান শোনানো হতে থাকে টেলিভিশনে। পাকিস্তান আর্মির অফিসাররা কিছু সময় পর পর এসে জানতে চায়– কেন এত রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলছে। তাদের বলা হয়–আজ পাকিস্তান দিবস, স্পেশাল ডে। তাই অতিরিক্ত সময় অনুষ্ঠান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অবশেষে এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। উপস্থিত সবাই শিহরিত। মাসুমা খাতুন মাইক্রোফোনে বলেন–'এখন রাত ১২টা ২ মিনিট। আজ ২৪ মার্চ। আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ।'

২৩ মার্চ পাকিস্তান টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্রে পাকিস্তানের পতাকা দেখায়নি।

২৫ মার্চ বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু করে নিষ্ঠুর গণহত্যা বা জেনোসাইড। সংবাদ, ইত্তেফাক ও দ্য পিপল অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো সংবাদপত্রের পক্ষে তখন স্বাধীনতার পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুক্তাঞ্চলে জয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলার বাণীসহ কয়েকটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। হাতে লেখা এবং সাইক্লোস্টাইল করা পত্রিকা দেখা যায় খোদ ঢাকা শহরেই। মুক্তিবাহিনীর সদস্য এবং স্বাধীনতাকামী আপামরসাধারণ–সবার জন্য এসব পত্রিকা ছিল প্রেরণা। আর ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–বাংলাদেশ সরকার যা পরিচালনা করছিল।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা কেবল ঢাকা থেকে নয়, অনেক জেলা থেকেও প্রকাশিত হতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসাবেও দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রকাশ করে 'জয়ধ্বনি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায়ই এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করি এবং তিন বছর এ দায়িত্বে থাকি।

মোজাফফর ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টিও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ প্রকাশ করে 'গণকণ্ঠ'। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশ করেন 'হককথা'। এ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এক সহযোগীকে। সাপ্তাহিক হলিডে ছিল ইংরেজি ভাষার পত্রিকা। সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী চীনের নেতৃত্বের মত ও পথের অনুসারী।

মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। কারও কারও লেখায় বাংলাদেশের যাবতীয় সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী করা হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো হয়। হলিডে পত্রিকায় একটি খবরের শিরোনাম করা হয়–'সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন কলাবরেটর'। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনী শরণার্থী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বহুবিধ কর্মকাণ্ডে যুক্তদের হেয় করার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ।

যুদ্ধাপরাধের দায়ে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর যেসব অফিসারের বিচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, তা বানচাল করায় একটি মহল উঠেপড়ে লাগে। বঙ্গবন্ধু হানাদারমুক্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হয়–'৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার'। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১৬ জুলাই (মাত্র ৭ মাস আগে হানাদারমুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'আপনারা দাবি করেছিলেন, আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতায় যেন কোনোদিন হস্তক্ষেপ না করি। কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের যে আদর্শ আছে, সেগুলো মানলে কি মিথ্যা কথা লেখা যায়?'

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এবং ন্যায়নীতির পরিপন্থি যেসব সংবাদ সেসময় প্রকাশিত হচ্ছিল, তিনি তার কিছু উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩০ লাখ টন। বিদেশ থেকে এনেছি ১৭ লাখ টন। ভারত সাড়ে সাত লাখ টন খাবার দিয়েছে। ইউএসএ, আনরড, কানাডা ও রাশিয়া থেকেও খাবার পাওয়া গেছে। অথচ কোনো কোনো খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে '৫০ লাখ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাচার'।"

তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রশ্ন রাখেন–'যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমার দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, এখানে বসে কেউ যদি তার বীজ বপন করতে চান তাহলে কি আপনারা সহ্য করবেন?'

তিনি বলেন, 'আমাদের পোর্ট বন্ধ, রাস্তা নাই। গুদামে চাল নাই। এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা নাই। রাজস্ব আদায় নাই। তবু আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০টা দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে।' (বাঙালির কণ্ঠ, পৃ. ৩১০-৩১১)

মনোবেদনার সঙ্গে, বড়োই কষ্টে বঙ্গবন্ধু ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলনে বলেছিলেন, '১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল ল জারি হয়েছিল এবং আমাকে বন্দি করা হয়েছিল, তখন এরা কিছুই লেখে নাই। আবার এরাই এখন লেখেন–চালের মন ১২০ টাকা।...চালের দাম মিথ্যা করে বাড়িয়ে লেখার অর্থ অন্য জায়গায় আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এসব কথা যারা লেখে, তারা মানুষের জীবন নিয়ে রাজনীতি করে। এর নাম কি সাংবাদিকদের স্বাধীনতা? (বাঙালির কণ্ঠ, পৃ. ৩১৩)

যে ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে অবদান রেখেছেন, সেই পত্রিকাটি অবস্থান নেয় সরকারের বিরুদ্ধে। এখানেই থেমে থাকেনি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ইত্তেফাক অবস্থান নেয় খুনিদের পক্ষে।

স্বাধীনতার পর অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগ নেয় এমনকি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর একনিষ্ঠ সমর্থকরা। সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো হতে থাকে। অগণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে পাকিস্তান আমলে সোচ্চার হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দল। সেসময়ে যারা চুপচাপ থেকে অন্যায়কে মেনে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুযোগে তারা 'নিজের মতো কথা বলতে ও লিখতে শুরু করে'। বঙ্গবন্ধু

হত্যাকাণ্ডের পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু পরাধীনতার সমর্থনেও দাঁড়ায় সংবাদকর্মীদের একটি অংশ। বঙ্গবন্ধুর সরকার 'যা খুশি লেখা ও বলার' বিরুদ্ধে কিছু বললে যারা হইহই করে মাঠে নেমে পড়ত, তারা সামরিক শাসনামলে সবকিছু হজম করে নেয়। কেউ কেউ তো প্রবলভাবে নেমে পড়ে সমর্থন জানানোর জন্য।

জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়, জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর মানবতাবিরোধী অপরাধের কথা প্রকাশ ও প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হতে থাকে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার দাবিতে উচ্চকণ্ঠ একটি মহল এ অন্যায় মেনে নেয়। তবে গণমাধ্যমের এটাই মুখ্য ধারা বলা যাবে না। আশির দশকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট–এসব শব্দ সংবাদপত্রে লেখা নিষিদ্ধ করেন। তাঁর বিবেচনায় এভাবে সংবাদপত্র অস্থিরতা সৃষ্টিতে উসকানি দিচ্ছে। কিন্তু দেখা যায়, সংবাদপত্রগুলো বিকল্প বের করে নিতে পেরেছে। 'আজ সকাল-সন্ধ্যা হরতাল'–এর পরিবর্তে সংবাদপত্র লিখতে থাকে–'আজ সকাল-সন্ধ্যা কর্মসূচি'। পাঠকদেরও বুঝতে সমস্যা হয়নি।

এই সামরিক শাসকের ধারণা হয়েছিল যে, সংবাদপত্রের কারণেই তিনি যেসব উন্নয়ন করছেন, তা জনগণ জানতে পারছে না। বরং তারা সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির পাশে থাকছে। এ কারণে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর বিবেচনায় সংবাদপত্র বন্ধ থাকলেও ক্ষতি নেই। 'রেডিয়ো বাংলাদেশ' এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি তো পুরোপুরি সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে।

১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশের সব সংবাদপত্র অবিরাম ধর্মঘটে যায় কয়েকটি দাবিতে–বাংলাদেশ অবজারভার ও চিত্রালী পত্রিকার সমস্যার সমাধান করতে হবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। সাংবাদিক ও কর্মচারীদের নিয়োগপত্র দিতে হবে এবং মালিকদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

সাধারণত ধর্মঘট শুরু হলে এর অবসানে সরকার তৎপর হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে টানা ধর্মঘট শুরু হওয়ার পরও এরশাদ সরকার নীরব থাকার কৌশল নেয়। তাদের কাছে এ ধর্মঘট আশীর্বাদ হয়ে আসে। ১৫ অক্টোবর ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটসহ অনেক রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বয়কট করে। জনগণকেও তারা বয়কটের আহ্বান জানায়। নির্বাচনের আগে ও পরে এবং নির্বাচনের দিন ডাকে হরতাল। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি ফারুক প্রার্থী হয় এবং তাকে রেডিয়ো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'জাতির উদ্দেশে ভাষণ' দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়।

ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচন 'নির্বিঘ্নে' সম্পন্ন হওয়ার পর বিপুল ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সংবাদপত্রের ধর্মঘট অবসানে উদ্যোগী হন এবং সাফল্য পেয়ে যান।

রেডিয়ো ও টেলিভিশনে সরকারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রেক্ষাপটে এরশাদ-শাসন অবসানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বর তিন জোটের রূপরেখায় এ দুটি গণমাধ্যমকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি যুক্ত করা হয়। টেলিভিশনকে তখন বলা হতো সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স। সাহেব মানে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ, বিবি হচ্ছে তাঁর স্ত্রী–স্বঘোষিত ফার্স্ট লেডি বেগম রওশন এরশাদ এবং গোলাম হচ্ছে রাষ্ট্রপতির অনুগত মন্ত্রীরা।

কিন্তু ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসনের দাবি মানেনি। এ দুটি মাধ্যম চলতে থাকে সেই আগের নিয়মেই। পার্থক্য ছিল–সাহেব নেই, বিবি-গোলাম যেন আগের জমানার চেয়েও ক্ষমতাধর।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসে। বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য গঠিত হয় কমিশন। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মনোভাব পরিবর্তন করেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখেন; কিন্তু বেসরকারি খাতে টেলিভিশন কেন্দ্র একুশে টেলিভিশন চালুর অনুমতি দেন। ১৯৯৮ সালের জুলাইয়ে যাত্রা শুরু করে একুশে টেলিভিশন, যা বাংলাদেশ টেলিভিশনের কাছ থেকে সারা দেশে একযোগে দেখার কারিগরি সুবিধা লাভ করে। দ্রুতই এ টেলিভিশন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল শুধু নয়, এ টেলিভিশন পরিণত হয় 'সবার কণ্ঠে'। বিজ্ঞাপনদাতা বিটিভির পরিবর্তে একুশে টিভিকে প্রাধান্য দিতে থাকে। কারণ একুশের দর্শক বেশি, বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। একুশে টিভির বাংলা সংবাদ প্রচারিত হতো সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। কয়েক দশক ধরে বিবিসির প্রধান বাংলা খবর প্রচার হতো এ সময়ে, যার জনপ্রিয়তার জুড়ি ছিল না। কিন্তু একুশের সাড়ে ৭টার সংবাদ জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণে বিবিসিকে ছাড়িয়ে যায়।

ক্রমে প্রচার শুরু করে এটিএন এবং চ্যানেল আই। আওয়ামী লীগের জন্য দুর্ভাগ্য ছিল, ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে তাদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি একুশে টেলিভিশন বিএনপি-জামায়াতে ইসলামীর জোটের পক্ষে তুলনামূলক বেশি কাজ করে। তবে এখানেই ট্র্যাজেডির শেষ হয় না–খালেদা জিয়া একুশে টেলিভিশনকেই বন্ধ করে দেন। সাংবাদিকদের একটি অংশ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থি এ পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। শুধু তাই নয়, এ মহলকে কাজে লাগিয়ে তিনি ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিক ইউনিয়নে বিভক্তি সৃষ্টি করেন। সেই সময় থেকে বাংলাদেশের সাংবাদিক ইউনিয়ন পেশাগত অধিকার নিয়ে কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, বরং প্রদর্শন করে চলেছে রাজনৈতিক আনুগত্য।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বেসরকারি খাতে গণমাধ্যম আরও উন্মুক্ত করে দেয়। একের পর এক টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হতে থাকে। বেতার সম্প্রচার উন্মুক্ত হয়। দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ হতে থাকে সব জেলা থেকে। এমনকি কোনো কোনো উপজেলা থেকেও প্রকাশিত হয় দৈনিক পত্রিকা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ সুবিধার কারণে ভিন্নধর্মী টেলিভিশন ধরনের সম্প্রচারও আমরা দেখি। জুম এবং অন্যান্য প্রযুক্তি চালু হওয়ায় অডিয়ো-ভিজুয়াল গণমাধ্যম পেয়েছে নতুন মাত্রা। এক ব্যক্তির পক্ষেও এখন 'টেলিভিশন-ধরনের' অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব।

আর ফেসবুক-ইউটিউব? সবার তা হাতের নাগালে। ঘরে ঘরে নয়, হাতে হাতে গণমাধ্যম। কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্বের নানা দেশে, নানা প্রান্তে বসে অপারেট হচ্ছে বাংলাদেশের গণমাধ্যম।

ধর্মান্ধ চরমপন্থি একটি মহল বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানে না। তারা বিজ্ঞানের সত্য অস্বীকার করে। কুসংস্কার ছড়ায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে তারা প্রবল উৎসাহী। দক্ষতাও দেখাচ্ছে। মন্দ কাজে ভালোর ব্যবহার!

গণমাধ্যম বিষয়ে আমাদের যুগ যুগের ধারণা পালটে যাচ্ছে অসম্ভব দ্রুততায়। এর সুফল কিংবা মন্দ ফল কতটা–ভিন্ন আলোচনার বিষয়। কীভাবে এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, সেটা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে। মানিয়ে চলার বিষয়টি কেবল রাষ্ট্রের নয়, লাখো-কোটি প্রতিষ্ঠানের নয়–শত শত ব্যক্তির জন্যও। কীভাবে তা করা যাবে, কিংবা আদৌ যাবে কি না–মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

স্থানীয় সরকার প্রেক্ষিত ও প্রক্ষেপণ

তোফায়েল আহমেদ

'A nation may establish a free government but without municipal institutions it cannot have the spirit of liberty.'

–Alexis de Tocqueville

সরকারব্যবস্থার (Govermental System) বিদ্যমান ধারণা মানবমানসে উদয়ের পূর্ব থেকে মনুষ্যসমাজে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একটি রূপ, কাঠামো ও আদল তৈরি হয়ে যায়। সেটি যতই প্রাচীন, আদিম, অগঠিত হোক–ওই কাঠামোই ছিল মানুষের আদি শাসন কাঠামো, যার উত্তরাধিকার যুগে যুগে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তা সেই আদিম পশু শিকারি, মৎস্য শিকারি, পশুপালক, যাযাবর, যূথবদ্ধ 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ', কৌমসমাজ তা যাই-ই হোক, তা ছিল মূলত একটি ক্ষুদ্র এলাকাজুড়ে তাদের জীবনযাত্রা সম্পৃক্ত একটি স্বাভাবিক সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। প্রকৃত অর্থে, রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোর আদি রূপ ছিল এই ব্যক্তিগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত 'স্থানীয় শাসন'। একটি যূথপ্রধান, দলপ্রধান বা একজন বা একদল শক্তিশালী ব্যক্তির অধীনে জীবনযাত্রাকে চালিয়ে নেওয়ার এ নিয়মই ছিল তখনকার শাসন। ধীরে ধীরে উৎপাদনব্যবস্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রম সম্পর্ক ও পুঁজির বিকাশ হয়। শিকারি ও পশুপালক হয় কৃষক। কৃষির সঙ্গে দাসশ্রম যুক্ত হয়ে পত্তন ঘটে দাসসমাজ ও সামন্তসমাজের। তখনও সমাজ ও রাষ্ট্র থাকে মূলত 'স্থানীয়' এবং এর পরিসর ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কৃষিসভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে বা প্রয়োজনে কেউ হয়ে যায় দাস শ্রমিক, কেউ দাস মালিক। কৃষি আরও বিকশিত হলে কৃষির ভেতর থেকেই পত্তন ঘটে শিল্পসভ্যতার। কৃষিসভ্যতা বিকাশের একটি পর্যায়ে গড়ে উঠে কুশলী

শিল্পী-কারিকরগোষ্ঠী। শিল্পী-কারিকরদের সঙ্গে বণিকের মেলবন্ধনে গড়ে উঠে 'নগর'। নগরে গড়ে উঠে শিল্প-কলকারখানা। এভাবে রাষ্ট্র-সমাজ বড়ো হতে থাকে। রাষ্ট্র অবশেষে একটি অধিপতি শ্রেণির করতলগত হয়। রাষ্ট্রের একটি শ্রেণিচরিত্র প্রকাশ পায়, সঙ্গে পরিবর্তিত হয় তার আদল, রূপ, কাঠামো ও বিস্তৃতি। স্থানীয়তা জাতীয়তার এবং জাতীয়তা বহুজাতীয়তার প্রভাবাধীন হয়। আদিম সাম্যবাদীযুগ, দাসযুগ, সামন্তযুগ পেরিয়ে বণিকযুগ, পুঁজিবাদীযুগ এবং হয়তো এখন আমরা উত্তর-পুঁজিবাদীযুগে বাস করছি। কিন্তু ক্ষুদ্র-স্থানীয়তা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়তার একটি পরিসর সবাই সর্বত্র লালন করি।

ক্ষুদ্র 'নগররাষ্ট্র' এখন অনেক গ্রাম, নগর, জনপদ, অঞ্চল, দেশ ও জাতি নিয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র। সামসময়িককালে তাই 'সুশাসনের' প্রয়োজনে রাষ্ট্রগুলো তার বৃহত্তর আঙ্গিকের ভেতরেও ক্ষুদ্রাকারের 'স্থানীয়তা'কে কিছু কিছু পরিসর ছেড়ে দিচ্ছে। ঊনবিংশ শতক থেকে স্বশাসন ও সুশাসন দুই সূত্রেই আধুনিক সরকারগুলোর একটি বিশিষ্ট 'স্থানীয়' আদল ও কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। সুশাসনের ধারণার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে 'স্থানীয়তার' কদরও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কেন্দ্রীয় বা জাতিরাষ্ট্র দুর্বল হয়নি। বরং তাতে জাতিরাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে। কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র থেকে বিকেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র অধিক সক্ষম ও শক্তিশালী–এটি ধ্রুব সত্য হিসাবে প্রমাণিত। আধুনিক উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রগুলো ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্রের পৃথক ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। 'জাতীয় রাষ্ট্র' মূল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া (Capitalist Production Process) নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা করে এবং 'স্থানীয় রাষ্ট্র' (Local State) সামাজিক পুনরুৎপাদন (Social Reproduction) প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করে। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো পুঁজিবাদী সমাজ ও উৎপাদন কাঠামো স্থিতিশীল এবং পুঁজির স্বার্থে ব্যয় সাশ্রয়ী রাখা। স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তারা স্থানীয়ভাবে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করায় শ্রমিকের মজুরিব্যবস্থার ওপর মালিকের বাড়তি চাপ কমে। তাই বলা হয়: 'মাতৃ জঠর থেকে গোরস্থান একজন ব্রিটিশ নাগরিক স্থানীয় রাষ্ট্র তথা স্থানীয় সরকারের সেবার আওতায় থাকে'।

ব্রিটিশ স্থানীয় রাষ্ট্র একজন নাগরিকের জীবনচক্রব্যাপী নানা প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে। তাতে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভালো করতে পারে। পুঁজিপতি শ্রেণির জন্য অব্যাহতভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক, শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তির সরবরাহ নিশ্চিত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ সহনীয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য শ্রমিকের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগ-যানবাহন, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা, বিনোদন প্রভৃতি সামাজিক ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় রাষ্ট্র দেখাশোনা করে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধু অর্থ জোগান দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। নানা সামাজিক সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র চাপ, তাপ ও ভারমুক্ত থাকে। মোট কথা, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাষ্ট্র পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে কাজ করে। পরস্পরের তাপ ও চাপ গ্রহণ করে সমাজকে স্থিতিশীল রাখে।[১]

কর্ম ও দায়িত্বের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন হলে কর্মসম্পাদন দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়। সব দায়িত্ব একক স্কন্ধে বহনের ফলাফল হয়–পরিশেষে অনেক কর্ম অসম্পাদিত বা অর্ধ-সম্পাদিত থাকা। উন্নত পশ্চিমা সমাজে নগর শাসনের স্বশাসিত কাঠামো তাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই দেখা যায়, ব্রিটিশ রাজনীতির দুটি ধারা–একদিকে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে 'হোয়াইট হল' দখল, অপরদিকে স্থানীয় নির্বাচনের রাজনীতির মাধ্যমে 'টাউন হল' দখল। জাতীয় রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাষ্ট্রের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্য ও ক্ষমতা-কর্তৃত্বের ভাগাভাগি এমনভাবে করা হয়–তারা কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, অপরিহার্যভাবে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধারণা–এতে অর্থসম্পদ, সময় ও শক্তি সাশ্রয় হয়; জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় ও জাতীয় গণতন্ত্র উভয়ই শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র পুঁজির নির্বিঘ্ন বিকাশের স্বার্থে সুশাসনকে অপরিহার্য মনে করে। সুশাসনের অন্যতম উপায় হিসাবে স্বশাসিত বিকেন্দ্রায়িত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং সক্ষম ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সে সুশাসনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের পশ্চিমা উদারনৈতিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা বিশেষত জন স্টুয়ার্ড মিল (১৮৫৯), ডি টকিয়াভেলি (১৮৩৫), হেরল্ড লাস্কি (১৯৩১), জেরেমি বেনথাম, সিএইচ উইলসন (১৯৪৮) প্রমুখ জাতীয় গণতন্ত্র বিকাশের পূর্বশর্ত হিসাবে স্থানীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে একটি প্রধান উপজীব্য হিসাবে ভেবেছেন। সমাজে স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠশালা হিসাবে স্থানীয় সরকারকে মূল্যায়ন করেছেন।[২] ঔপনিবেশিক শাসনকালে যে স্থানীয় শাসনকাঠামো ভারতে ব্রিটিশ চালু করে তাতে সত্যিকার অর্থে ব্রিটেনের স্থানীয় সরকারের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আদল কোনোটারই প্রতিফলন ঘটেনি। এখানে রাজ অনুগত তথা রাজ কর্মচারী অনুগত বশংবদ একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি ভেতরগতভাবে প্রকৃত অর্থে গুরুত্ব পায়। ব্রিটেনে তৎকালে 'হুইগ ও ইউটিলিটারিয়ান'দের দ্বন্দ্ব ভারতে এসে 'মনরো এবং কর্নওয়ালিশ' স্কুলের দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ পেলেও উদারভাবাপন্ন 'মনরো স্কুল' ভারতে পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনের সংকীর্ণ কর্তৃত্ববাদী ধারাটি জয়লাভ করে। তৎকালে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে মেকেলের প্রাচ্য পদ্ধতি ও বেন্টিকের পাশ্চাত্য পদ্ধতির দ্বন্দ্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ভারতীয় হয়েও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাবলম্বন করায় শিক্ষাক্ষেত্রে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার যে সুফলটা পাওয়া যায়, স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বিষয়টি সেভাবে উপলব্ধি করেনি।[৩] শুরুতেই ভারতের স্থানীয় শাসন কাঠামো ও কার্যক্রম দুটোই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ পথেই বিকশিত হতে থাকে।

ভারতে স্বাধীনতার পর গান্ধীর 'গ্রাম স্বরাজ' আন্দোলন, জওহরলাল নেহরুর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের আধুনিক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং এসকে দে (নেহরু মন্ত্রিসভার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার) নামক আমেরিকাপ্রবাসী এক বাঙালির অবদানে ভারতে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট'-এর পথ ধরে গান্ধীর পঞ্চায়েতব্যবস্থার স্বপ্ন তার অনুপস্থিতিতেও একটি ভিন্নতর গতি ও মাত্রা লাভ করে। যদিও ভারতীয় সংবিধানপ্রণেতা ড. বিআর অম্বেদকার স্থানীয় সরকার বা পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে সংবিধানে যথাযুক্ত স্থান দেননি। তার বিশ্বাস ছিল–ভারতে পঞ্চায়েত প্রথা শক্তিশালী করা হলে তাতে কর্তৃত্ববাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। দলিতসহ সব নীচুবর্ণের মানুষ সাংবিধানিকভাবে উচ্চবর্ণের শাসনের একটি স্থায়ী ফাঁদে পড়ে যাবে। ভারতের রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে বামদের সফলতার হাত ধরে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাচর্চায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, ওড়িশাসহ বেশকিছু বাম ও অ-বামশাসিত রাজ্যে সরকার স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখানোর পর ১৯৮৯ সালে কংগ্রেস সরকার লোকসভায় একটি বিল পেশ করে।

বিলটি লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হলেও রাজ্যসভায় পরাস্ত হয়। কংগ্রেস তখন সংসদ বাতিল করে নতুন নির্বাচন দিলে ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বে 'ইউনাইটেট ফ্রন্ট' সরকার পুনরায় বিলটি সংসদের মুখোমুখি করে। এক মাসের মাথায় ভিপি সিং সরকারের পতন হলে পুনরায় বিলটির ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বিলটি পুনরায় উঠানো হয়। দীর্ঘ আলোচনা এবং অনেক পরিবর্তনের পর ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর লোকসভায় বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এবং পরের দিন একইভাবে রাজ্যসভায়ও বিলটি পাশ করা হয়। তারপর সারা ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলোর অর্ধেকের বেশি এ বিল রেটিপাই করার পর রাষ্ট্রপতি ১৯৯৩ সালের ২০ এপ্রিল সংশোধনী বিলে স্বাক্ষর করেন, এটি আইনে পরিণত হয় এবং 'ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী-১৯৯২' হিসাবে গেজেটভুক্ত হয়। একইভাবে সম্পূরক আরও একটি সংশোধনী ৭৪তম সংশোধনী হিসাবে পাশ করা হয়। এভাবে সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকারের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভিত্তি ভারতে গঠিত হয়। তবে তা ছিল অনেকদিন ধরে অনেক লোকের চিন্তা, কর্ম ও সংগ্রামের ফসল।[৪]

ভারতের নানা স্তরের বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক চিন্তকরা এ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন লেখালেখি ও আন্দোলন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাসু, ওড়িশার নবীন পটনায়ক, কেরালার ইএমএস নাম্বুদ্রিপাদ, কর্ণাটকের নাজির সাহেব এ বিল রচনা এবং এর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। প্রবীণ কংগ্রেস রাজনীতিবিদ এবং সে সময়কার ইউনিয়ন পঞ্চায়েতমন্ত্রী মণি শঙ্কর আয়ার মন্ত্রী হওয়ার আগে এবং মন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সব দল সর্বসম্মতভাবে সংবিধানের এ সংশোধনী বিল পাশ করে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে। এ সংশোধনীবলে ভারতের স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় সরকারের সপক্ষে কিছু 'গ্যারান্টি ক্লজ' (Clouse) যুক্ত হয়। ভারতে স্থানীয় সরকার রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হস্তান্তরিত বিষয়। স্থানীয় সরকারবিষয়ক আইনগুলো নিজ নিজ রাজ্যের বিধানসভায় পাশ করা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের পর সব রাজ্যের জন্য সংবিধানের স্থানীয় সরকারবিষয়ক সাংবিধানিক বিধানগুলো মানা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। নতুবা রাজ্যস্তরের বিধানসভার সদস্যরা বাংলাদেশের মতো স্থানীয় সরকার নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে নতুন শক্তিকেন্দ্র হিসাবে সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে অনেক আপসরফা করা হয়েছে। বিশেষত স্থানীয় সরকারের জেলা ও ব্লক পর্যায়ের এককে তাদের সদস্যপদ দান ও ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান এর একটি উদাহরণ। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ:[৫]

১. ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত প্রতিটি রাজ্যে গ্রাম, মধ্যবর্তী পর্যায় (ব্লক বা মণ্ডল) ও জেলা–এ তিন পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পরিষদ থাকবে। শুধু ২০ লাখের কম জনসংখ্যা-সংবলিত রাজ্যগুলোয় নিজ নিজ বিধানসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুই স্তর স্থানীয় সরকার হতে পারবে।

২. পঞ্চায়েতব্যবস্থার জবাবদিহিতা ও নজরদারির জন্য প্রতিটি গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকায় 'গ্রামসভা' বা গ্রাম সংসদ গঠিত হবে।

৩. সংবিধান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শাসন ইউনিট যথা কেন্দ্র বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সরকারের (পঞ্চায়ত রাজ প্রতিষ্ঠান ও পৌর এলাকা) কর্ম-এলাকা ও বিষয় বিভাজন করে পৃথক চারটি বিষয় তালিকা করে দিয়েছে, যথা: ফেডরেল বিষয়াবলি, রাজ্য সরকারের বিষয়াবলি, স্থানীয় সরকারের বিষয়াবলি এবং যৌথ বিষয়াবলি বা কনকারেন্ট সাবজেক্ট। এভাবে রাষ্ট্রের কাজের বিষয়গুলোর পরিষ্কার বিভাজন রয়েছে। এভাবে স্থানীয় সরকারের জন্য ২৯টি বিষয় নির্ধারণ করা আছে, যেখানে রাজ্য সরকার বা ইউনিয়ন সরকার হস্তক্ষেপ করবে না।

৪. অর্থায়নে ন্যায্যতা ও সামঞ্জস্যতাবিধানের জন্য পাঁচ বছর পর পর রাজ্য পর্যায়ে 'স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন' গঠিত হবে। এ কমিশনের সুপারিশের আলোকে রাজ্য সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করবে।

৫. প্রতিটি জেলায় একটি জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (District Planning Authority) গঠিত হবে। যার সভাপতি থাকবেন জেলা পরিষদ সভাপতি এবং সদস্যসচিব হবেন জেলার কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (DC & DM)। এ কর্তৃপক্ষ জেলার সব পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন মূল্যায়ন ও মনিটরিং করবে।

৬. নারী, শিডিউল কাস্ট ও শিডিউল ট্রাইবের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং তা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে। নারীর জন্য সদস্যপদ, সহসভাপতি ও সভাপতির পদও সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়।

পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের একীভূত আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। একীভূত আইনের কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নির্বাচন একটি একক তপশিলে অনুষ্ঠিত হয়। তবে সব রাজ্যে সমানভাবে দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে, তা বলা যাবে না। তবে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা নিয়ে ভারতে একাডেমিক ও রাজনীতিবিদরা নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় এবং প্রতিনিয়ত এর নানামুখী উন্নয়ন হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশ উপমহাদেশের বিভক্তি ও স্বাধীনতার পর পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌর কমিটি বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর উত্তরাধিকার নিয়ে স্থানীয় সরকার শুরু করলেও প্রদেশ এবং কেন্দ্রের সরকার ও সংবিধান নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার কারণে স্থানীয় সরকারের বিষয়টির ওপর স্পষ্ট আলোচনা শুরু হয়নি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের বিধান করা হলেও সেটি কার্যকর হয়নি। ১৯৫৯ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর ১৯৫৬-এর সংবিধান বাতিল হয়। সামরিক ফরমানে দেশ চলতে থাকে এবং ১৯৬২ সালে সামরিক সরকার কর্তৃক একটি 'সংবিধান' প্রণীত হয়। সে সংবিধান ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মূলনীতিগুলোর আমূল পরিবর্তন করে সর্বময় ক্ষমতার আধার একটি 'রাষ্ট্রপতিশাসিত' সরকারপদ্ধতি প্রবর্তন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার বিলুপ্ত করে একটি নতুন নির্বাচনি পদ্ধতি সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটদানের (৪০,০০০+৪০,০০০) ৮০ হাজার মৌল একক বা ৮০ হাজার নির্বাচকমণ্ডলীর (Electoral College) রূপরেখার অধীনে একটি নতুন রাজনৈতিক (শাসন) কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'মৌলিক গণতন্ত্র' (Basic Democracy)। মৌলিক গণতন্ত্রব্যবস্থার অধীনে চার স্তরের একটি স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ ব্যবস্থার অধীনে সারা পাকিস্তানে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানে আংশিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। সে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ছিল শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা মেম্বার নির্বাচন। এই নির্বাচিত মেম্বার বা সদস্যরাই সারা পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীন মোট পাঁচটি নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী হিসাবে ভোট দিতেন। তারা

ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, জেলা কাউন্সিলের সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য (East Pakistan Provincial Assembly), জাতীয় পরিষদের সদস্য (Pakistan National Assembly) এবং দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। আর চার স্তরের স্থানীয় সরকারগুলো ছিল মূলত ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। থানা ও বিভাগীয় কাউন্সিল ছিল পুরোপুরি সরকারি কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত। থানা কাউন্সিলের সভাপতি থাকতেন এসডিও এবং সংশ্লিষ্ট থানার সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) হতেন ভাইস চেয়ারম্যান। জেলা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন, তবে চেয়ারম্যান ছিলেন পদাধিকারবলে ডেপুটি কমিশনার। বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার।

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ উত্তরাধিকার হিসাবে যে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডব্যবস্থা ছিল, তা মৌলিক গণতন্ত্রব্যবস্থা থেকে জনপ্রতিনিধিত্ব ও কার্যক্রমের দিক থেকে ছিল অনেক অগ্রসর, গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। মৌলিক গণতন্ত্রব্যবস্থায় পুরো জাতীয় রাজনীতির ভার ক্ষুদ্র ও অসহায় গরিব ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যের ওপর অর্পিত হয়। দেশের বাকি জনগণ ভোটাধিকারবঞ্চিত হন। এ দুর্বহ রাজনীতির ভার তারা শেষ পর্যন্ত বইতে ও সইতে পারেননি। ড. আখতার হামিদ খানের ভাষায়, '*আইয়ুব গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের মতো মাস্টার বিল্ডার হতে চেয়েছিলেন, মাও সেতুংয়ের সেই রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য ও দূরদর্শিতা তার ছিল না। তিনি স্থানীয় সরকারের ভেড়ার ওপর জাতীয় রাজনীতির ষাঁড়কে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে নিরীহ ও দুর্বল ভেড়া মারা যায়।*'[৬]

১৯৭০ সালে জনগণ ভোটাধিকার ফেরত পায়। ১৯৭০-এ প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্বজনীন ভোটধিকার প্রয়োগ করার পর সংখ্যারিষ্ঠতা পাওয়া দলকে আইনত ক্ষমতা হস্তান্তরের অস্বীকৃতির কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলার মানুষ রুখে দাঁড়ালে সেখানে একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ জন্মলাভ করে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তৈরি হয় সংবিধান এবং ১৯৭৩ সালে নতুন সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন হয়। বাকি বিভাগ, জেলা ও থানাপর্যায়ে ১৯৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার গঠিত হয়নি। জেলা পরিষদের ভৌত ও সাংগঠনিক অবকাঠামো থাকলেও স্থানীয় সরকার সংস্থা হিসাবে জেলা পরিষদকে পুনর্গঠন করা হয়নি। বিভাগীয় কাউন্সিলের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটে। থানা পরিষদ জনপ্রতিনিধিত্বশীল কোনো কাঠামো সৃষ্টি না করে নানাভাবে সরকরি সার্কুলার দিয়ে তা চালানো হয়। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের শাসনামলে ১০ বছর থানা পর্যায়ে 'উপজেলা পরিষদ' চালু হয় এবং কার্যশীল থাকে। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করে উপজেলা বাতিল করে। বিলুপ্ত হওয়ার ১৮ বছর পর ২০১০ সাল থেকে আওয়ামী সরকার আবার তা চালু করে। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর প্রথমবারের মতো ২০১৬ সালে জেলা পরিষদের নির্বাচন হয়। এখন দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ–এ তিন স্তরের স্থানীয় সরকার চালু আছে। নগর অঞ্চলে চালু আছে পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন।

ব্রিটিশের বিকৃত ও বিকলাঙ্গ স্থানীয় সরকার ও শাসন যা ভারতে চালু করা হয়, স্বাধীন ভারতবর্ষ সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং অন্তত ৪৫ বছর পর সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে একটি নিজস্ব নতুন পথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান ব্রিটিশের বিকলাঙ্গব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে। তার নাক, মুখ, হাত, পা–সব ঠিক রেখে একটি চোখ কানা করে দেয় এবং তার মাথাটি কেটে ফেলে। সে শুধু একদিকে দেখতে পেত; কিন্তু কোনো কিছু চিন্তা করার মতো মাথাটি তার ছিল না। ফলে তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় তারা শুধু আইয়ুব খান ও মুসলিম লীগ ছাড়া আর কিছু যেন দেখতে, শুনতে ও বুঝতে পারত না এবং স্থানীয় আমলারা তা নিশ্চিত করতেন।

আমাদের উত্তরাধিকারের যে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, সেখানে একটি আমূল পরিবর্তন না আনতে পারলে আমরা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব না। এ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে একটি নতুন বিপ্লবসাধন করতে পারে। সে লক্ষ্যে নিম্নে কটি সুপারিশ দেওয়া হলো। এগুলো ইতঃপূর্বে আমার এবং আরও অনেকের গবেষণায় এসেছে।[৭]

১. দেশের খ্যাতনামা একাডেমিক ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিশন গঠন করে স্থানীয় শাসন (Local Governance Reform) সংস্কারের বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সুপারিশ গ্রহণ।

২. দেশে যেহেতু সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান, স্থানীয় সরকারব্যবস্থার আদল, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি সংসদীয় পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুনর্গঠিত হোক। তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রচর্চায় স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচিত হবে।

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে একীভূত একটি শাসন ও সেবা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণীত হোক।

৪. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হোক। এখন দেশের পরিকল্পনা কাঠামোতে জাতীয়-স্থানীয় কোনো যোগসূত্র নেই।

৫. স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন ও অর্থায়নের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক অর্থায়ন ও পরিকল্পনা চালু করা হোক।

তথ্যসূত্র

১. Tofail Ahmed (2012) Decentralisation and the Local State: A study on the political Economy of Local Governance In Bangladesh, Agamee, Dhaka, PP-66-73.

২. B.C Smith (1985), Decentralisation: Territorial dimension of the State, Allen and Unwin, London

৩. Nazmul Abedeen, Local administration in India, Pakistan and Bangladesh, NIPA, Dhaka

৪. George Matthew (2002) Panchayati Raj: From Lagislation to movement, Concept Publishing House, New Delhi.

৫. Mani Shankar Aiyar (2005) Panchayat Raj: The Way Forward in L G Jain (Ed) Decentralisation and Local Governance, Orient Longman, New Delhi, PP-63-79.

৬. The Works of Akhter Hamid Khan, Vol -3, BARD, Comilla (1986).

7. Tofail Ahmed (2016) Bangladesh: Reform Agenda for Local Governance, Prothoma Prokashan, Dhaka

লেখক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসনের সাবেক অধ্যাপক
স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ

পঞ্চাশে বাংলাদেশ: গণমুখী নেতৃত্বের পরম্পরায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

ড. আতিউর রহমান

ডিসেম্বর বাঙালির অহংকারের মাস। বিজয়ের মাস। আবার দারুণ কষ্টেরও মাস। এ মাসেরই ষোলো তারিখে ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে যৌথবাহিনীর কাছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। আবার এ মাসেরই চৌদ্দ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান শিক্ষকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হানাদার পাকিস্তানিদের দোসর রাজাকার-আলবদরদের বিশেষ গেস্টাপো বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের এই হত্যাকাণ্ড বিজয়ের আনন্দকে ম্লান করে দেয়। তবু সেদিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষ বিজয়ের সুবাতাস বুকে নেওয়ার জন্য মনের কষ্ট মনেই রেখে রাস্তায় বের হয়ে এসেছিল। সেদিনের রেসকোর্স হয়ে উঠেছিল বিজয়ের ঠিকানা। তখনও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে বন্দি। তাই আমাদের বিজয় ছিল অপূর্ণ। আমাদের অসামান্য মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ববিবেককে এমনই নাড়া দিয়েছিল যে– এর চাপে পরাজিত পাকিস্তানি অপশক্তি খুব বেশিদিন বাংলাদেশের আরেক নাম আমাদের জাতির পিতাকে আটকে রাখতে পারেনি। এই ডিসেম্বরেই সেই মহামানবের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হবে। কোভিডের কারণে আমরা যেমনটি চেয়েছিলাম, তেমন করে মুজিববর্ষ পালন না করতে পারলেও দেশে এবং বিদেশে অনলাইনে তাঁকে ঘিরে কম অনুষ্ঠান হয়নি। লেখকরাও ঘরবন্দি থেকেও মনের আনন্দে তাঁর ওপর কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে তরুণ লেখকদের উৎসাহ ছিল আরও বেশি। তাদের সব লেখাই হয়তো কালের কষ্টিপাথরের ঘষায় টিকবে না। কিন্তু তাই বলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাদের এই অন্তহীন আগ্রহকে কিছুতেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তাঁকে নিয়ে কত যে ওয়েবিনার হয়েছে মুজিববর্ষজুড়ে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এখানেও তরুণদের আগ্রহই ছিল দেখার মতো। আমাদের পত্রপত্রিকাও বসে ছিল না। প্রতিনিয়তই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু না কিছু একটা প্রকাশ করেছে তারা।

অস্বীকার করার করার উপায় নেই যে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ভস্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বহুমাত্রিক প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতিকে দিশা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বে প্রথমে অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি পেয়েছে নিজেদের জন্য একটি স্বদেশ। স্বাধীন দেশে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সে উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সামনে স্থাপন করছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। বঙ্গবন্ধু দ্রুত পুনর্বাসন শেষ করে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে ২৭৩ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল। ওই অভিযাত্রায় ষড়যন্ত্রকারীদের কারণে যদি ছেদ না পড়ত, তাহলে আজ আমরা কোথায় থাকতাম, তা ভাবতেই অবাক লাগে! বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হারালেও আমাদের চিন্তাচেতনায় তিনি ছিলেন। এ জাতির মধ্যে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা তিনি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার জোরেই দেশ আবার ফিরেছে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে, তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। গণমুখী নেতৃত্বের এই পরম্পরার কারণেই বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের সামনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে হাজির হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামল : উন্নয়নের 'মেঠো পথ' থেকে 'মহাসড়কে'

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালিকে কেউ 'দাবায়ে রাখতে' পারবে না। কয়েক দশক ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলার মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে পেরেছিলেন বলে এবং তাদের সংগ্রামে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে নেতৃত্ব দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন বলেই তিনি এমন আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ সেদিন করতে পেরেছিলেন। এটি নিছক কথার কথা ছিল না। তাই বহু সংগ্রামের পর আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীন বাংলা বাস্তবায়ন করতে পেরেই বঙ্গবন্ধু থেমে যাননি। বরং দ্বিগুণ তেজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দেওয়ার কাজে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপর বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। একেবারে শূন্য থেকেই যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল তাঁকে। 'সোনার বাংলা'কে পাকিস্তানিরা প্রকৃত অর্থেই শ্মশানের চেহারায় রেখে পালিয়েছিল। রাস্তাঘাট, রেললাইন, বন্দর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক–কিছুই ছিল না। তদুপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা, কোটিখানেক শরণার্থীর পুনর্বাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন পুনর্নির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। ভাবতে অবাক লাগে–তিনি যখন দেশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন, তখন অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র আট বিলিয়ন ডলার, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্য। জিডিপির তুলনায় সঞ্চয়ের অনুপাত তিন শতাংশ। আর বিনিয়োগের অনুপাত নয় শতাংশ। শুধু তাই নয়, আমাদের নিজস্ব উদ্যোক্তা শ্রেণি বলতে গেলে ছিলই না। পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নতুন উদ্যোক্তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতেই দেয়নি। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোয় পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোগগুলো অরক্ষিত রেখেই বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যায়। তাই ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প-কারখানাগুলো পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে উপর্যুপরি আঘাত হানছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও আমাদের অনুকূলে ছিল না। একদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য দ্রুত বাড়ছিল, অন্যদিকে খাদ্য সহায়তা নিয়ে পরাশক্তিগুলোর রাজনীতি– এসবের ফলে বাংলাদেশ সত্যিই ভীষণ নাজুক অবস্থায় ছিল।[১]

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে বঙ্গবন্ধু যেমন অপশাসকদের শত বাধা, শত অত্যাচারের মুখেও দমে যাননি, ঠিক তেমনই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও বহুমুখী চ্যালেঞ্জ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। বরং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেই উদাহরণ তিনি দেশবাসীর সামনে স্থাপন করে চলেছিলেন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে। দ্রুততম সময়ে প্রণয়ন করেছিলেন জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা–এই চার মূল স্তম্ভের ভিত্তিতে সংবিধান। ১৯৭২-এর ওই সংবিধানের মৌলনীতিমালায় মানবাধিকার, বিকেন্দ্রীকরণ, সবার জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও পল্লি-উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার মাধ্যমে 'সবার জন্য সমান সুযোগ'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, ২০ লাখ ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর মতো কাজগুলো বঙ্গবন্ধু সম্পদের প্রবল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার দিয়ে করতে সক্ষম হয়েছিলেন দ্রুততম সময়ের মধ্যেই। একই সঙ্গে তিনি দেশের সেরা অর্থনীতিবিদ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমবেত করেছিলেন পরিকল্পনা কমিশনে। সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিকল্পিত উপায়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শুরু থেকেই তিনি দু'পায়েই হাঁটছিলেন। কৃষি ও শিল্পের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে তিনি ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রীয় বিবেচনায় ছিল। কারণ এ ভূখণ্ডের অর্থনীতিও সে সময় ছিল প্রধানত কৃষিনির্ভর। তাই স্বভাবতই কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ, ভর্তুকি বা বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলে করা ১ লাখ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং কৃষকের জন্য ন্যায্যমূল্য এবং রেশন সুবিধা চালুর মতো উদ্যোগ বাংলাদেশে শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।[২] কৃষির জন্য গঙ্গার পানিবণ্টনব্যবস্থা টেকসই করার জন্য যৌথ নদী কমিশন গঠন এবং পানিচুক্তি সম্পন্ন করাও তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি অগ্রাধিকারের পরিচয় বহন করে। এর পাশাপাশি কৃষি গবেষণা এবং জনশক্তিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিআইআরআই প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি স্নাতকদের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি তাঁর কৃষি-দরদি নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে কৃষিকে দেওয়া এই পৃষ্ঠপোষকতার সুফল পেয়েছে পুরো সামষ্টিক অর্থনীতিই। তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত গতি আনতে যে কৃষির পাশাপাশি শিল্পকেও দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিকশিত করতে হবে, সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর ছিল সজাগ দৃষ্টি। প্রথম পর্যায়ে বৃহৎ শিল্প পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণির অনুপস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প খাতের বিকাশের পথ বেছে নেন। এর ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিল্পোৎপাদনও বেড়েছিল। তবে ধীরে ধীরে এই 'স্টেট-লেড মডেল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট' থেকে ব্যক্তি খাতে শিল্পবিকাশের দিকে যাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি শুরুতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি খাতের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ১৯৭৪-৭৫-এ এসে দেখতে পাই, তিনি ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের সীমা ২৫ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকায় উন্নিত করছেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করছেন।[৩]

স্পষ্টতই স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে বিপুলসংখ্যক তাৎক্ষণিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও

দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কল্যাণকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, উন্নয়নের সুফলগুলোকে টেকসইভাবে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করার জন্য।[৪] একই সঙ্গে ছোটো অর্থনীতির দেশের জন্য মানবসম্পদই যে সবচেয়ে বড়ো শক্তি হতে পারে, সেটিও স্পষ্ট ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির কাছে। তাই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ নিয়ে আশাবাদী শিক্ষিত তরুণদের প্রস্তুত করতে, যারা পরবর্তী সময়ে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। এর আগে ১৯৭০ সালের প্রাক-নির্বাচনি ভাষণেও তিনি শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত চার শতাংশ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

চিত্র-১: ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সময়কালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের (মার্কিন ডলারে) ওঠানামা

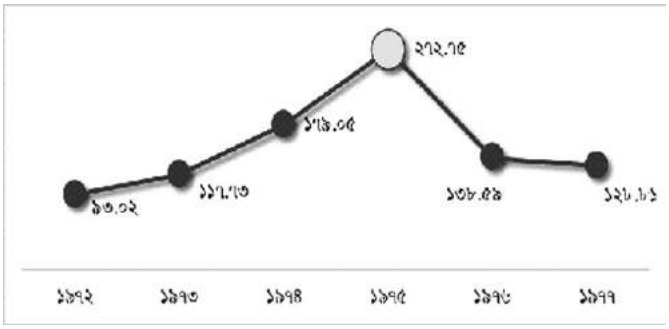

সূত্র: আবুল কাশেম, ২০১৮

বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে ফেরা: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নতুন অভিযাত্রা

১৯৯৬-এ দেশ আবার সঠিক পথে ফেরে বঙ্গবন্ধুরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গবন্ধুকন্যা তাঁর পিতার দেখানো পথে দেশকে সবার জন্য উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। তাঁরও একই উদ্দেশ্য ছিল–দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া। সামাজিক পিরামিডের নিচের অংশকে আরও শক্তিশালী করা। ২০০১-এ ষড়যন্ত্রকারীদের তৎপরতায় আবারও এ অভিযাত্রায় ছেদ পড়েছিল। কিন্তু জীবনবাজি রেখে সংগ্রাম করে ক্ষমতায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আজ থেকে ১২ বছর আগে। আর এরপর থেকে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতি তো যেন কল্পনাকেও হার মানিয়েছে! সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সব সূচকে আমরা যেমন অভাবনীয় গতিতে এগিয়ে গিয়ে সবার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছি, তেমনই শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির জোরে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনা মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ রেখে চলেছি।

বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে বেপথু হয়ে পড়া দেশ ও দেশের অর্থনীতিকে বঙ্গবন্ধুকন্যা কেবল সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন তা-ই নয়, আমাদের অর্থনীতিকে একই সঙ্গে প্রচণ্ড গতিশীল এবং ব্যাপক মাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক করে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলকে একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭৫-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ৭ গুণেরও বেশি বেড়ে ২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬৬,৮৮৮ টাকায়। ১৯৯০-পরবর্তীকালে মাথাপিছু আয় আগের চেয়ে তুলনামূলক দ্রুত বেড়েছে ঠিকই, তবে বিশেষ করে বিগত ১০-১২ বছরে এক্ষেত্রে নাটকীয় গতি এসেছে। লক্ষ করার বিষয়, ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে, তার ৭৩ শতাংশই হয়েছে গত এক দশকে। একই কথা প্রযোজ্য প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রেও। গত এক দশকে জিডিপি গড়ে ৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। অথচ আগের দুই দশকের গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ শতাংশ।[৬]

বেগবান এই অর্থনীতির গতিধারা থেকে এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে কাজ করেছে সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা। এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই জিডিপিতে কৃষির অবদান কমেছে। আর সে স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করেছে শিল্প খাত। আধুনিক অর্থনীতির রূপান্তরের এটিই পরিচিত পথ। আর বাংলাদেশ সে পথেই হাঁটছে। এ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমতে কমতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আর সেই ফাঁকা স্থান প্রধানত পূরণ করেছে শিল্পখাত (প্রাগুক্ত)। শিল্প খাতের প্রসার মানেই আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রসার। বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ নারী কর্মীর ব্যাপক কর্মসংস্থান রপ্তানিনির্ভর শিল্পায়নকেই শুধু প্রতিযোগী করেছে তা-ই নয়, দারিদ্র্য নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়নেও তা নয়া মাত্রা যুক্ত করেছে। ফলস্বরূপ জিডিপিতে শিল্পের অবদান এ সময়ে ১৭.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। আরও দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ২০১৫-পরবর্তী সময়ে জিডিপিতে শিল্পের অবদানের এক ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে (প্রাগুক্ত)। শিল্প খাতের বিকাশে সরকারের বিশেষ মনোযোগের প্রতিফলন এখানে ঘটেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

উল্লেখ্য, জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে এলেও কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। এর মানে কৃষিতে আধুনিকায়ন ঘটেছে। উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। স্বাধীনতার পরপর আমরা বছরে গড়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করছিলাম। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষিজমির পরিমাণ খানিকটা কমলেও আমাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশিতে। খাদ্য উৎপাদন সূচকের বিচারে আমরা পেছনে ফেলতে পেরেছি ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশকেও। বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন সূচকের মান ২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে ১৪৫.৩ (ভারতের ১৪৪, চীনের ১৩৯ এবং ভিয়েতনামের ১৩৬)।[৭]

তবে কৃষি উৎপাদনের এমন নাটকীয় বৃদ্ধির পরও কিন্তু কৃষি মজুরি কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলে কৃষির পাশাপাশি বিকাশ ঘটেছে অকৃষি খাতেরও। এর মানে–গ্রামে পুঁজির প্রবাহ বেড়েছে। ব্যাংকিং সেবা আধুনিক ও সহজ হওয়া শহর ও বিদেশ থেকে দ্রুত অর্থের প্রবাহ বেড়ে চলেছে। প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ লেনদেন হচ্ছে। গ্রামে ব্যাংকের শাখা ও উপশাখার সংখ্যা বেড়েছে। কৃষি ও এসএমই ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এমএফআইগুলোও গ্রামে আনুষ্ঠানিক ঋণের প্রবাহ বাড়াতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। গ্রামীণ আয়ের বড়ো অংশটিই (৬০%) এখন আসছে অকৃষি খাত থেকে। দেশের গ্রামাঞ্চল একদিকে বর্ধিষ্ণু শিল্প ও সেবা খাতের কাঁচামাল ও মূল্য সংযোজিত পণ্য/সেবা সরবরাহ করছে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন ভোক্তা হিসাবে তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

দরকার হয়েছে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ। সেই বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ধারাবাহিক উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত দশকে নাটকীয় অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের জিডিপির আকার বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে। বাহাত্তরের আট বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এখন একচল্লিশ গুণের বেশি বেড়ে ৩৩০ বিলিয়ন ডলার পার হয়ে গিয়েছে। তবে এর চেয়েও বেগবান রয়েছে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির ধারা। তাই বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত ক্রমেই বেড়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ছিল ২৬.৩, আর ২০১৮-১৯ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৬-এ। আর জিডিপির শতাংশ হিসাবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ থেকে ২৩.৪ শতাংশ।[৮]

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও এ কথা মানতে হবে যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ এখনো প্রধানত সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই নীতিনির্ধারকরা বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের গতি বাড়ানোর জন্য আমাদের নিয়মনীতি আরও স্মার্ট ও সহজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এদিকটায় এখন নজর দিচ্ছে। এসব ইতিবাচক উদ্যোগের কিছু সুফল ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। ব্যাবসার পরিবেশ নিয়ে করা বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' সূচকে বাংলাদেশে আগের বছরের তুলনায় আট ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম হয়েছে।[৯]

কৃষি ও শিল্প খাতের ধারাবাহিক বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০১৮-১৯-এ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। অর্থাৎ এ সময়ে ১০০ গুণেরও বেশি রপ্তানি আয় বেড়েছে।[১০]

যদিও কোভিড-১৯-এর প্রভাবে উন্নত দেশে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্যের চাহিদা সংকোচিত হয়েছে। তবুও আমাদের ধারণা–সাময়িক এই সংকট সারা বিশ্বই কাটিয় উঠতে পারবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং আমাদের পণ্য আমদানি করা দেশগুলোয় যেভাবে টিকা অভিযান গতি পেয়েছে তাতে আগামী দিনে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হবে বলে আশা করা যায়।

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকেই বাংলাদেশের রপ্তানিতে এক ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৭৩-৭৪ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ৬৬ শতাংশই হয়েছে ২০০৭-০৮ পরবর্তীকালে (প্রাগুক্ত)। মূলত বস্ত্র খাতের আধুনিকায়ন ও ক্রেতাদের চাহিদামতো পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে প্রতিযোগীদের চেয়ে কম দামে আমাদের পণ্য রপ্তানি করার এই সাফল্য সত্যিই অসামান্য। কাজেই এ কথা বলাই যায়, একদিকে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে আরও বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো একটি পরিবেশও বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে।

তবে কেবল আরএমজিনির্ভর রপ্তানি নয়। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাফল্যের পেছনে আরও যে শক্তিটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে তা হলো প্রবাসী আয়। ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ হাজার, আর তারা বছরে গড়ে ৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে পাঠাতেন। ২০১৮-১৯-এর হিসাব বলছে, বিদেশে কর্মরত আছেন প্রায় ৭ লাখ বাংলাদেশি নাগরিক আর ওই বছর তারা দেশে পাঠিয়েছেন ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি (প্রাগুক্ত)। প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভরসার জায়গা হিসাবে কাজ করেছে শুরু থেকেই। তবে যথাযথ নীতি এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও দেশে আসা অর্থের পরিমাণ আরও দ্রুত বাড়তে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলে। একটি জনবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বাসী সরকার ধারাবাহিকভাবে দেশ শাসনের দায়িত্বে থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক খাতের কল্যাণে প্রবাসী আয়কে আনুষ্ঠানিকীকরণ সহজ হয়েছে। এছাড়া এক্ষেত্রে সরকারের দেওয়া প্রণোদনাও বেশ কাজ করেছে।

"দেশে আসা অর্থের পরিমাণ আরও দ্রুত বাড়তে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলে। একটি জনবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বাসী সরকার ধারাবাহিকভাবে দেশ শাসনের দায়িত্বে থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়"

তবে দেশ চালাতে, বিশেষ করে বিদেশে পাঠানোর মতো দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে এবং কৃষিশিল্পের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যয় বাড়াতে হয়েছে। আর এর জন্য বাড়াতে হয়েছে রাজস্ব আহরণ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে রাজস্ব আহরণে বাড়তি গতি সঞ্চারিত হয়েছে। তাই ২০১৮-১৯-এ এসে সরকারের আহরিত রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। তবে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও অনেক ভালো করার সুযোগ রয়েছে। সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ১২.৩ শতাংশ। একটি দ্রুত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশ হিসাবে এ লক্ষ্যমাত্রা অন্তত ১৫ শতাংশ হতে পারতে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।[১১]

এক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের গতি ও স্বচ্ছতা বাড়ানো গেলে রাজস্ব আহরণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দুইই বাড়বে বলে মনে হয়।

সর্বোপরি গত ১০-১২ বছরে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে, সেটিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একই সঙ্গে বেগবান করেছে এবং এর ঝুঁকি সহনক্ষমতা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্ভাবনী নীতি উদ্যোগগুলো আশাতীত সুফল দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যাংক হিসাবধারীদের এক-তৃতীয়াংশই এখন ডিজিটাল লেনদেন করছেন। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য গড়ে এ অনুপাত মাত্র ২৮ শতাংশ। একইভাবে বাংলাদেশে ব্যাংক হিসাবগুলোর মাত্র ১০ শতাংশ অচল, যেখানে প্রতিবেশী ভারতে এ অনুপাত ৫০ শতাংশ।[১২]

করোনাজনিত বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা আসার আগের সময়টায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পঞ্চাশের দশকের সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের সঙ্গে। ওই দেশগুলো সেসময় থেকে পরবর্তী ২৫ বছর ধরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তাদের প্রবৃদ্ধির ওই ধারাকেই 'এশিয়ান গ্রোথ মডেল' বলা হয়। বাংলাদেশও বর্তমানে ওই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ বাংলাদেশও ওই দেশগুলোর মতোই অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যাপক রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে, যুদ্ধপরবর্তী দুরবস্থা কাটিয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে এবং আরএমজির পাশাপাশি অন্য রপ্তানি পণ্য থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত সুপরিকল্পিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আইসিটি পার্কগুলো বাংলাদেশের জন্য 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে।[১৩]

চিত্র-২: বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য হার

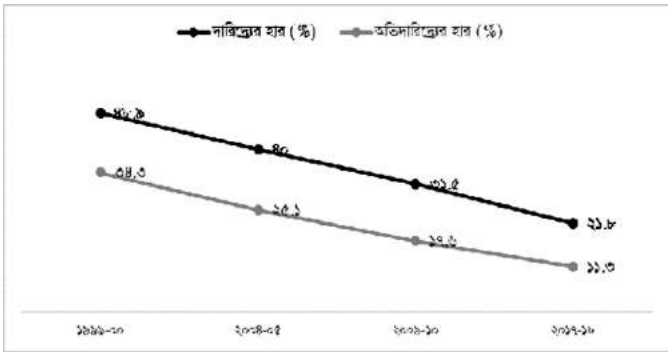

সূত্র: এইচআইইএস, বিবিএস, ২০১৬

তবে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সামাজিক পিরামিডের একেবারে পাটাতনে থাকা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সাফল্য বাংলাদেশ দেখিয়েছে, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্ববহ। নীতিনির্ধারকরা এদিকটিতে মনোনিবেশ করেছেন বলেই অতি-ধনীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আয়বৈষম্য কিছুটা বাড়লেও ভোগবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। আর এর ফলে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কোভিড হামলায় সাময়িকভাবে হলেও দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বেশ খানিকটা বেড়েছে। আশা করা যায়, অর্থনীতি স্বাভাবিক গতিতে ফিরলে এ দুটি ক্ষেত্রেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৪৯ শতাংশ এবং অতিদারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪ শতাংশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখা গেছে বলেই দুই দশকের মধ্যে দারিদ্র্য হার অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে ২২ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্য হার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কমিয়ে ১১ শতাংশে আনা সম্ভব হয়েছে।[১৪]

তবে কেবল দারিদ্র্য নিরসনে নয়, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতির সুফল হিসাবে বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ অনেক নন-এলডিসি দেশকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের মান কেনিয়া, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া ও জিম্বাবুয়ের মতো নন-এলডিসি দেশের চেয়ে ভালো।[১৫] জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক প্রতিবেদন ২০১৯ অনুসারে বাংলাদেশ ওই বছরে আরও এক ধাপ এগিয়ে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম স্থানে চলে এসেছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এই অগ্রগতির প্রধানতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার এবং স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধিকে।[১৬]

দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা: শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির সুফল

বাংলাদেশ তার দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সর্বশেষ এই করোনা মহামারিজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মোকাবিলার ক্ষেত্রে। প্রাথমিকভাবে এই অবিস্মরণীয় স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা করতে গিয়ে বাংলাদেশকেও অন্যসব দেশের মতো হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে অচিরেই সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত পেশাজীবীদের দক্ষতার গুণে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর অতি সম্প্রতি তো টিকা দেওয়ার কর্মসূচিও শুরু হয়েছে জোরেশোরে। এ কারণেই গেল ডিসেম্বরে (২০২০) ব্লুমবার্গ তার কোভিড রেজিলিয়েন্স ইনডেক্সের বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের একটি হিসাবে রেখেছে বাংলাদেশকে।[১৭]

প্রাথমিকভাবে ব্যাবসাবাণিজ্যে একধরনের শ্লথগতি প্রত্যাশিতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রদান ১১ শতাংশ বৃদ্ধি থেকে বোঝা যায়, সেখানেও গতি ফিরে আসছে। সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে জনগণের নিত্যদিনের জীবনযাপনের ওপর ওই অর্থে চাপ পড়েনি।[১৮] তাই মহামারির শুরুতেই বাড়তি তারল্য জোগানের সিদ্ধান্তটি যথার্থ ছিল। বাংলাদেশে এই সময়টায় দেশ ও বিদেশি দায় খানিকটা বাড়িয়েছে। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই। জিডিপির অংশ হিসাবে আমাদের মোট দায়দেনা এখনো মধ্য তিরিশ শতাংশেই আছে। এই হার আমাদের আয়ের দেশগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সন্তোষজনক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই কৃষির ওপর জোর দিয়ে নীতি প্রণয়ন এবং এর ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। আর এই মহামারিজনিত অচলাবস্থায় দেখা যায়, কৃষিই বাংলাদেশের রক্ষাকারী হিসাবে হাজির হয়েছে। লকডাউনের মধ্যেও সরকারের সক্রিয় নীতি সমর্থন, স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর তৎপরতায় হাওর এলাকাসহ সর্বত্র বোরো ধান সুষ্ঠুভাবে কাটা সম্ভব হয়েছে। আমন মৌসুম নিয়েও সরকারের বহুবিধ পরিকল্পনায় ভালো ফলন নিশ্চিত করা গেছে। এখন আবার বোরোর দিকে নজর দিতে হবে।[১৯]

তবে বিগত ১০-১২ বছরে গৃহীত নীতি ও এর বাস্তবায়নের সুফল করোনাকালে পাওয়ার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে মহামারিজনিত অচলাবস্থায় অর্থনীতিকে চাঙা রাখায় ডিজিটাল আর্থিক সেবাগুলোর ভূমিকা। আগেই বলেছি, সরকারের সহায়তায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে ওই সময়ই শুরু হয়েছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির নীরব বিপ্লব। আর এর ফলেই চালু হয়েছিল মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস

এবং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মতো ডিজিটাল আর্থিক সেবা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহসী এবং সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি উদ্যোগের ফলে চালু হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ সেবাগুলোর প্রসার ঘটেছে দেশে। আর এর বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে করোনার সময়ে। ২০২০-এর ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের পক্ষে ব্যাংকে যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় এ সময়ে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১.৫ কোটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৬৪ কোটিতে। এ সময়ের ব্যবধানে এই ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে মাসিক লেনদেনের পরিমাণ অভাবনীয় মাত্রায় বেড়েছে (১২ হাজার ২৬৪ কোটি থেকে ৫৩ হাজার ৫৯৮ কোটি, চার গুণেরও বেশি)। বাংলাদেশ সরকারও এ সেবার ওপর আস্থা রেখে ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারকে মহামারিকালীন বিশেষ নগদ সহায়তা দিয়েছে এর মাধ্যমে।[২০] মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ওপর ভোক্তাদের আস্থা বাড়তে দেখে সিটি ব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা বিকাশের সঙ্গে যৌথভাবে পাইলট ভিত্তিতে চালু করেছিল অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কর্মসূচি। কাগজপত্রের জটিলতা এড়িয়ে কেবল মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের লেনদেনের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত বিকাশ গ্রাহকদের ১০০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার এই পাইলট কর্মসূচি চালু হয় ২০২০ এর জুলাইয়ে। এখন পর্যন্ত ১৮ হাজার গ্রাহককে এমন ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ঋণখেলাপির হার ১ শতাংশের মতো (০.৭%)। এ সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিটি ব্যাংক বিকাশের সব গ্রাহকের জন্য এ সুবিধা চালু করতে চাইছে।[২১]

একই রকম সাফল্য এসেছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও। এই 'অফ ব্র্যাঞ্চ ব্যাংকিং' সেবা বর্তমানে ২৪টি ব্যাংক দিচ্ছে ১৪ হাজার ৪১৪টি এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে (২০২০ সালের অক্টোবরের হিসাব অনুসারে)। মাত্র এক বছর আগে আউটলেটের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৭০৩। ২০১৯ সালের অক্টোবরের তুলনায় ২০২০-এর অক্টোবরে এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৮.৮ কোটিতে পৌঁছেছে। এসব হিসাবে আমানতের পরিমাণ এই এক বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৭৪৭ কোটি টাকায়। একই সময়ের ব্যবধানে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ, রেমিট্যান্স প্রেরণ বেড়েছে চার গুণের বেশি। এসবই প্রমাণ করে, করোনাজনিত পরিস্থিতিতে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ওপর মানুষ আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় নির্ভর করেছে।[২২] আর করোনাকালে এজেন্ট ব্যাংকিং আর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এমন ব্যাপক প্রসার থেকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে অভিযান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুরু করেছিল, তার সুফল বাংলাদেশকে করোনাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা মোকাবিলায় ব্যাপক মাত্রায় সহায়তা করেছে।

আগামী দিনের পথনকশা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বোধগম্য কারণেই প্রত্যাশিত লক্ষ্যগুলোয় কাটছাঁট করতে হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা (৮.২ শতাংশ) স্থির করা হয়েছিল, তা কমিয়ে ৭.৭ শতাংশ করা হয়েছে করোনার কারণেই। তবে সারা বিশ্বের অর্থনীতি যখন সংকুচিত হচ্ছে, সে অবস্থায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বেশি হলেই সেটি হবে বড়ো প্রাপ্তি। ইতোমধ্যে ডিজিটাল অর্থনীতিতে চাঙা ভাব দেখা যাচ্ছে, আর ভালো করছে কৃষিও। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে আর সার্বিকভাবে প্রণোদনার মনোযোগের জায়গায় রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতও। এ প্রেক্ষাপটে প্রায় ৬৫ লাখ কোটি টাকার এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধি সহায়ক উন্নয়ন ঘটিয়ে ১ কোটি ১৩ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বরাবরের মতোই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি খাতকে। ৮১ শতাংশ বিনিয়োগই আসবে ব্যক্তি খাত থেকে। আর ব্যক্তি খাতের প্রয়োজনীয় বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির দিকনির্দেশনাও রয়েছে এ পরিকল্পনায়।[২৩] ব্যাবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন বিশেষ করে নিয়মনীতি সহজীকরণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গেলে এবং মেগা অবকাঠামোগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে এসব লক্ষ্য অর্জন খুবই সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং সার্বিক সামাজিক-মানবিক উন্নয়ন যে ব্যাপক গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল, করোনা মহামারির কারণে তাতে একটু ছেদ পড়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ দেশের তুলনায় মহামারি মোকাবিলায় পারদর্শিতা দেখানো নিয়ে তাই খুব বেশি আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। কারণ সামনে রয়েছে আরও অনেক চ্যালেঞ্জ। তবে এ কথাও সত্য, বাংলাদেশের যে সম্ভাবনাগুলো মহামারির আগে ছিল, সেগুলো এখনো রয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতেও ওই সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়েই এগোতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভ্যালু/সাপ্লাই চেইনে দেশের অবস্থান আরও মজবুত ও ফলদায়ী করার কথা। করোনা মহামারির কারণে অনেক বিনিয়োগকারীর চীন থেকে সরে আসার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় এ সম্ভাবনা আগের চেয়েও বেড়েছে। এজন্য অবশ্যই দেশের অভ্যন্তরে অবকাঠামো ও ব্যাবসার পরিবেশে উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। ইতোমধ্যে বিবিআইএন-মোটর ভেহিক্যাল অ্যাগ্রিমেন্টের কারণে যোগাযোগের উন্নতিতে গতি এসেছে। তবে যত দ্রুত এক্ষেত্রে উন্নতি করা যাবে, ততই ভালো। এমনটি করা গেলে প্রতিবেশী দেশগুলোর

> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই কৃষির ওপর জোর দিয়ে নীতি প্রণয়ন এবং এর ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। আর এই মহামারিজনিত অচলাবস্থায় দেখা যায়, কৃষিই বাংলাদেশের রক্ষাকারী হিসাবে হাজির হয়েছে

সঙ্গে বাণিজ্য সহযোগিতায় নাটকীয় উল্লম্ফন খুবই সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা। বর্তমানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে বাংলাদেশ খুবই ভালো করছে। অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলবায়ুবান্ধব নিরাপদ কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কাজেই ভারতের কৃষি উৎপাদক এবং বাংলাদেশের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের সম্মিলিত কোনো উদ্যোগ বড়ো সাফল্য নিয়ে আসতে পারে–এমনটি বলাই যায়।[২৪]

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বাংলাদেশের শক্তি হিসাবে আগামী দশকে কাজ করবে তা হলো, এদেশের তুলনামূলক তরুণ জনশক্তি। ইউএনএফপিএ-এর প্রাক্কলনগুলো বলছে, ২০২৫ এবং এর পরেরও বেশ অনেকটা সময়জুড়ে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে প্রাধান্য থাকবে ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সিদের।[২৫] একে বলা হয় 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'। দেশের ভেতরের ও বাইরের বিনিয়োগকারীরা স্বভাবতই এই তরুণ জনশক্তিকে তুলনামূলক কম মূল্যে কাজে নিয়োজিত করার সুবিধাটুকু নিতে চাইবেন। এই সুযোগটিই কাজে লাগাতে হবে নীতিনির্ধারকদের। আর তৃতীয়ত, যে বিষয়টি বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে তা হলো এদেশের বর্ধিষ্ণু গ্রাহক/ভোক্তার সংখ্যা। এরা প্রযুক্তিনির্ভর। সত্যি বলতে বড়ো অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রেও তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্থনীতির প্রধানতম শক্তি হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশেরও এমন শক্তি তৈরি হয়েছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক দশকগুলোয়। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের প্রাক্কলন অনুসারে মধ্যম ও উচ্চমানের ভোক্তা তিন লাখের বেশি রয়েছেন–এমন শহরের সংখ্যা ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ছিল ১০টি, আর ২০২০-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭টিতে। তারা আরও বলছে, এমন শহরের সংখ্যা ২০২৫ সাল নাগাদ বেড়ে দাঁড়াবে ৩৩টিতে।[২৬] ফলে বোঝাই যাচ্ছে এই ভোক্তারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াবেন। দেশের মাথাপিছু আয় যতই বাড়বে, এ ধরনের ভোক্তার সংখ্যাও ততই বাড়বে। আর এই বাজারের সুফল নিতে আগ্রহী হবেন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরাও। দেশের ভেতরেও এসব ভোক্তার জন্য নতুন নতুন ব্র্যান্ড পণ্য উৎপাদিত হবে। এসবের পাশাপাশি আইসিটির প্রসারও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রসারে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করবে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশ বছরে বিশ্বের ৩৫টি দেশে ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইসিটি সেবা রপ্তানি করছিল, আর ২০২১ সাল নাগাদ এ পরিমাণ ৫ বিলিয়নে পৌঁছানোর কথা।[২৭] করোনা মহামারির কারণে এবং মহামারি-পরবর্তী 'নিউ নরমাল' জীবনে আইসিটির ওপর নির্ভরতা সারা বিশ্বেরই বাড়বে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের আইসিটি সেবা রপ্তানির সম্ভাবনাও আগের প্রাক্কলনের তুলনায় বাড়বে। ফলে এই নতুন সৃষ্ট সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চাই নতুন মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি এবং এর সফল প্রয়োগ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেসব পরিবর্তনের চারা চোখে পড়ছে, সেগুলোকে লালন করে বড়ো করতে হবে। এজন্য মানুষের ওপর বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। মহামারির কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের ঝুঁকি ও গুরুত্ব নতুন করে স্পষ্ট হয়েছে। জীবন-জীবিকার স্বার্থেই এসব খাতে আসন্ন বাজেট এবং পুরো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়জুড়েই উল্লেখযোগ্য হারে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ খাতেও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থনীতির চাহিদা মতো প্রশিক্ষিত জনশক্তি উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিই যে বাংলাদেশের রক্ষাকবচ, তা এখন প্রমাণিত। তাই এ খাতের আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, নিরাপদকরণ, বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, রপ্তানিকরণ ও সবুজায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-সমর্থন ও বাড়তি বিনিয়োগ অপরিহার্য। আরএমজি খাতের ওপর গুরুত্ব না কমিয়েও আইসিটিকে প্রবৃদ্ধির নয়া চালকের আসন করে দিতে হবে। এই সংকটকালে এ খাত তার শক্তিমত্তা দেখিয়েছে। তাই সারা বিশ্বে বাংলাদেশের কম খরচের আইসিটি জ্ঞানভিত্তিক সলিউশন ছড়িয়ে দেওয়ার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে সঙ্গী করেই বাংলাদেশের সরবরাহ চেইনকে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও দক্ষ করা সম্ভব। সেজন্য বাড়তি বিনিয়োগ ও প্রণোদনা দরকার। এজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নয়া অংশীদারত্ব ও কৌশলের সন্ধানও অপরিহার্য। অবকাঠামো বরাবরই প্রবৃদ্ধি-সহায়ক। রেল, শিপিং, বন্দর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দক্ষতা উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং এসবের জন্য উপযুক্ত অর্থায়নের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে নীতি-অগ্রাধিকার প্রদান এবং সেসবের দ্রুত বাস্তবায়ন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এখনো আমাদের অর্থনীতি ও সমাজে নানা মাত্রিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বিশেষ করে দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং গুণমানের বাস্তবায়নের মতো প্রতিবন্ধকতা যে রয়েছে, তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এসব চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধ করেই আমাদের উপরি-উক্ত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন, তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তাঁর নিজেরই ১৯৭২ সালের ৯ মের বক্তৃতায়। সেদিন তিনি বলেছিলেন:

'আমি কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসেখেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক।'

আমরা ঠিক তেমনই একটি বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের কাজ হবে নানামুখী ইতিবাচক পরিবর্তনকে সমর্থন দিয়ে আগামী দিনের অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরকে আরও গতিময় করা। পাশাপাশি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য নীতি সমন্বয় এবং পুরো প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ ও মনিটরিংও নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশাবাদী, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই (অর্থাৎ, ২০২৫ সালের মধ্যেই) পরিবর্তনের এই ধারা আরও জোরদার হবে এবং আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাব।

তথ্যসূত্র

১. ড. আতিউর রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিযাত্রা' শিরোনামের বিশেষ বক্তৃতা থেকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিবদের জন্য ১৩১তম এসিএডি কোর্সে, ৪ জানুয়ারি ২০২১

২. ড. আতিউর রহমান রচিত 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ভাবনা' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ আগস্ট ২০১৪

৩. ড. আতিউর রহমান রচিত 'বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই হাঁটছি আমরা' নিবন্ধ থেকে। যুগান্তর, ১৭ মার্চ ২০২০

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক রিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮', জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন

৫. আবুল কাশেম রচিত 'বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং শিল্পের বিকাশ' নিবন্ধ থেকে। 'বঙ্গবন্ধু নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক-নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন'-এর পৃ. ৪১ থেকে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০১৮

৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০-এর পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট থেকে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০

৭. ড. আতিউর রহমান রচিত 'মন্দা মোকাবিলায় শক্তি জোগাচ্ছে আধুনিক কৃষি' নিবন্ধ থেকে। আমাদের সময়.কম, ১৬ অক্টোবর ২০২০

৮. (vi)নং তথ্যসূত্রের অনুরূপ
৯. বিশ্বব্যাংকের 'Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপ, ওয়াশিংটন ডিসি, ২০২০
১০. (vi)নং তথ্যসূত্রের অনুরূপ।
১১. ড. আতিউর রহমান রচিত 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আগামীর অর্থনীতি' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক সমকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০২১
১২. কৌশিক বসু রচিত 'Why is Bangladesh booming?' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক ডেইলি স্টার, ২৭ এপ্রিল ২০১৮
১৩. ড. আতিউর রহমান রচিত 'Investment Climate for an Upper Middle Income Bangladesh' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে। বিইএফ সম্মেলন ২০১৯ উপলক্ষ্যে উপস্থাপিত, জানুয়ারি ২০২০
১৪. Household Income and Expenditure Survey 2016, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৫. ড. আতিউর রহমান রচিত 'Bangladesh: From ashes to prosperity' নিবন্ধ থেকে। দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২১ জানুয়ারি ২০২০
১৬. Human Development Report 2019. Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)
১৭. দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউনের 'Covid-19 resilience: Bangladesh among top 20 nations' শীর্ষক ডেস্ক প্রতিবেদন থেকে। ঢাকা ট্রিবিউন, ২২ ডিসেম্বর ২০২০
১৮. ড. আতিউর রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভিযাত্রা' শিরোনামের বিশেষ বক্তৃতা থেকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিবদের জন্য ১৩১তম এসিএডি কোর্সে। ৪ জানুয়ারি ২০২১
১৯. ড. আতিউর রহমানের সাক্ষাৎকার, 'কৃষক ও কৃষিই আমাদের রক্ষা করে' শিরোনামে। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ জুলাই ২০২০
২০. 'Mobile money in the COVID-19 pandemic' শিরোনামে দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন, ১৭ জানুয়ারি ২০২১
২১. সানাউল্লাহ সাকিবের 'বিকাশেই মিলবে সিটি ব্যাংকের অতি ক্ষুদ্রঋণ' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
২২. মেহেদী হাসানের 'Pandemic makes agent banking deliver on its great potential' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে। ঢাকা ট্রিবিউন, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০
২৩. 8th Five Year Plan July 2020-June 2025: Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর ২০২০
২৪. এস. কাঠুরিয়া রচিত 'Bangladesh Corridor Vital to India's 'Act East' Policy' নিবন্ধ থেকে, বিশ্বব্যাংক, ২০১৭
২৫. ইউএনএফপিএ-এর অনলাইন তথ্যভান্ডার থেকে। সূত্র: Source: https://www.unfpa.org/data/demographic-dividend/BD
২৬. জেড. মুনির, ও. মুয়েহলস্টেইন, এবং ভি. নাউভার রচিত 'Bangladesh the Surging Consumer Market Nobody Saw Coming' নিবন্ধ থেকে। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ, ২০১৫।
২৭. জেড. এ. পলকের 'By 2030, Bangladesh will be the 24th Largest Economy. Here's How ICT is Driving that Growth. World Economic Forum' নিবন্ধ থেকে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে ২০১৯ সালে উপস্থাপিত।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ অন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের নির্বাহী কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সুবর্ণ সময় সুবর্ণজয়ন্তী

মুহম্মদ শফিকুর রহমান

বৈরী সময় অতিক্রম করে স্বাধীনতার ৫০ বছর সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ হওয়ার পথে। আসছে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১। এখন সুবর্ণ সময়। সুবর্ণ সময়ে সুবর্ণজয়ন্তী। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এতদিন বেঁচে থাকা এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর কার্যক্রমে এতটুকু ভূমিকা হলেও রাখতে পারা কম গৌরবের কথা নয়। শুকরিয়া রাব্বুল আলামিনের কাছে। আজ কেবলই গাইতে ইচ্ছে করছে–'আহা কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে'।

আমরা অবশ্যই ভাগ্যবান যে, বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বীর কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা এমপি পিতার পদরেখা অনুসরণ করে প্রতিটি স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে চলেছেন এবং আমরা তা দেখলাম, দেখছি, এনজয় করলাম, করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ বাংলায় একটি মানুষও না খেয়ে থাকে না, মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সমুন্নত আমরা তা দেখে গেলাম। এর মূল কারণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, সততা, দূরদর্শিতা এবং আদর্শে অবিচলতা। সেই সঙ্গে বাংলার দেশপ্রেমিক জনগণকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা যারা সংগঠন দিয়ে ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আমাদের সেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই ৫০ বছরে আমাদের অর্জন যেমন ঈর্ষণীয়, তেমনই বেদনার বালুচরও কম বিস্তৃত নয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতক বুলেট কেড়ে নিয়েছে আমাদের ত্রাতা জাতির পিতাকে। কেড়ে নিয়েছে তাঁর সহধর্মিণী রাজনৈতিক উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। কেড়ে নিয়েছে সময়ের মেধাবী সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে, কেড়ে নিয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামালকে, কেড়ে নিয়েছে শিশু শেখ রাসেলকে, কেড়ে নিয়েছে তৎকালীন

যুবসমাজের আইকন যুদ্ধদিনের সবচেয়ে চৌকশ বাহিনী বিএলএফ বা মুজিববাহিনীর প্রধান সংগঠক ও অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণিকে এবং তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমণিকে, কেড়ে নিয়েছে জাতির পিতার অনুপস্থিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতা এবং মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক তথা সুপ্রিম কমান্ডার অব আর্মড ফোর্সেস সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে। আমরা হারিয়েছি ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে গ্রেনেড হামলায় নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মীকে। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে আহত হয়েছে তিন শতাধিক নেতাকর্মী জনতা। আহতদের মধ্যে স্প্লিন্টারের যন্ত্রণা সয়ে সয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন জাতীয় নেতা আবদুর রাজ্জাক, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এর আগে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরা হারিয়েছি ৩০ লাখ শহিদ, ৩১৩ জন বুদ্ধিজীবী এবং ৫ লক্ষাধিক মা-বোনের জীবন ও সম্ভ্রম। এ যেন এক আনন্দ-বেদনার মহাকাব্য আমাদের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের কবিতা তিনটি পঙ্‌ক্তি–

'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর'

- ১ কোটি শিশু-কিশোর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেশত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার শরণার্থীশিবিরে জীবন কাটিয়েছে ৯ মাসের মৃত্যুর মিছিলে। সেদিনের সেই কষ্টের একটি খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে আমেরিকান কবি এলেন গিন্সবার্গের কবিতায়।

September on Jessore road–
'Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road–long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts'

'Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go'

দেশের অভ্যন্তরেও দুই কোটিরও বেশি মানুষ আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি করে ৯ মাস কোনো রকম খেয়ে-না-খেয়ে জীবন কাটিয়েছে। এ বাড়ি, ও বাড়ি করতে করতে অনেকে হারিয়ে গেছেন। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ বারীণ মজুমদার ও ইলা মজুমদারের ১০/১১ বছরের কন্যা হারিয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজকের সংগীতজ্ঞ বাপ্পা মজুমদারও তাদের সন্তান। বস্তুত বাংলাদেশ রক্তের ওপর হেঁটে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য অন্তত ২১ বার গুলি, বোমা, গ্রেনেড হামলার মতো অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু শেখ হাসিনা তাঁর আদর্শ এবং লক্ষ্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। বরং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। আল্লাহ সহায়। রাখে আল্লাহ মারে কে?

আজ একটি তথ্য তুলে ধরতে চাই। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসররা দেশে দেশে ক্যু করিয়ে তাদের চামচা সরকার বসায়। তবে প্রথমেই আসল তাঁবেদারকে সামনে আনে না। প্রথমে কিছু ডামি আনে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তারা সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। প্রথমে খন্দকার মোশতাক তারপর বিচারপতি সায়েম এবং সর্বশেষ তাদের মূল তাঁবেদার জেনারেল জিয়াকে সামনে আনে। তাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের এজেন্ট হিসাবে এবং তার মাধ্যমে পাকিস্তানকে আবার বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করবে। উদাহরণও কম নয়। জিয়া বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতার-টেলিভিশন থেকে নির্বাসনে পাঠায়–

- জয় বাংলা
- জয় বঙ্গবন্ধু
- বাঙালি জাতির পিতা এবং সংবিধান থেকে
- বাঙালি জাতীয়তাবাদ
- সমাজতন্ত্র
- ধর্মনিরপেক্ষতা।

সবচেয়ে বড়ো কথা–পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতির এক হীন কাজে হাত দেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে বিতাড়িত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সবকিছু আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিদের গণহত্যার সহযোগী

- জামায়াত
- মুসলিম লীগ
- নেজামে ইসলামকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আবার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে
- জামায়াত নেতা গোলাম আযমসহ যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল, তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়
- গোলাম আযমকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনে
- মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন
- গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। মির্জা ফখরুলরা এখন গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলতে বলতে নিজের দাঁত খসানোর অবস্থায় পৌঁছেছে। যদি প্রশ্ন করা হয়–কীসের গণতন্ত্র?
- জিয়া কোন গণতন্ত্রে ক্ষমতায় বসেছিল?
- তার হ্যাঁ-না ভোট কোন গণতন্ত্র? প্রশ্ন ওঠে– 'হ্যাঁ' জিয়া হলে, 'না' কে? জবাব মেলেনি
- তার রাষ্ট্রপতি ভোট কোন গণতন্ত্র, যেখানে অনেক কেন্দ্রে মোট ভোটেরও বেশি ভোট পড়েছিল। এই কি গণতন্ত্র?
- ১৯৭৯ সালে কারফিউর মধ্যে পার্লামেন্ট নির্বাচন কোন গণতন্ত্র?
- জাতির পিতাকে খুন করা কোন গণতন্ত্র?
- খুনিদের বিচারের বাইরে রাখা কোন গণতন্ত্র?
- খুনিদের বিদেশি দূতাবাসে বড়ো বড়ো চাকরি দেওয়া কোন গণতন্ত্র?
- পেট্রোলবোমা মেরে মানুষ হত্যা কোন গণতন্ত্র?

তারা আজ গণতন্ত্র চান, উন্নয়ন চান না। এমন আনাড়ি পলিটিক্যাল পার্টি কেউ দেখেছে কি? বস্তুত খালেদাও জিয়ার পথেই চলেন। জীবন যা-ই থাকুক, জিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পথেই চলেছেন খুনি-রাজাকারদের হাত ধরে। রাজনীতির নামে দেশদ্রোহী কার্যক্রম করেছেন। পদ্মা সেতুর মতো কোনো সেতু দূরে থাক, খালের ওপর দশটা সাঁকোও তারা করতে পারেনি। আল্লাহপাকের দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং এভাবে জিয়া-খালেদা-এরশাদের পাকিস্তানীকরণ থেকে আমরা বাঙালিরা, স্বাধীন বাংলাদেশ বেঁচে গেল। বাংলাদেশ আবার জাতির পিতার নির্দেশিত মুক্তিযুদ্ধের ধারায় হাঁটতে শুরু করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ–

- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি মানুষও না খেয়ে থাকে না। এর চেয়ে বড়ো গণতন্ত্র কী? মানবধিকার কী?
- আমরা খাদ্য রপ্তানি করছি
- আমাদের পোশাকশিল্প বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম
- আমাদের পাটশিল্প বিশ্বে সমাদৃত
- দেশ শতকরা একশ ভাগ বিদ্যুতায়িত। গ্রামে বাড়ি বাড়ি কম্পিউটার

- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াট
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার
- মাথাপিছু আয় ২,৫০০ ইউএস ডলার
- জিডিপি টানা ১১ বছর ৬ শতাংশের ওপরে
- সে তুলনায় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নিচে
- মানুষের গড় আয়ু ৭৪ বছর
- কোভিড-১৯ উন্নয়ন কার্যক্রম কিছুটা শ্লথ করলেও থামাতে পারেনি। জিডিপি, মাথাপিছু আয়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমাতে পারেনি। কোভিডের সময় ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করলেও পদ্মা সেতুর নির্মাণ ঠেকাতে পারেনি
- নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতুর নির্মাণ সমাপ্তির পথে
- অল্পদিনেই খুলে দেওয়া হবে সড়ক যোগাযোগ
- এর পরপরই রেলপথ

এভাবে গহিন গাঙের পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে মহাকাশের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, কর্ণফুলি টানেল থেকে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকার মেট্রোরেল থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীসহ মহানগরীর জীবনযাত্রা সহজীকরণে শত শত ফ্লাইওভার, ফুটওভারব্রিজ, রাস্তা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আশপাশের দেশগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর আকস্মিক ছোবল অন্যসব দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নও কিছুটা ধাক্কা খেলেও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি

পারাপারে আন্ডার পাস বা সাবওয়ে, সর্বত্র কর্মযজ্ঞ, একেকটি বিশাল প্রকল্প, আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখতে জানেন, স্বপ্ন দেখাতে জানেন, স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেন, অদম্য সাহস, ছোটো চিন্তা একদমই করেন না। কোথায় ছিল বাংলাদেশ, আজ কোথায়–এটাই খালেদা-ফখরুলদের গাত্রদাহ। জাতির পিতা তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন-

'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না', কেউ দাবায়ে রাখতে পারেনি।

আজ ভারতের মতো বড়ো বড়ো অর্থনীতিও আমাদের পেছনে। পাকিস্তানের তো খবরই নেই।

- ভারতের Hindustan Times ২৫ অক্টোবর ২০২০ সংখ্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রার ওপর নিবন্ধের শিরোনাম করেছে: 'Bangladesh: from a basket case to a robust economy'
- বাংলাদেশের bdnews24.com ২২ অক্টোবর ২০২০ শিরোনাম করেছে: 'ভারতকে পেছনে ফেলার কৃতিত্ব শেখ হাসিনা পাবেন'
- 'National Herald' ১৪ অক্টোবর ২০২০ শিরোনাম করেছে: 'India must compete with Bangladesh first before competing with the us and china'.

একসময়ের বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাজনীতির মাঠকেও ক্রিকেটের মাঠ ভেবে বক্তৃতা মেরে সেধুঁরি করতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে গেলেন। ভদ্রলোক এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের জনগণের কাছে একটা আবদার করলেন–

- 'হামে পাঁচ সাল কি মহল্লত দি-জিয়ে। হাম পাকিস্তানকো সুইজারল্যান্ড বানা দেয়েঙ্গে'।

একজন সাংবাদিক বললেন: 'মুহতারাম উজিরে আজম, হামে সুইজারল্যান্ড নেহি চাহিয়ে। আপ পাঁচ সাল কেয়া দশ সাল লি-জিয়ে, হামে এক বাংলাদেশ বানা দি-জিয়ে'।

এই পাকিস্তান ২৩ বছর আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে লাহোর-ইসলামাবাদ গড়ে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল সেনাবাহিনীও। আর এই সেই পাকিস্তান এবং তথাকথিত দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ঘোষণায়, ডাকে এবং নেতৃত্বে নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র রূপ ধারণ করে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। ৫০ বছর আগে। আর আজ ৫১ বছরে পা দিয়ে তাঁরই কন্যা বর্তমান বিশ্বের অদম্য সাহসী রাষ্ট্রনেতা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আশপাশের দেশগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর আকস্মিক ছোবল অন্যসব দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নও কিছুটা ধাক্কা খেলেও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি। ঝড়ে পড়া নৌকার মাঝির মতো শক্ত হাতে হাল ধরে আছেন শেখ হাসিনা, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের বীর কন্যা। আমরা যদি আজকের পাকিস্তানের দিকে তাকাই দেখব, প্রতিটি সূচকেই পাকিস্তান আমাদের চেয়ে পিছিয়ে–যেমন, গত অর্থবছরে–

• জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বাংলাদেশ	৮.১৫%	পাকিস্তান	৫.২০%
• গড় আয়ু	”	৭৪	”	৬৮.১
• বেকারত্ব	”	৬%	”	১৩.২৫%
• ঋণ	”	২৭.৯০%	”	৭২.৫০%
• শিশু মৃত্যু	”	৩১.৭	”	৫২.১

আমার একটা আফসোস ছিল জাতির পিতার ঘোষণায় ও ডাকে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন স্বাধীন বাংলা বেতার ও আকাশবাণীর খবর ছিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করছে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। আইয়ুবের সামরিক শাসন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ–প্রতিটি লড়াইয়ের কর্মী ছিলাম। অথচ আম্রকাননে উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে আফসোস করতাম। আল্লাহপাকের শুকরিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহে এই পার্লামেন্টের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আর আফসোস থাকল না। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

লেখক: সংসদ সদস্য ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক

বিজয়ীবেশে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে

স্বদেশ রায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যতদিন এ পৃথিবীতে কথা বলবে, ততদিন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নাম সে ইতিহাসের সঙ্গে উচ্চারিত হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষে যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা পৃথিবীতে এক বিজয়ী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর নামটিও ছিল এক বিজয়ী নেতার নাম। তিনি শুধু বিজয়ী নন, তখন তিনি ছিলেন এক মানবতার নাম, যিনি নিজের দেশের চরম দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েও মানবিকতার নামে এক কোটি বাঙালি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সর্বোপরি তাঁর দেশের সৈনিকদের নামিয়েছিলেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে। ফলে দুই দেশের রক্তধারা এক হয় এই ঐতিহাসিক ভূমিতে।

এই ভূমিতে ইন্দিরা গান্ধী মাত্র একবারই এসেছিলেন। পৃথিবীর শত শত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান আমাদের দেশে এসেছেন, আসবেন। এমনকি বারবার আসবেন ভারতের নানা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। কিন্তু মিসেস গান্ধীর ওই সফরের উচ্চতাকে কেউ কোনোদিন স্পর্শ করতে পারবেন না। কারণ বিদেশি সরকারপ্রধান হলেও তাঁর পরিচয়, তাঁর অবস্থান ছিল ভিন্ন। তিনি শুধু বিদেশি কোনো সরকারপ্রধান নন, তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এমন একজন নেতা ও যোদ্ধা, যাকে ছাড়া বাংলাদেশ নয় মাসে বাস্তবে রূপ পেত না। বাংলাদেশের এই বন্ধু, এই মুক্তিযোদ্ধা প্রথম কোনো বিদেশি সরকারপ্রধান হিসাবে এসেছিলেন বাংলাদেশে। তাঁর বাংলাদেশ সফরের স্মারক হিসাবে বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে স্বাধীনতার ডাক দেন, যার পাশে পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করে, ঠিক ওই স্থানের পাশেই তৈরি করা হয়েছিল ইন্দিরা-মঞ্চ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর শিশু পার্ক তৈরি করার নামে জিয়াউর রহমান পাকিস্তানিদের নির্দেশে এই স্থানটি ঢেকে দেয়, ভেঙে ফেলে ইন্দিরা-মঞ্চ।

তবে ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ওই ভাষণটিকে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ক্ষমতা কারও নেই। ইতিহাসের স্মৃতি হিসাবে তৈরি কিছু স্মারকস্তম্ভ ভেঙে ফেলা যায়, ইতিহাসের ঘটনাকে মুছে ফেলা যায় না। আর কাগুজে মুদ্রণ যুগ শেষে যখন ইলেকট্রনিক মুদ্রণ যুগে প্রবেশ করেছে পৃথিবী, সে সময়ে ইতিহাসের ঘটনাকে মুছে ফেলার ক্ষমতা তো কারও নেই। শিল্পী হুসেন তাঁকে দেখেছিলেন বাংলাদেশের ধাত্রীরূপে। তাঁর তুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর মাতৃপেটজুড়ে তিনি এঁকেছিলেন বাংলাদেশের পতাকা। তাই এদেশের পতাকার প্রতিটি বিন্দুতে ইন্দিরা গান্ধীকে খুঁজে পাওয়া যাবে শত বছরের পরের ইতিহাসে বসেও এবং কেমনভাবে তিনি জড়িয়েছিলেন ইতিহাসের সঙ্গে, শুধু বীরত্ব নয়, কতটা মমতা দিয়ে তিনি ধারণ করেছিলেন বাংলাদেশকে–সে ইতিহাস অনেক বড়ো আকারের, অনেক খণ্ডের বই হিসাবে আছে এবং ভবিষ্যতে আরও লেখা হবে। তবে আমাদের এ মাটিতে এসে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেই ভাষণের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীকে খুঁজে দেখা যেতে পারে। কেমন ছিলেন সেই মহামানবী, যিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় একাধারে মাতৃহৃদয়া-আশ্রয়দাত্রী, অন্যদিকে যুদ্ধের ময়দানে লৌহমানবী। তাঁর ভালোবাসায় ও চেতনার কতটা গভীরে ছিল বাংলাদেশ।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ইন্দিরা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি যখন ভাষণ দেন, তখন তাঁর বয়স ৫৫ বছর। বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন ৫২ বছর। সমবয়সি দুই বিজয়ী নেতা সেদিন এক হয়েছিলেন ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে। আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র ৫৫ বছরের এই নেত্রী, সেদিন পৃথিবী কাঁপানো বিজয় সঙ্গে নিয়ে ওই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে, বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দেন, তা ছিল সম্পূর্ণ নির্মোহ এক ভাষণ। তাঁর ওই ভাষণটিকে যদি আমরা কিছুটা বিশ্লেষণ করে মোটা দাগে ভাগ করি, তাহলে কমপক্ষে তেরোটি ভাগে ভাগ করা যায়: ১. শুরু বা প্রারম্ভ। ২. বঙ্গবন্ধু আমাদের কে? ৩. মুজিবনগর সরকার ও তাঁর নেতৃবৃন্দ। ৪. ভারতীয় জনগণ ও ভারত কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাশে এলো। ৫. স্বাধীনতা পাওয়াই শেষ কথা নয়। ৬. ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পরবর্তী অভিজ্ঞতা। ৭. স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা কোথায় গিয়ে পৌঁছায়। ৮. ভারত নিজস্ব বোধ থেকে কাজ করেছে, কোনো সাহায্য নয়। ৯. ভারতীয় ইতিহাসের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু। ১০. ভারতীয় সৈনিকের রক্ত। ১১. ধর্ম ও বাস্তবতা। ১২. ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া এবং ১৩. পথ অনেক দীর্ঘ।

ভাষণের শুরুতে মাত্র একটি বাক্যে তিনি তাঁর পুরো আবেগটুকু প্রকাশ করেছেন, আর কোথাও কোনো আবেগ নেই। ইংরেজি ভাষায় দেওয়া তাঁর এ ভাষণের এই বাক্যটি, 'My heart overflows as I come to your beautiful country and this historic ground.' (আমার হৃদয়পাত্র উছলে উঠেছে আপনাদের এই সুন্দর ও ঐতিহাসিক ভূমিতে এসে)। রবীন্দ্রনাথের ছাত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা একটিমাত্র রাবীন্দ্রিক শব্দ ব্যবহার করে একটি বাক্যে তাঁর পুরো আবেগ শেষ করেই সূচনায় চলে গেছেন– তাঁদের প্রতি তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে যারা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, যে এক কোটি মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে তাঁর দেশে শরণার্থী হয়েছিলেন, সর্বোপরি ওই দিনটি অর্থাৎ ১৭ মার্চ এমন এক নেতার জন্মদিন যিনি শুধু আমাদের বঙ্গবন্ধু নন, সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের ভাই। এখানে ইন্দিরা গান্ধীর এই ভাষণ থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের দুটি বিষয় শেখার আছে–এক. আমরা মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ করি, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগকে স্মরণ করি; কিন্তু এক কোটি শরণার্থীর এই ত্যাগকে মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মরণ অনুষ্ঠানে আমরা খুব কমই স্মরণ করি, যা আমাদের সব সময়ই করা উচিত। দুই. বঙ্গবন্ধু যে শুধু গোটা বাঙালির নন, গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের নেতার প্রতীক–এই সত্য আমরা এখনো আমাদের সবার উপলব্ধিতে আনতে পারিনি, যা নতুন প্রজন্মকে আনতে হবে।

এরপরই তিনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের কে এবং তিনি আমাদের কী দিয়েছেন। ভাষণের এই চতুর্থ প্যারায় এসে তিনি বলেছেন, আপনাদের এখন অনেক সমস্যা আছে। নতুন দেশ হিসাবে সবদিকে সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনাদের অনেক সম্পদের ঘাটতি আছে। কিন্তু আপনারা ভাগ্যবান, আপনারা সেই বিশাল মাপের নেতা পেয়েছেন, যিনি শুধু তাঁর সারাটা জীবন আপনাদের ভালোর জন্য দেননি, তিনি আপনাদেরকে ঐক্য ও সাহস দিয়েছেন–এটাই আপনাদের মূল সম্পদ।

বাস্তবে বঙ্গবন্ধু আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসের সেই নেতা, যিনি আমাদের একতা দিয়েছিলেন। সত্যি অর্থে হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে বাঙালি ওই একবারই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক হয়েছিল। ওই একবারই বাঙালি পৃথিবীর সেরা সাহসী জাতি হয়েছিল। কোনো জাতির জীবনে ঐক্য ও সাহসের থেকে বড়ো সম্পদ আর কোনো কিছুই নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ এই সম্পদের কাছে অতি নগণ্য। জাতি হিসাবে আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হারাইনি, আমরা স্বাধীনতার পরপরই আমাদের ঐক্য হারিয়েছিলাম, সাহসও হারিয়েছিলাম। স্বাধীনতার পরপরই যে এই একতা হারানোর, সাহস হারানোর আশঙ্কা থাকে এবং কেন সেগুলো ঘটে, তাও মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের নয় ও এগারোতম প্যারায় বলে গিয়েছিলেন। তাঁর গোটা ভাষণটিকে তেরোটি ভাগে ভাগ করে প্রথমেই যে উল্লেখ করেছি, এর পঞ্চম ও সপ্তম ভাগ থেকে কিছু কথা উল্লেখ করলে এর কারণগুলো চলে আসে।

মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের নবম প্যারায় এসে বলেছেন, স্বাধীনতাই শেষ নয়। এ কথা বলতে গিয়ে মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি স্বাধীনতা পাওয়া মানে শেষ নয়, বরং এখান থেকেই শুরু হয়। স্বাধীনতা নতুন জীবন, নতুন নতুন সুযোগের দরজাগুলো খুলে দেয়। এই নতুন জীবন কখনোই কয়েকজন নেতা গড়ে দিতে পারেন না। এটা গোটা জাতির ত্যাগ, ঐক্য, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার ভেতর দিয়েই গড়ে তুলতে হয়। আপনাদের দেশ সুন্দর, সোনার দেশ। তবে আসলে তখনই দেশটি সোনার দেশ হবে, যখনই মানুষের জীবনের বোঝাগুলো হালকা হয়ে যাবে, সেখানেই জীবনের সৌন্দর্য।

ঠিক এমনইভাবে ভাষণের একাদশ প্যারায় মিসেস গান্ধী তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সতর্ক করেছেন আমাদের। তিনি বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ছিল দীর্ঘ সময়ের। এই দীর্ঘ পথ চলতে প্রতিটি পদক্ষেপে লাখো লাখো মানুষকে করতে হয়েছে মহত ত্যাগ। ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা স্বাধীন হই। স্বাধীন হওয়ার পর আমরা দেখতে পাই, স্বাধীনতা-পরবর্তী দুর্গম পথের কাছে স্বাধীনতাসংগ্রামের দুর্গম পথ কিছুই নয়। এ সময়ে যখন ঐক্যের দরকার হয়, তখন নানান মতের উপস্থিতি ঘটে। কিছু লোক অলৌকিক কিছু আশা করে। মনে করে, স্বাধীনতার ভেতর কোনো জাদুর কাঠি আছে, যা দিয়ে দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বাস্তবে সব থেকে কঠিন সময় হচ্ছে একটি নতুন জাতি বা রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করার পর। এই সময়ে যদি প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, আর দৃঢ়ভাবে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা যায়, তাহলেই একটি নতুন সমাজের শক্তিশালী ভিত্তি গঠন সম্ভব। একটি নতুন জাতিকে শুধু তার দেশের ভেতর থেকেই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় না, আন্তর্জাতিক সমস্যাও মোকাবিলা করতে হয়।

আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়টা লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাই–আমাদের আজ যে ব্যর্থতা, আমরা যে এখনো সত্যিকার অর্থে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনি, আমরা যে স্বাধীনতার অনেক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছি, এর মূল কারণ এখানেই নিহিত। স্বাধীনতার পরে দেশ গড়ার জন্য আমরা ত্যাগ করতে পারেনি, ঐক্য ধরে রাখতে পারিনি। সত্যি অর্থে উপলব্ধি করতে পারিনি, যা ইন্দিরা গান্ধী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ৭ মার্চের ভাষণে এই কথাগুলোই মাত্র দুটি বাক্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এই ঘোষণা দেওয়ার পরেই তিনি বলেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই মুক্তির জন্য কী করতে হবে, সেটাই ইন্দিরা গান্ধী ১৭ মার্চের ভাষণে তাঁর দেশের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ওই ভাষণের পঞ্চম প্যারায় এসে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মুজিবনগর সরকারের ৯ মাসের কাজ এবং মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধকে এক মহাকাব্যিক অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ও ত্যাগী সহকর্মী, যারা সত্যি অর্থে অনেক বড়ো নেতা, তাঁরা সেদিন লাল-সবুজ পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বিশ্ববিবেককে জাগিয়েছিলেন, এমনকি যারা সেদিন বাংলাদেশের কণ্ঠকে বন্ধ করতে চাচ্ছিল, তাদেরও প্রতিহত করেন বঙ্গবন্ধুর এই সহকর্মীরা। সর্বোপরি, উজ্জ্বল তরুণ ও ছাত্রলীগের গড়ে তোলা মুক্তিবাহিনীর আত্মোৎসর্গ গড়ে তোলে এক মহাকাব্য।

বাস্তবে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা আমাদের ইতিহাসের এক বিশাল অধ্যায়। দুর্দিনে বসে সোনালি অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যেতে হলে কী করতে হয়, এর স্মারক এই সময়টি। আর এ সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর যোগ্য সহকর্মীরা। বঙ্গবন্ধুর সেই সহকর্মীরা শেষ অবধি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, তাঁদের আনুগত্য ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাঁদের কথাই বললেন ইন্দিরাজি তাঁর ভাষণে। তবে সত্যি হলো, মুজিবনগরে যে মহাকাব্য লেখা হয়েছিল, আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা যার অন্যতম অগ্রসেনানী, তাঁরা কিন্তু স্বাধীনতার পরে সেই মহাকাব্যের পরবর্তী অধ্যায় আর সঠিকভাবে লিখতে পারেননি।

অন্যদিকে ১৯৭২ সালে তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য। বিদেশি অনেক পত্রপত্রিকা প্রচার করছে, অনেক সাংবাদিক লিখছেন, এক খাকি ড্রেস থেকে আরেক খাকি ড্রেসে প্রবেশ করেছে নতুন রাষ্ট্রটি। কারণ, তখন পর্যন্ত অনেকেই বুঝতে পারছেন না মিসেস গান্ধী দ্রুতই ভারতীয় সৈন্যকে প্রত্যাহার করে নিয়ে বাংলাদেশকে যাতে পৃথিবীর সব দেশ স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত না হয়, সে পথ তৈরি করবেন। তবে সাধারণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের এটা বোঝা উচিত ছিল, জয়ের শতভাগ সম্ভাবনা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান খণ্ডে ভারতের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেন মিসেস গান্ধী। যার ভেতর দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, তাঁর সরকারের কোনো উদ্দেশ্য নেই পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমি দখল করার। পূর্বখণ্ডে তাঁর সরকার যা করেছে, তা মিত্রবাহিনী হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা। সেখানে কোনো কলোনি গড়ে তোলার জন্য নয়। তাই তিনি যে এখান থেকে দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার করবেন, বাংলাদেশ যে সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, সেখানে ভারতের কোনো আধিপত্য থাকবে না, তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যেদিন তিনি পশ্চিমখণ্ডে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন সেদিনই।

তারপরও ১৭ মার্চ মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের পঞ্চম প্যারায় বলেন, যদি ভারত আপনাদের সাহায্য করে থাকে, তা কেবল আপনাদের দাবি এবং আপনাদের দুঃখ ও ভোগান্তি শোনার পর ভারত চুপ করে বসে থাকতে পারে না, এ কারণেই। যদি আমরা আপনাদের সাহায্য করে থাকি তবে তা ভারতাত্মা যে নীতি, আদর্শ বিশ্বাস করে, তারই প্রতিফলন। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের যে সহযোগিতা করেছিলাম, তার কোনো প্রতিফলন থাকবে না। দুটি সার্বভৌম দেশ শুধু যেভাবে সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা করে সম্পর্ক তৈরি হয়, আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হবে। ভাষণের ত্রয়োদশ প্যারায় এসে তিনি বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলেন, আপনারা আমাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন; কিন্তু আমরা যাই করি না কেন, আমাকে বলতে দিন, আমরা আমাদের নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে করেছি, মানবতার দাবি থেকে করেছি। এটা আমাদের কর্তব্যমাত্র।

> আর এই বিশ্বমানবের মুক্তির প্রতীক বঙ্গবন্ধু আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারেন, তা উল্লেখ করেন মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের চৌদ্দতম প্যারায় এসে

ইন্দিরা গান্ধীর এই রাজনৈতিক ও আত্মিক বোধের অবস্থানের কারণেই এর কয়েকদিনের ভেতর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য শুধু চলে যায়নি, দক্ষিণ এশিয়ার সদ্যোজাত এই দেশটি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমানতালে তখনই ভারতের সঙ্গে পা ফেলে। কখনোই মনে হয়নি, ভারত একটি বৃহৎ প্রতিবেশী। বরং এর থেকে বেশি মনে হতো ইন্দিরা গান্ধী যদিও সে সময়ে বিশ্বনেত্রী, এরপরও বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব বিশ্বমানবের মুক্তির প্রতীক।

আর এই বিশ্বমানবের মুক্তির প্রতীক বঙ্গবন্ধু আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারেন, তা উল্লেখ করেন মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের চৌদ্দতম প্যারায় এসে। তিনি তাঁর ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়েছে বহু ধর্ম ও চিন্তার সমন্বয়ে। যাদের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ বোস, চিত্তরঞ্জন দাশ, আবদুল গাফফার খান, মৌলানা আজাদ প্রমুখ। তাঁর এ ভাষণের এই অংশের পরেই মিসেস গান্ধীর পরিমিতবোধের কথা বা তাঁর বিনয়ের নিদর্শনের দিকে না তাকালে তাঁকে উপলব্ধি করতে ভুল হয়ে যাবে। এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

তৈরিতে তাঁর পিতামহ মতিলাল নেহরু ও তার পিতা পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর ভূমিকা ইতিহাসের অংশ। কিন্তু তিনি তাঁদের নাম অতি সাবধানে এড়িয়ে গেছেন। নিজ মুখে বলেননি। যা হোক, এই অংশে এসে তিনি বলেছেন, দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ভারতের পথ ভারতের নিজস্ব, বাংলাদেশের পথ বাংলাদেশের নিজস্ব। বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাই বাংলাদেশের পথ তৈরি করে দেবে। তবে বাংলাদেশের উন্নত পথ তৈরি করতে হলে যে বঙ্গবন্ধুর হাতকেই শক্তিশালী করতে হবে, বাংলাদেশের জনগণের সে কথাই বললেন মিসেস গান্ধী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আপনারা ভাগ্যবান যে, আপনারা শেখ মুজিবুর রহমানের মতো আকাশছোঁয়া এক ত্যাগী নেতা পেয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুধু আপনাদের দেশের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীতে যেখানে মূল্যবোধের জন্য, সাহসের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সত্যের জন্য মানুষ দাঁড়াবে, সেখানেই থাকবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এমনকি যেখানে মানুষ মানবতার স্বার্থে এক হবে, সেখানেই সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। আপনাদের নেতার মাধ্যমে এই পরম সুযোগ আপনাদের জন্য এসেছে, তা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের হাতকে শক্তিশালী করেই, তাঁকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেই আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন।

এই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ধর্ম যে মূল বিষয় নয়, সে কথা মিসেস গান্ধী তাঁর ভাষণের পঞ্চদশ প্যারায় উল্লেখ করেন। তিনি স্বীকার করেন, প্রতিটি জাতি তার ধর্ম থেকে শক্তি নেয় ঠিকই; কিন্তু তার মৌলিক চাহিদা মেটাতে দরকার হয় ঐক্য, দরকার হয় সোশ্যাল জাস্টিস। আর এই ঐক্যের ক্ষেত্রে সোশ্যাল জাস্টিসের চেয়ে ধর্ম যে বড়ো নয়, তা উল্লেখ করে ওই প্যারায় বলেছেন, আমি গর্বিত যে এই মাটিতে আমার দেশের সৈনিকদের রক্ত মিশে আছে, যা আমাদের ভবিষ্যতের বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

ভাষণের শেষ প্রান্তে এসে অর্থাৎ ধন্যবাদ জানানোর আগের দুই প্যারায় অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ প্যারায় দেখা মেলে আধুনিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের কারিকর জওয়াহেরলাল নেহরুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। অর্থাৎ, শান্ত মাথার এক রাষ্ট্রনায়কের। তিনি বলেন, এখানে এক মহা কর্মযজ্ঞের শুরু হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি সেটা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। এর প্রতিটি ধাপই বাংলাদেশকে শক্তিশালী করবে। এবং এই উন্নতি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পৌঁছে যাবে প্রতিটি দুয়ারে। সেটাই সোনার বাংলা বা গোল্ডেন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরে যে দুরন্ত গতির সৃষ্টি হয়, তরুণরা অস্থির হয়ে ওঠে, সেটাকে খাটো না করে তিনি বললেন, এই কর্মযজ্ঞ একদিনের নয়, এক লাফের নয়, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে। আর ধন্যবাদ দেওয়ার শেষ প্যারায় এসে তিনি তার পিতার মতো দার্শনিক উক্তির ভেতর দিয়েই প্রকৃত বাস্তবতা ও প্রকৃত ধন্যবাদটি জানালেন–রাস্তা দীর্ঘ এবং দুর্গম, তবে সাহসী কোনো বাধা মানে না, গুরুত্ব দেয় না কোনো বিপদকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে ইন্দিরা গান্ধী তাই বাঙালির হৃদয়ে জেগে উঠবেই। কারণ তাঁকে ছাড়া কখনোই যে আমাদের ইতিহাস লেখা পরিপূর্ণ হবে না। পরিপূর্ণ হবে না আমাদের ইতিহাস স্মরণের কোনো মহাযজ্ঞ।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্র ব ন্ধ

৫০ বছরে আইনের জগতে উত্থানপতনের ইতিহাস

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী পালনকালে বহু বিষয়ের মধ্যে বিবেচনায় আসে আমাদের আইন এবং বিচারজগতে প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার কথা। এই ব্যাপারে দেশের ইতিহাসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করাই সমীচীন। প্রথম ভাগ শুরু হয় মুক্তিপ্রাপ্তির পর এবং শেষ হয় বঙ্গবন্ধুর হত্যার দিন। সেটি ছিল স্বর্ণময় তিনটি বছর। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যার পর, যাকে কলঙ্কময় কৃষ্ণযুগ বলাই সঠিক। এরপর ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় এলে স্বল্পকালের জন্য যে অর্ধদশকের সূচনা হয়, সেটিও ছিল ক্ষণস্থায়ী স্বর্ণযুগ। কিন্তু তারপরই আবার ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে পাকিস্তানি চরদের শাসন আবার ফিরে এলে আরেকটি কলঙ্কময় অধ্যায় শুরু হয়, ২০০০ সালের নির্বাচনের পরপরই। তখন বিএনপি-জামায়াতের হায়েনারা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগসহ যেসব অপরাধ চালিয়েছিল তা শুধু আইন এবং বিচার অঙ্গনকেই কলঙ্কিত করেনি বরং বিশ্ববিবেককেও প্রকম্পিত করেছিল। কোনো অপরাধীরই বিচার করেনি বিএনপি-জামায়াত সরকার অর্থাৎ জিয়ার আমলে সূচিত বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকে। পরে ২০০৯ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় এসে পুনরায় গৌরবময় যুগের সূচনা করে।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে লন্ডন-দিল্লি হয়ে দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ৩৪ জন গণপরিষদ সদস্যের সমন্বয়ে সংবিধান রচনার জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তাদের কাছে বহুদেশের সংবিধান প্রদান করে প্রতিনিয়ত এই মর্মে নির্দেশনা দিতেন যে আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বিশেষভাবে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ১৯৪৮

সালে জাতিসংঘে গৃহীত মানবাধিকার সনদে যেসব অধিকারের কথা রয়েছে, সেগুলো আমাদের সংবিধানেও রাখতে হবে। তার ইচ্ছার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটিয়ে ১৯৭২ সালের নভেম্বরে যে সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় তাতে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা যেমন ছিল, তেমনই ছিল সব মানবাধিকারের নিশ্চয়তা এবং প্রয়োগের বিধান। সংবিধানে জনগণকে রাষ্ট্রের মালিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যা সত্যিই বিরল। ৯ মাস সময়ে রচিত বাহাত্তরের সেই সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসাবে বিবেচিত হয়। এতে বিচার বিভাগের পৃথক্করণের কথা ছিল। এছাড়াও ছিল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণের কথা, যেগুলোকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সংবিধানে মানবাধিকার এবং সেগুলোর প্রয়োগ নিশ্চিত করে ১৮টি অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করা হয়, যেগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু দালাল আইন করে বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধীদের। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি (ট্রাইব্যুনাল) আইন প্রণয়ন করেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করছিলেন। এই জন্য তিনি সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে পরিবর্তনও এনেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় সংবিধান এবং আইনের শাসনেই দেশ চলছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে খুনি মোশতাক এবং খুনি জিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়েছিল গণতন্ত্র এবং বাহাত্তরের সংবিধানকেও, গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সব চেতনাকে। সেই সংবিধানকে ধ্বংসস্তূপে ফেলে দিয়েছিল পাকিস্তানপ্রেমী জিয়া এবং মোশতাক বন্দুকের বলে সামরিক একনায়ক শাসন চাপিয়ে দিয়ে। আইনের শাসন, গণতন্ত্র তথা সাংবিধানিক শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলিক অধিকারের ওপর চালানো হয়েছিল স্টিম রোলার। ১৯৭৯ পর্যন্ত জিয়া চালালো সামরিক একনায়কতন্ত্র। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ/আইন করে খুনি জিয়া এবং খুনি মোশতাক শুরু করেছিল বিচারহীনতার সংস্কৃতি। সাত খুনের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শফিউল আলম প্রধানকে মুক্তি দিয়ে সূচনা করেছিল অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য। দালাল আইন রহিত করে এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে বরং তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল খুনি জিয়া। দালাল আইন বাতিল করে সব রাজাকারকে মুক্তি দিয়েছিল। প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে কমবেশি ১,৫০০ মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে তার হাত রক্তাক্ত করেছিল। আইনের শাসনের তত্ত্ব হয়েছিল ভূলুণ্ঠিত। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অসাংবিধানিকভাবে খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতায় বসিয়ে এবং জিয়া নিজে সামরিক প্রধান হয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বিলুপ্ত করে দেশদ্রোহিতা করেছিল বলে আমাদের সুপ্রিমকোর্ট রায়ে উল্লেখ করেছেন। খুনি জিয়াউর রহমানের বর্বরতা এবং হত্যাযজ্ঞের কারণে আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট তাকে ঠান্ডা মাথার খুনি বলে আখ্যায়িত করে রায় দিয়েছেন, যার কারণে ইতঃপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শহরে তার নামে যে সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল তা সরিয়ে দেয়। খুনি জিয়ার কার্যকালকে হত্যা, নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারিতা, অপশাসন এবং ফ্যাসিবাদী কাল হিসাবে আখ্যায়িত করাটাই উপযুক্ত। ইসলাম ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র আনুগত্য না থাকলেও বহু পাপকর্মের এই খলনায়ক জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিসমিল্লাহ শব্দটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কয়েক শ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এই ঠান্ডা মাথার খুনি যে পাপ করেছে, তা তো ক্ষমার অযোগ্য। খুনি জিয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধূলিসাৎ করে কুখ্যাত রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধী ছারছীনার পিরকে স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়ে সেই পুরস্কারকে কলঙ্কিত করেছিল। সে কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে এনে তার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ছাড়াও সে বহু যুদ্ধাপরাধীকে সম্মানজনক পদ দিয়ে আইনের শাসনকে পদদলিত করেছে। আমাদের দেশের উত্তরাধিকার আইন লঙ্ঘন করে খুনি জিয়া বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে তার পৈতৃক বাড়িতে প্রবেশে বাধা দিয়ে যে অপরাধটি করেছিল, তা সভ্য জগতে বিরল। খুনি জিয়া যে বঙ্গবন্ধু হত্যায় মুখ্য ভূমিকায় ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছাড়াও রয়েছে সিআইএ-এর অবমুক্ত দলিলপত্র, যাতে বলা হয়েছে–জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনার জন্য খুনি মোশতাকের বাড়িতে গোপনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টারের সঙ্গে বৈঠক করেছিল।

খুনি জিয়ার প্রস্থানের পর এরশাদও জিয়া প্রবর্তিত পন্থাই অনুসরণ করেছিল। ব্যক্তিজীবনে ধর্ম থেকে বহু দূরে থাকা সেই লোকটিও মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার পন্থা হিসাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বলে একটি তত্ত্ব সংবিধানে সংযোজন করেছিল, যদিও রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে এরশাদও দেশকে মুক্ত করেনি। তার আমলেও হয়েছে অবাধ দুর্নীতি এবং দুঃশাসন, ধর্মের নামে ভন্ডামি। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টাই হয়নি। এরশাদের পতনের পর আরেক পাকিস্তানপ্রেমী, তথা খুনি জিয়ার স্ত্রী ক্ষমতায় বসে কমবেশি জিয়ার অনুসরণেই দেশ চালান। তিনি ইনডেমনিটি আইন নস্যাৎ না করে বিচারহীনতার সংস্কৃতিই চালিয়ে যান এবং বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ খুনিদের আরও বেশি করে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করেন, তাদের মহান সংসদে স্থান করে দিয়ে সংসদের অবমাননা করেন। অপারেশন ক্লিনহার্ট নাম করে বিনা বিচারে হত্যা করার জন্য আইন প্রয়োগকারীদের আদেশ দিয়ে তিনি সংবিধান এবং আইনের শাসনকে যেভাবে টুঁটি চেপে হত্যা করেছিলেন, এর নজিরও পৃথিবীতে বিরল। তখনই শুরু হয়েছিল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংস্কৃতি। এই আদেশের ফলে আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বহু নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, আটক এবং জখম করেছিল। দোষীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খালেদা জিয়া তার স্বামীর অনুসরণেই ২০০৩ সালে একটি ইনডেমনিটি আইন করেছিল, যা পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট বেআইনি বলে রায় দিয়েছিলেন। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অপারেশন ক্লিনহার্টের নির্দেশ পেয়ে আইন প্রয়োগকারীরা কয়েক শ নিরপরাধ লোককে হত্যা, আটক এবং আহত করে। স্বামীর অনুকরণেই খালেদা জিয়া ঝন্টু নামের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত খুনের আসামি মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কারণ সে খালেদার রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল। চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে খালেদা জিয়া আইনের শাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এবং জেলহত্যার বিচার লন্ডভন্ড করার সব চেষ্টাই খালেদা জিয়া করেছিলেন। জেলহত্যার অন্যতম আসামি মেজর খায়রুজ্জামান এবং বঙ্গবন্ধুর খুনি আজিজ পাশাকে রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করেছিলেন। খালেদার আমলে এবং তার জ্ঞাতসারেই তার খুনি পুত্র তারেক জিয়ার নেতৃত্বে এবং তার রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী, তার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরসহ আরও দুজন প্রতিমন্ত্রী এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট পাকিস্তানে তৈরি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আইভি রহমানসহ বেশকিছু লোককে হত্যা করে। আহত করে শেখ হাসিনাসহ কয়েক শ মানুষকে। কারও বিচার করেনি খালেদা জিয়া, বরং এক আসামি মওলানা তাজউদ্দিনকে সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়। সেসময়ে বিচারের জগতে প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছিল 'জজ মিয়া' নাটকের মাধ্যমে। সরকারি মদতে, কজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তখন ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দেওয়ার জন্য ১০ ট্রাক অস্ত্র আনা হলে অনেকটা দৈবক্রমেই তা ধরা পড়ে। এরপরও বিচারের নামে হয়েছিল প্রহসন। আহসান উল্লাহ মাস্টার এবং শাহ কিবরিয়ার মতো অত্যন্ত সৎ এবং

নিষ্ঠাবান আওয়ামী নেতাকে বিএনপি-জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় হত্যা করা হয়, বিচার হয়নি। সংবিধানকে বাহাত্তরের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়নি। চার বছরের বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের জাঁতাকল চালানোর কারণে বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন এবং বহু আওয়ামীপন্থি মুসলমানও বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেসময়ে সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়িসহ বহু হিন্দুর সম্পত্তি বেদখল করা হয়। ১৯৯৬ সালে স্বল্পকালের জন্য ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার শুরু করলেও চার বছর পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে সর্বাত্মক চেষ্টা করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করার। যেখানে হাইকোর্ট বিভাগের একজন মাননীয় বিচারপতিকে সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী আপিল বিভাগে সাময়িকভাবে পদোন্নতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা চালানো যেত, বিএনপি সরকার তা করেনি। জেলহত্যা মামলায় চারজন মূল আসামি যথা ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের ঠাকুর এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুকে নিম্ন আদালত বিএনপি সরকারের চাপে খালাস দেয়, যদিও এই চার জনের বিরুদ্ধে পর্বততুল্য প্রমাণ ছিল। বিএনপি সরকার খালাস দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিলও করেনি। সেসময়ে নিম্ন আদালতের বিচারকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি বিধায় বিচারিক আদালত বিএনপি সরকারের চাপ প্রতিহত করতে পারেনি। জেলহত্যা মামলা হাইকোর্টে আপিল আকারে গেলে জাতি আরেক নাটক দেখতে পায়। বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী এবং আতাউর রহমান নামক দুজন কট্টর বিএনপিপন্থি বিচারপতি একজন সাজাপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য সবাইকে খালাস দিয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থায় একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। পরে অবশ্য আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়কে খণ্ডন করে সাজাপ্রাপ্তদের সাজা নিশ্চিত করে রায় দিয়েছিলেন। সেই চার বছর ছিল বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের জন্য অভয়ারণ্য, যাতে জড়িত ছিল খালেদা জিয়ার দুই পুত্র, তার মন্ত্রী সাকা চৌধুরী, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান, তারেক জিয়ার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুন, তার উপদেষ্টা আবদুল আউয়াল মিন্টু প্রমুখ। এদের সবার নামই পানামা পেপারসে প্রকাশিত হয়েছে। এদের অপকাণ্ড রোধ করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি, বিচারও করা হয়নি। খালেদা জিয়া নিজেও কয়েক শ স্যুটকেসবোঝাই টাকা মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তখনকার বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময়ে আফগানিস্তানফেরত কিছু জঙ্গি দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলেও বিএনপি-জামায়াত সরকার তাদের বিচার তো করেইনি বরং তাদের নেতা বাংলাভাইকে অস্তিত্বহীন সংবাদমাধ্যমের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছে। খালেদা জিয়া স্বামীর হ্যাঁ-না ভোটের অনুকরণে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি অবৈধ নির্বাচন দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করেছিলেন। তিনি হাইকোর্টের ১৪ জন বিচারপতিকে এজন্য কনফার্ম না করে অপসারণ করেছিলেন যে, তারা আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন। বিএনপির পরবর্তী নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করার জন্য খালেদা জিয়া সংবিধান পরিবর্তন করে এমন একজন প্রধান বিচারপতির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যিনি তাদের দলের একজন সাবেক নেতা ছিলেন।

২০০৮-এর নির্বাচনের পর আবার শুরু হয় আইন ও বিচার ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ। বস্তুত ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর। আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ সালের শাসনকালেই বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে ইনডেমনিটি আইন নস্যাৎ করে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেলহত্যার যে বিচার শুরু হয়েছিল, তা পূর্ণতা পায় আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে পুনরায় নিরঙ্কুশ ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর। তারা কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের শুধু বিচারই করেননি, সাকা চৌধুরী, কাদের মোল্লা, মীর কাসেম আলী, মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় এবং সাঈদী ও কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ বাস্তবায়ন করে আইনের শাসনের ভিত্তি সুসংহত করেছেন। চৌধুরী মঈনুদ্দীন নামের ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত একজন বিলেতে পালিয়ে যাওয়া আসামিকেও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধুর যেসব খুনিকে ধরতে পারা গিয়েছিল, তাদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়েছে আর যারা বিদেশে পালিয়ে আছে, তাদের ফেরত আনার চেষ্টা চলছে। একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় হত্যা ঘটানোর দায়ে খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক জিয়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাছাড়া ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১৯ জনের যাবজ্জীবন এবং ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে দুজন পাকিস্তানিও রয়েছে, রয়েছে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর এবং পিন্টু। অন্যান্য মেয়াদে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে সামরিক গোয়েন্দা ও জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী এবং পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা ও কয়েকজন সংসদ সদস্য। দুর্নীতির দায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ারও একাধিক মামলায় সাজা হয়। সাজা হয় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার। এই সরকার বিচারে তোলার ব্যাপারে আসামির দলীয় পরিচয় বিচার করছে না বলে বহু আওয়ামী লীগ নেতারও বিচার হয়েছে বা হচ্ছে, যার তালিকা মোটেও ছোটো নয়। বিএনপি সরকারের সময়ই পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে জিয়া-মোশতাক কর্তৃক সংবিধান তছনছ করা কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করে ৭২-এর সংবিধান ফিরিয়ে আনার রায় প্রদান করেন আমাদের হাইকোর্ট, যেটি ছিল আমাদের বিচারিক ইতিহাসে মাইলফলক। সেই রায় এবং পরবর্তী সময়ে সপ্তম সংশোধনী মামলার রায় দ্বারা অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের জন্য জিয়া, মোশতাক এবং বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রদ্রোহী, সংবিধান এবং গণতন্ত্র ধ্বংসকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন আমাদের সুপ্রিমকোর্ট। সেই রায় কার্যকর করে বর্তমান সরকার সংবিধান পরিবর্তন করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

> ৯ মাস সময়ে রচিত বাহাত্তরের সেই সংবিধান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসাবে বিবেচিত হয়। এতে বিচার বিভাগের পৃথক্করণের কথা ছিল। এছাড়াও ছিল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণের কথা, যেগুলোকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে

এখনো চলছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা অটুট রয়েছে। এখনো আপিল বিভাগের দুজন সাবেক বিচারপতির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। ধর্ষণের ঘটনা রোধকল্পে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ উদ্ধারের জন্য অর্থঋণ আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং ব্যাংকগুলোকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। মামলার জট কমানোর জন্য আদালতের বাইরে এবং ভেতরে সালিশের বিধান করা হয়েছে। বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধের এবং পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য ২০১২ সালে প্রণীত আইন দ্বারা আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম দেওয়া হয়েছে, যে সংস্থা একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাহায্যে বিদেশে পাচারকৃত টাকার খবর পাচ্ছে এবং আনতে পারছে। এরই মধ্যে তারেক জিয়া ও কোকোর পাচার করা প্রচুর টাকা ফেরত আনা হয়েছে। বিলেতের ব্যাংকে রক্ষিত তারেক জিয়া এবং তার বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের টাকা সে দেশের কর্তৃপক্ষ জব্দ করেছে। সিঙ্গাপুর এবং হংকং কর্তৃপক্ষ জব্দ করেছে সাকার এবং মোর্শেদ খানের হাজার হাজার কোটি ডলার। পাওয়া গেছে বহু পাচারকারীর নাম ও তথ্য। অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য বেশকিছু পুলিশ কর্মকর্তার বিচার চলছে। এরই মধ্যে একজন জেলা জজ মর্যাদার বিচারকের বিচারিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করেছেন মহামান্য আপিল বিভাগ তার দ্বারা সংঘটিত নিয়মহীনতার জন্য, যার জন্য মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ক্ষুদ্র বিচারের ত্বরিত নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম আদালতের আইনে সংস্কার আনা হয়েছে। নাগরিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা বন্ধের জন্য একদিকে যেমন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে, অন্যদিকে সেই আইন যেন অপব্যবহার না হয়, এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরও সংস্কারের কথা বিবেচনাধীন রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যায় নেপথ্যের খলনায়কদের চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের কথা বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার ২৫ মার্চকে প্রথমবারের মতো গণহত্যা দিবস বলে ঘোষণা দিয়েছে। ফলে আমাদের দেশে পাকিস্তান কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতিও সম্ভব হবে। ইতিহাস বিকৃতিকারীদের সাজার বিধান করে একটি আইনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইন প্রণয়নেরও।

১৯৭১ সালে দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর উচ্চ আদালত কয়েকটি রায় দিয়ে তার বহু বছরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে ম্লান করেছে। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায় যুদ্ধাপরাধীদের শিরোমণি কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে সুপ্রিমকোর্টের রায়। বঙ্গবন্ধুকে খুন করে খুনি জিয়া তার পাকিস্তানীকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে খুনি গোলাম আযমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনে এবং তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। সেই কুখ্যাত রাজাকার গোলাম আযম পাকিস্তানি পাসপোর্টেই বাংলাদেশে এসেছিল। ১৯৭৮ সালে সুপ্রিমকোর্টের স্বনামধন্য এবং অতি প্রজ্ঞা এবং নিষ্ঠাবান দুজন বিচারপতি যথা প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল এবং বিচারপতি জনাব হাবিবুর রহমান (শেলি) খুনি গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে রায় প্রদান করে আমাদের বহু বছরের গর্বযোগ্য বিচারিক ইতিহাসে এক কলঙ্কলেপন করে দেন। এ দুজন মাননীয় বিচারপতিই আমাদের বিচারজগতে অত্যন্ত মেধাবী এবং বিচক্ষণ বিচারপতি হিসাবে খ্যাত এবং শ্রদ্ধেয়। বিচারপতি মোস্তফা কামাল আইনের জগতে এক ধ্রুবতারা। আইনে তার জ্ঞান এবং দখল ঈর্ষাযোগ্য। বিচারপতি হাবিবুর রহমান শেলি, যিনি একজন প্রগতিমনা ব্যক্তি হিসাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয়, যিনি আইন ছাড়া তার বহুমুখী প্রতিভার জন্য ভাস্বর হয়ে আছেন। রবীন্দ্র এবং অন্যান্য সাহিত্যেও যার রয়েছে অপার প্রজ্ঞা, তিনি খুনি গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দিয়ে তার সারা জীবনের গৌরবময় অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছেন। এই কলঙ্ক থেকে তারা কখনো মুক্ত হতে পারবেন না। কথায় বলে–এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চনা পুরো বালতির দুধকে নষ্ট করে দেয়। এই দুই বিরল প্রতিভার অধিকারী, নিষ্ঠাবান বিচারপতিও তাই করেছেন। সব দেশেই নাগরিকত্বের এক বড়ো শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রতি একচ্ছত্র আনুগত্য। খুনি গোলাম আযম শুধু প্রকাশ্যে বাংলাদেশের সৃষ্টির বিরোধিতা এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য জোর গলায় প্রকাশ করেনি, সে আমাদের মুক্তির কথা টের পেয়ে '৭১ সালের ১৬ আগস্টের আগেই বাংলাদেশ ত্যাগ করে তার আনুগত্যের পাকিস্তানে চলে যায়। শুধু তাই নয়, সে পাকিস্তানে গিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে সে উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করতে থাকে বাংলাদেশে ফেরার পরও। সে বাংলাদেশে ফেরার পরও তার 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার' পরিকল্পনা চালায়। এ অবস্থায় সে আন্তর্জাতিক বা দেশি কোনো আইনেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেতে পারে না। এ দুজন অতি প্রাজ্ঞ বিচারপতি কী করে খুনি গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিলেন, তা চিরদিনই একটি অনুত্তরযোগ্য প্রশ্ন হয়ে থাকবে।

আমাদের উচ্চ আদালত আরও একটি মামলার রায় দিয়ে বঙ্গবন্ধু খুনি কর্নেল রশিদের স্ত্রী জোবায়দা রশিদের এক রিট মামলার রায় দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার অভিযোগ থেকে তাকে বেকসুর খালাস করে দেন হাইকোর্টের বিচারপতি মোজাম্মেল হক ১৯৯৭ সালে। অথচ এ ব্যাপারে অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল যে বঙ্গবন্ধু হত্যার দিনই, হত্যা পরবর্তী সময়ে বঙ্গভবনে খুনিদের যে সভা হয়, সেখানে অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল এই জোবায়দা রশিদ। মুক্তি পেয়েই সে পাকিস্তান চলে গিয়ে খুনিদের দল ফ্রিডম পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে থাকে পাকিস্তান থেকে, যা সে এখনো করছে। উল্লেখ্য, বিচারপতি মোজাম্মেল হক অবসরের পর বিএনপির রাজনীতি শুরু করে বিএনপির টিকিটে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন।

আরও একটি কলঙ্কিত রায় দিয়েছেন বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী এবং আতাউর রহমান খান। এ দুই মাননীয় বিচারপতি জেলহত্যা মামলায় বিচারিক আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের আপিল শুনে একজন ছাড়া সবাইকে খালাস করে দেন, যেটি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল বলে সব বিজ্ঞ আইনজ্ঞই মনে করেন এবং একই কারণে এর পরে আপিল বিভাগ আবার এদের সবার সাজা বহাল রেখে রায় দেন।

নিম্ন আদালতও একটি কলঙ্কিত রায় দিয়ে জেলহত্যার অভিযোগ থেকে ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের ঠাকুর এবং নুরুল ইসলাম মঞ্জুকে খালাস দেয় সেসময়ে বিএনপি-জামায়াত সরকারের চাপে। অথচ এই চারজন আসামির বিরুদ্ধেই অখণ্ডনযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল।

সুতরাং স্বাধীনতার পর ৫০ বছরের ইতিহাসে বিচার এবং আইনাঙ্গনে যেমন রয়েছে গৌরবের ইতিহাস, তেমনই রয়েছে হতাশার কথাও। জাতির পিতা হত্যার বিচার পূর্ণতা পেয়েছে বলার অবকাশ নেই। যারা প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র হাতে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছিল, তাদের বিচার হয়েছে; কিন্তু যারা পর্দার আড়ালে থেকে আসল কলকাঠি নেড়েছিল, যথা খুনি জিয়া, খুনি মোশতাক গং তাদের বিচার তো হলো না। যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদেরও কজন এখনো পালিয়ে আছে। এসব কারণে আমরা এখনো দায়মুক্তি পাইনি, তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, কলামিস্ট

প্র ব ন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছরের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

এ বছর আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ৫০ বছরে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি যেমন উল্লেখ করার মতো অর্জিত হয়েছে, একইভাবে নানা সমস্যা, বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা এবং হস্তক্ষেপ আমাদের বিকাশের স্বাভাবিক গতিকে কখনো কখনো কক্ষচ্যুত করতে তৎপর ছিল। এ কারণে প্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত অর্জন গত ৫০ বছরে আমরা লাভ করতে পারিনি। তবে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বিপরীত ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করা না হতো, তাহলে ৫০ বছরে আমাদের স্বাধীনতার অর্জন অনেক বেশি হতো– এতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার ৫০ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে তাই বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতা এবং বিকাশের গতি মন্থর হওয়ার কারণ ও ঘটনাপ্রবাহগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করা দরকার। তাহলেই দেশের রাজনীতিতে ৫০ বছরের ইতিহাস নির্মোহভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে সঠিক ধারায় পরিচালিত করার ক্ষেত্রে আমরা সচেতনতার পরিচয় দিতে সক্ষম হব।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সরাসরি কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির পরাধীনতা থেকে নয়। যদিও ১৯০ বছর আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে ছিলাম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির ফলে পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক, সামরিক এবং অস্বাভাবিক রাষ্ট্রে আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সেটি আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়নি। বরং আমরা কৃত্রিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়েছিলাম, হারিয়েছিলাম স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। পাকিস্তান রাষ্ট্র আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর আধা

উপনিবেশে পরিণত করে। এর চেয়ে ভয়াবহ যে ক্ষতটি আমাদের জাতীয় জীবনে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল, তা হচ্ছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ইউটোপীয় (কাল্পনিক) রাষ্ট্রের মতাদর্শে বিভ্রান্ত করা।

পাকিস্তান ২৩ বছরে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে মোহগ্রস্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতিসত্তাবিরোধী বৈরী আচরণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তার আন্দোলন-সংগ্রাম দ্রুত বিকাশ লাভ করতে থাকে। ছয় দফা পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধীনতার মহাসনদ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। এর প্রবক্তা শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার জনগণের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আন্দোলন-সংগ্রামের শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এই আন্দোলনকে এতটাই বেগবান করে যে– পাকিস্তানের আধা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় এই অঞ্চলের জনগণ প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৬৯, ৭০ এবং ৭১-এর জনযুদ্ধ পূর্ববাংলার জনগণের সত্যিকার রাষ্ট্রলাভের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে একটি মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়, যা আমাদের দিয়েছে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোই শুধু নয়, এর রাষ্ট্রচরিত্রও প্রত্যাখ্যান করে, গ্রহণ করে আধুনিক অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্রের আদর্শ এবং কাঠামো। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সেই জাতিরাষ্ট্র গঠনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ্বমানচিত্রে আবির্ভূত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনায় একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মতাদর্শের পথ দেখায়। সেই পথেই ১৯৭২ সাল থেকে নতুনভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। তবে এর গতিপ্রকৃতি অল্প কিছুকাল পর থেকেই মূল স্রোতোধারায় ধাবিত হতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। কেন, কখন, কীভাবে এই গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে, এর ফলে আমাদের অগ্রযাত্রায় কী কী বাধার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, সেসব বাধা কতটা আমরা এরই মধ্যে অতিক্রম করতে পেরেছি, সেটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়টি ছিল আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে কঠিন এক পরীক্ষার সময়। সেই পরীক্ষায় আমরা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশের মাটি থেকে বন্দিবেশে নিজেদের দেশে ফিরে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে লাভ করা রাষ্ট্রের নতুন এক পর্ব থেকে আমরা নতুনভাবে যাত্রা শুরু করি।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে চারটি মৌল জাতীয় নীতিতে পরিচালিত করার মাধ্যমে একটি আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তিনি নতুন এই রাষ্ট্রকে ৯ মাসের মধ্যেই একটি আধুনিক সংবিধান প্রদান করতে সক্ষম হন। সংবিধানটি সেই সময়ের আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রগামী ছিল তাদের সংবিধানগুলোর চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসর, আইন, অধিকার এবং রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা গ্রহণ করেছিল। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করেছিল। তবে দেশটি যেহেতু একটি বড়ো ধরনের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তাই এর যাত্রার সূচনায় অসংখ্য সমস্যা জড়িয়ে ছিল। রাষ্ট্রের কোষাগারে কোনো অর্থ ছিল না, ছিল না কোনো বৈদেশিক মুদ্রাও। রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত, শিল্প-কলকারখানা ছিল একেবারেই অপ্রতুল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত। অনেক প্রতিষ্ঠানই ছিল মালিকানাবিহীন। কারণ এগুলোর মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের, যারা স্বাধীনতার আগেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। পাকিস্তানকালে যেহেতু পূর্বাঞ্চলে কোনো স্বয়ম্ভর প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তাই যাত্রার শুরুতে বাংলাদেশকে মাথায় তুলে নিতে হয়েছিল ভঙ্গুর, অদক্ষ, অগঠিত এবং পশ্চাৎপদ একটি প্রশাসনব্যবস্থা। এটিকে দাঁড় করানোর মতো দক্ষ জনবল ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রশাসনব্যবস্থা ছিল একেবারেই ভঙ্গুর। এটিকে গড়ে তোলার মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশাসক না থাকায় পড়তে হয়েছিল বড়ো ধরনের ব্যবস্থাপনা সংকটে। একটি আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার মতো কোনো বাহিনী, প্রতিষ্ঠান, জনবল ছিল না বললেই চলে। তাই যাদের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নির্মাণের ভিত্তি, তাদের বেশির ভাগই অভিজ্ঞতায় ছিলেন পিছিয়ে পড়া। সেকারণে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী রাষ্ট্র গঠনের কর্মযজ্ঞ দেশি এবং আন্তর্জাতিক বৈরী নানা সমস্যার মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না।

অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর সরকার নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের জন্য যেসব বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেগুলোর জন্য একদিকে যেমন অর্থ ও সম্পদের ব্যাপক ঘাটতি ছিল, একই সঙ্গে দক্ষ জনবলেরও সীমাহীন অভাব ছিল। তারপরও বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে সচল করার যাবতীয় উদ্যোগ নেয়। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক জাতিরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন বঙ্গবন্ধু গঠন করেন। শিক্ষা কমিশন নতুন এই রাষ্ট্রের শিক্ষার দর্শন ও প্রতিষ্ঠান কেমন হওয়া দরকার, এর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রণয়ন করে। ফলে বাংলাদেশকে একটি নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষ জাতিগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার সুযোগ পায়।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রায় ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করেন। ফলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হয়। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন আইন-১৯৭৩ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমিসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। দেশের জাতীয়করণকৃত শিল্প-কলকারখানা, ব্যাংক-বিমা'র পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ছোটো ও মাঝারি শিল্প-কলকারখানা এবং ব্যাবসাবাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে। গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষি, শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্যকে। তারপরও যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ১৯৭৩-৭৪ সালের বন্যা এবং আন্তর্জাতিকভাবে কোনো কোনো শক্তির বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী আচরণ, অসহযোগিতা, দেশের অভ্যন্তরে উগ্র হঠকারী, বাম মতাদর্শের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যাংক লুট, পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ, অস্ত্র লুট, পাটের গুদামে আগুন, জাতীয়করণকৃত কলকারখানাগুলো লোকসানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী শক্তির উত্থান, রাজনৈতিক দলের দুর্বলতা, নেতাকর্মীদের অংশবিশেষের অসহিষ্ণুতা এবং বাস্তববোধের অভাব ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন শক্তি দেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা প্রভৃতি কারণে ১৯৭৪ সালে দেশে

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। ফলে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার মাধ্যমে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে তিনি দেশের রাজনীতি, প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশে স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র ডান, বাম রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়, গঠন করা হয় জাতীয় ঐক্যের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম। এতে সনাতনী রাজনৈতিক দল ও চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে সংবিধানের চার মৌল নীতিতে বিশ্বাসী সব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী শক্তির অভিন্ন একটি দল গঠন ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কৃষির উৎপাদনে বহুমুখী সমবায় ব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নতুন এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মূলত দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করার মাধ্যমে দেশে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পছন্দ ছিল না আন্তর্জাতিক বেশকিছু শক্তির। তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। বঙ্গবন্ধু তাতে সপরিবারে নিহত হন। রাষ্ট্রক্ষমতায় পাকিস্তানি ভাবাদর্শের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের পথচলা ছিল বেশ কণ্টকাকীর্ণ। তবে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া দরকার ছিল, তা বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণে মোটেও দ্বিধা করেনি। তবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছিল বাংলাদেশের এই নতুন রাজনীতির প্রতি চরমভাবে বৈরী, বিদেশি মদতপুষ্ট, উগ্র হঠকারী ও বিপ্লবী ভাবাদর্শে বিভ্রান্তবাদী। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বাস্তবতার বোধ ছোটো ছোটো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খুব একটা ছিল না। প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারঙ্গমতার প্রদর্শন করেনি। দলের অভ্যন্তরে স্বার্থ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল। পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধকালের ত্যাগী মনোভাব স্বাধীনতা- উত্তর সময়ে কিছুটা নিষ্প্রভ হতে দেখা যায়। দলের অভ্যন্তরে নীতি ও আদর্শের প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও একটি অংশ দৃঢ়ভাবে বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭২ সালেই আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গসংগঠন থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণদের একটি বড়ো অংশ বের হয়ে বিপ্লবের নামে উগ্র ও হঠকারী পন্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরা সমাজের তরুণদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা দৃশ্যত কার্যকর দেখা গেলেও বাস্তবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে খুব একটা স্থান পায়নি। এরপরও নানা সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা নিয়ে বাংলাদেশের সাড়ে তিন বছরের রাজনীতি ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সূচিত শোষণহীন সমাজ গড়ার রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে যে অগ্রযাত্রা অর্জন করত তার মাধ্যমেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও শক্তি দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বদলে দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। তার পেছনে ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী। তারা বঙ্গবন্ধুর সূচিত শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটায়। পুনঃপ্রবর্তন করা হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দুর্বল ও নষ্ট করে দেওয়ার হীন পরিকল্পনা নিয়েই তারা অগ্রসর হয়। এর পেছনে ছিল সামরিক বাহিনীর একটি অংশ, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে থাকা কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছাড়াও প্রশাসন, ব্যাবসাবাণিজ্য এবং বিদেশি নানা গোষ্ঠী। ক্ষমতার এই পরিবর্তনকে সংহত করার জন্য সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে নানা উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিভ্রান্তবাদী ব্যক্তিকে তারা ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো শক্তি যাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে, সেজন্য বারবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটানো হয়েছে। তবে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক শক্তিকে একদিকে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যদিকে উগ্র ডান, বাম, সুবিধাবাদী এবং ধর্মান্ধ পাকিস্তানি ভাবাদর্শের শক্তিগুলোকে রাজনীতির মাঠে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ১৫ আগস্টের পর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির উত্থানের সুযোগ করে দেয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সামাল দিতে তিনি ক্রমেই ব্যর্থ হতে থাকেন।

> মুক্তিযুদ্ধ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চেতনায় একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মতাদর্শের পথ দেখায়। সেই পথেই ১৯৭২ সাল থেকে নতুনভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়

সেনাবাহিনী ও সরকারের অভ্যন্তরে নানা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে তিনিসহ পঁচাত্তরের ঘাতকরা পরিস্থিতি নিজেদের জন্য নিরাপদ নয় ভেবে জেলখানার অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতাকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান ক্ষমতা

দখল করেন। তিনি সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার চেষ্টা করতে গিয়ে এর ভেতরে আরও বেশি গ্রুপিং, বিভাজন ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতায় কঠোর সামরিক শাসন জারি করে রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিদের জন্য রাজনীতিকে বেশ কঠিন করে দেওয়া হয়। যেসব উগ্র বাম রাজনৈতিক দল একসময় তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তাদেরও তিনি জেলে নির্বাসিত করেন। রাজনীতিতে বড়ো ধরনের ভাঙাগড়ার মধ্যে ১৯৭৮ সালে তিনি গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। তিনি রাজনীতির মাঠে ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন, স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র ডান, বাম, সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তার দলকে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের সুযোগ করে দেন। এরপর তিনি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আনয়ন করেন এবং বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান করে নেওয়ার বৈধতা পায়। জাতীয়তাবাদকে ধর্মাশ্রয়ী ভাবাদর্শে বিভক্ত করা হয়। রাজনীতির এই গতিপ্রকৃতি ক্রমেই রাষ্ট্রক্ষমতায় পুষ্ট হতে থাকে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নিহত হন। কিন্তু রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির তাতে পরিবর্তিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তার বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হন। মূলত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচার-প্রচারণা তখন তুঙ্গে অবস্থান করতে থাকে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারার রাজনীতির পুনরুত্থান সম্ভব ছিল না। ছয় বছর রাষ্ট্রশক্তি মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক শক্তিকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। এই অবস্থায় বিচারপতি সাত্তারের সরকারও দেশ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন করতে পারেনি। ফলে জেনারেল এইচএম এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন। দেশে আবার সামরিক শাসন জারি হয়। তবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন এবং জেনারেল এইচএম এরশাদের সামরিক শাসনের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না। এ কারণে এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপির বড়ো একটি অংশ তার সঙ্গে যোগদান করে। সামরিক শাসক এরশাদ বিএনপির অনুকরণে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। উভয়ের মতাদর্শগত অবস্থান প্রায় অভিন্নই ছিল। তবে সামরিক শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ১৯৮৩ সাল থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। এর দুই বছর আগে ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি দলের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতিতে পা ফেলেন। তার ধারণা ছিল–এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ১৫ দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে সক্ষম হবে। সেকারণে ১৫ দলকে নিয়ে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। তবে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত সাতদলীয় ঐক্যজোট এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৫ দল যুগপৎ আন্দোলনের ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং আওয়ামীবিরোধী সাতদলীয় জোটের সঙ্গে ১৫ দলীয় জোটের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণতি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য খুব একটা বিবেচনায় নেয়নি। এরশাদ সরকারকেই তারা সামরিক স্বৈরাচার হিসাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য বড়ো বাধা মনে করেছিলেন। কিন্তু সাতদলীয় ঐক্যজোটের রাজনীতি সামরিক শাসক এরশাদের রাজনীতির শুধু ধারাবাহিকতাই নয়, অধিকতর মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িকতাবিরোধী চরিত্রের এই ধারণাটি তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধিতা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ১৯৪৭-এর ধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার গোড়াপত্তন করেছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। সেই দলে ও জোটের সঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং ১৫ দলীয় জোটের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ছিল অবিমৃশ্যকারিতা। এরশাদ সরকার তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ও জোটের আন্দোলনের মুখে নিজেকে আরও বেশি ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি এবং জাতীয় পার্টিকে জনগণের কাছে উপস্থাপনের জন্য ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে এরশাদ নিজের রাজনীতির সুবিধা নেওয়ার জন্য সংবিধানকে আরও সাম্প্রদায়িক চরিত্রদান করেন। বাংলাদেশের রাজনীতি আরও বেশি সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সংবিধান থেকে ওই ধারা রোহিত কিংবা সংশোধন করা জটিল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং রাজনীতি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। তিন জোট এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এখানেই এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মৌলিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া গোটা আশির দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ১৫ দলের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে জামায়াত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৫ দল এর পরিণতি সম্পর্কে খুব একটা সচেতন ছিল না। ১৯৯০ সালে তিন জোটের রূপরেখা নামক একটি দলিলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি ছিল সত্য; কিন্তু এরশাদ সরকারের পতনের পরপরই নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার জিগির, ভারতবিরোধিতা, আওয়ামীবিরোধিতা গোটা নির্বাচনি পরিবেশকেই গণতন্ত্রে উত্তরণের বাস্তবতা থেকে ছুড়ে ফেলে দেয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমাজ মানসে গভীরভাবে স্থান করে নেওয়ার ফলে নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন-উত্তর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক উত্থান ১৯৯১-এর নির্বাচনে প্রকাশ ঘটায়। বিএনপি ও জামায়াত বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনে সরকার গঠনের বৈধতা লাভ করে। আওয়ামী লীগ ১৫ দল তথা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের অসাম্প্রদায়িক শক্তি দ্বিতীয় সারিতে নেমে যেতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্র-রাজনীতিতে মেরুকরণকৃত অসাম্প্রদায়িক বনাম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক জোটের দৃশ্যমান উত্থান ১৯৯১-এর পরবর্তীকাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সুফল লাভ করতে সক্ষম হয়। বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিরোধিতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ১৫ আগস্টের ঘাতকদের সঙ্গে নেওয়া এবং জামায়াতকে সঙ্গে রাখতে না পারার কারণে ১২ জুনের নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি। শেখ হাসিনা সরকার গঠন করার পর রাষ্ট্রক্ষমতায় মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারা পুনঃপ্রবর্তন করেন, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করেন, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘাতকদের বিচারের সম্মুখীন করেন। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিচুক্তি সম্পাদন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে দেশে আওয়ামীবিরোধী প্রচারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ, তরুণ সমাজ এবং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের একটি অংশ আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় বিএনপি, জামায়াতসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক-বাহক

গোষ্ঠী ১৯৯৯ সালে চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন করে। আওয়ামী লীগ এর সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে শুধু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই নয়, বাম পাঁচদলীয় জোট, নাগরিক সমাজের একটি অংশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি গোষ্ঠীও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পরবর্তী নির্বাচনে বিরোধিতার অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে গোপনে জঙ্গিগোষ্ঠী শেখ হাসিনাকে হত্যা, আওয়ামী লীগকে নির্মূল করা এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে গোপন তৎপরতা, বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের জঙ্গিবাদী অবস্থান সংহত করতে থাকে। এটি মূলতই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির শক্তিকে পরবর্তী নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পূর্ব লক্ষণ হিসাবে ঘটানো হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন জঙ্গিদের এই তৎপরতা উপলব্ধি করতে পারেনি।

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোট পাওয়া সত্ত্বেও আসন ব্যাপকভাবে কম পাওয়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। এর নেপথ্যে নানা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রিয়া ও ভূমিকা ছিল। নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদী ধারায় পরিচালিত হয়। বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃত্বে গঠিত সরকার আওয়ামী লীগ এবং অসাম্প্রদায়িক শক্তি নির্মূলে দেশব্যাপী জঙ্গিদের ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতাকর্মী এবং সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, হত্যা, দেশত্যাগে বাধ্য করার নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে থাকে। ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ড, ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা, ২০০৬-এর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপ্রতি ইয়াজউদ্দীনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়া, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অকার্যকর করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে কোনোভাবেই চারদলীয় জোট দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। এর বিরুদ্ধে মহাজোট গঠিত হলেও অসাম্প্রদায়িক শক্তির সমাবেশের অভাব তাতে ছিল। তবে এক-এগারোর ক্ষমতা গ্রহণ বিএনপি ও জামায়াতের ক্ষমতায় দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠিত হওয়ার সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। দুই বছর দেশে সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় ছিল। এর দায় বিএনপি-জামায়াতের ওপর পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জোট সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পরবর্তী নির্বাচনে পড়ে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, ১৪ দলীয় জোট এবং জাতীয় পার্টি বিপুল বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই বিজয়ের পেছনে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবি তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এছাড়া শেখ হাসিনার দিনবদলের সনদ এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোর প্রতিশ্রুতি ছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার সম্পন্ন করা, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি অপসারণ করা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করে। শেখ হাসিনার এই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য বিএনপি, জামায়াত ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। জঙ্গিরাও ছিল ব্যাপকভাবে তৎপর। তারপরও ট্রাইব্যুনালের রায়ে যুদ্ধপরাধীরা যখন দণ্ডিত হতে থাকে, তখন এই রায় কার্যকরের দাবিতে তরুণদের ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। দেশের সাধারণ মানুষও এটিকে সমর্থন করে। বিএনপি, জামায়াত জোট এই গণজাগরণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নাস্তিক্যবাদের ভুয়া তত্ত্ব প্রচার করতে থাকে। একই সঙ্গে হেফাজতকে মাঠে নামিয়ে কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণে সরকার উৎখাতের একটি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়। ধর্মীয় ভাবাবেগকে জামায়াত, বিএনপি ও হেফাজত উসকে দিয়ে দেশে অসাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে নতুনভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ সৃষ্টি করে।

সরকার এই অবস্থায় হেফাজতের একটি অংশের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল জামায়াত ও বিএনপির রাজনৈতিক বলয় থেকে হেফাজতকে কাছে টানা এবং তাদের কিছু দাবিদাওয়া ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। ফলে রাজনৈতিকভাবে বিএনপি ও জামায়াত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র খুব একটা সফল করতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগের উদার দৃষ্টিভঙ্গি হেফাজতসহ ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে ততটা আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি, যতটা তাদের স্বার্থ ও সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল হিসাব বিবেচিত হয়েছিল। কেননা আদর্শগতভাবে এরা ২০ দলীয় ঐক্যজোটের রাজনৈতিক সঙ্গী ছিল। সেটির প্রকাশ ঘটেছে ২০২০-২১ সালে যখন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়, তখন ধর্মান্ধ গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণে বিরোধিতা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ আগমনে বিরোধিতা প্রভৃতি অজুহাতে চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাঙচুর, তাণ্ডব সংঘটিত করে। এর পেছনে বিএনপি, জামায়াতসহ ২০ দলীয় ঐক্যজোটের সমর্থনের অংশগ্রহণ অনেকটাই স্পষ্ট ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই তেমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। ২০ দলীয় জোটের কোনো দলই স্বাধীনতার ৫০ বছর পালনে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি বাম রাজনৈতিক দলগুলোকেও আলাদা কিংবা যৌথভাবে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে কোনো ধরনের সভা, সেমিনার, গবেষণা করতে দেখা যায়নি। সরকারিভাবে ৫০ বছরপূর্তি বছরব্যাপী নানা আয়োজনে হচ্ছে। আওয়ামী লীগও দলীয়ভাবে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করছে। তবে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শগত অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনীতি কোন পথে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, সেসম্পর্কে সচেতনতা তৈরির তেমন কোনো জনসম্পৃক্ত অনুষ্ঠানাদি হচ্ছে না। স্কুলগুলোয় গতানুগতিক কিছু অনুষ্ঠান হলেও সেগুলোর মান ও আয়োজন তেমন কার্যকর নয়। দেশে বেশির ভাগ গণমাধ্যম থেকেই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারণা কমবেশি প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভারত, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি বিষয়ে নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সব সময় দেওয়া হচ্ছে। এর পেছনে একটি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন থেকে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। কিন্তু এর বিপরীতে ওই মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরের সঠিক ধারণার ইতিহাস খুব বেশি প্রচারিত হচ্ছে না।

তরুণ সমাজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধীনতা-উত্তর ৫০ বছরের রাজনীতির ইতিহাস, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। স্বাধীনতার এই ৫০ বছর উদ্‌যাপনকালে প্রয়োজন ছিল ৫০ বছরের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা, এর নানা বাঁক পরিবর্তনের কারণগুলো তুলে ধরা। তাহলে দেশে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ৫০ বছরে রাজনীতির জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণালাভ করতে পারত।

লেখক: অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষক

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিশ্বে অনুকরণীয়

ড. আর এম দেবনাথ

আর কয়েকদিন বাদেই মহান বিজয় দিবস– ১৬ ডিসেম্বর। এটি আমাদের ৫১তম বিজয় দিবস। আবার এ মাসেই শেষ হওয়ার কথা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানগুলো। একজন ব্যক্তির জীবনে ৫০-৫১ বছর হবে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সময়। কিন্তু জাতির জীবনে ৫০-৫১ বছর কিছুই না। ভাবতে অবাক লাগে, দেখতে দেখতে স্বাধীনতার ৫০-৫১ বছর কেটে গেল। যাদের বয়স ষাটোর্ধ্ব, তাদের মনে অনেক স্মৃতি। আবার সবারই জন্য বিজয় দিবস উল্লাসের-আনন্দের, তেমনই বেদনার ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করি। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের অত্যাচার, নিপীড়ন, জুলুম ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত। পাই আমরা স্বদেশ, একটি সবুজ পতাকা। আজ ৫০-৫১ বছর সমাজের অবস্থা কী? যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করি, তা কি অর্জিত হয়েছে? ক্ষুধা-দারিদ্র্য কি ঘুচেছে? শিক্ষার অবস্থা কী? স্বাস্থ্য ও আবাসনের অবস্থা কী? আমরা কি বিশ্বদরবারে অর্থনীতিকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করতে পেরেছি? অনেক প্রশ্ন মনে। এসবের উত্তর দরকার।

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-৭১) শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা বলত, স্বাধীন হলে তোমরা খাবে কী? তোমাদের আছে কী? কাঁচা পাট, চা, আর চামড়া। এই দিয়ে কি অত বড়ো দেশের মানুষকে খাওয়াতে-পরাতে পারবে? এত ধান-চাল কোথায় পাবে? বৈদেশিক মুদ্রা কোথায়? আমদানির জন্য টাকা কোথায়? রপ্তানির পণ্য কোথায়? শিল্প নেই, ব্যাবসাবাণিজ্য নেই– দেশ চলবে কীভাবে? সার্বক্ষণিক একটা ভয়ভীতি তারা আমাদের মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করত। আজ অবস্থা কী? ৫০-৫১ বছর পর কী মনে হয়? পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে? বাস্তব অবস্থা, তথ্য ও পরিসংখ্যান

বলে দেবে আজ বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে কোথায় স্থান করে নিয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যাক। স্বাধীনতার পর আমরা দলবেঁধে কলকাতা যেতাম। শুধু বেড়ানো নয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্যও। আমরা সেখান থেকে জামাকাপড়, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, প্রসাধনসামগ্রী আনতাম। হাতে থাকত একটা প্লাস্টিকের বালতি। এসব ক্রয়ে কেমন খরচ হতো? খরচ যাই হতো, মাথা গরম হয়ে যেত টাকার বিনিময় হার শুনলে। আমরা বাংলাদেশি ১০০ টাকা দিলে ভারতীয় রুপি পেতাম মাত্র ৩৫-৪০। টাকার কোনো শক্তিই ছিল না। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। তখন ২৫-৫০ ডলারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাগত। রীতিমতো তদবির করতে হতো ২৫টি ডলারের জন্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে কিছুই ছিল না। কোথায় তারা পাবে ডলার, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই কোনো ডলার নেই। একদিকে ডলার পাওয়া যায় না, অন্যদিকে আমাদের টাকার বিনিময়ে বিদেশি মুদ্রা পাওয়া যায় সামান্যই। বিদেশি মুদ্রা মানে ভারতীয় রুপি। জামাকাপড়ের খুব অভাব। তখন দেশে গড়ে উঠেছে পুরোনো কাপড়ের বাজার। পুরোনো প্যান্ট-শার্ট, কম্বল, কোট, ব্লেজার–এসবই আমরা ব্যবহার করতাম। ব্যাপক চাহিদা ছিল এসবের। বঙ্গবন্ধু ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য তৈরি করেছিলেন কনজিউমার সাপ্লাই করপোরেশন (কসকর)। প্রতিষ্ঠানটি নতুন কাপড় আনত বিদেশ থেকে আমদানি করে। আর তা বিতরিত/বিক্রি হতো রেশনে। লাইন ধরে 'কসকরের' কাপড় কিনতে হতো। কত তদবির করতে হয়েছে এক পিস প্যান্টের কাপড়, শার্টের কাপড়ের জন্য। মায়েদের-বোনদের শাড়ি-কাপড়েরও একই অবস্থা। আজ ২০২১ সালে কী অবস্থা? টাকার বিনিময় হার কেমন? ডলার কেমন পাওয়া যায়? ভোগ্যপণ্য, জামাকাপড়ের অবস্থা কী?

টাকার বিনিময় হার বস্তুত অর্থনীতির শক্তির পরিচায়ক। টাকা শক্তিশালী হওয়া মানে অর্থনীতির বুনিয়াদ শক্তিশালী। এই নিরিখে দেখলে আমাদের অগ্রগতি অসামান্য ভারতীয় রুপির সঙ্গে আমাদের বিনিময় হার এখন কত? ১০০ টাকা দিলে 'লুঙ্গির' বাজারে করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে পাওয়া যেত ৮০-৮৫ টাকা। ভাবা যায়! ৩৫-৪০ রুপি থেকে ৮০-৮৫ রুপি। ডলারের অবস্থায়ও তাই। বহুদিন ধরে বাংলাদেশি ৮৫-৮৬ টাকায় এক ডলার পাওয়া যায়। আর পাকিস্তানে? ১৪০ পাকিস্তানি রুপি দিয়ে তাদের এক ডলার কিনতে হয়। পাকিস্তানিদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ যৎসামান্য। তারা এখন এক ঋণ শোধ করার জন্য আরেকটি ঋণ গ্রহণ করছে। আর আমাদের অবস্থা কী? আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার। এত ডলার লাগে না। তিন মাসের আমদানির সমপরিমাণ ডলার রিজার্ভ হিসাবে থাকলেই হয়। আর আমাদের আছে ৮-৯ মাসের আমদানির সমপরিমাণ ডলার। বিদেশে যাওয়ার সময় এখন কত ডলার পাওয়া যায়? এখন ডলারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে যেতে হয় না। বাণিজ্যিক ব্যাংকই ডলার দিতে পারে। চিকিৎসার জন্য, লেখাপড়ার জন্য যত ডলার দরকার, ততই পাওয়া যায়। বেড়ানোর জন্য পাঁচ-দশ হাজার ডলার বাৎসরিক ভিত্তিতে পাওয়া যায়। ডলারের কোনো অভাব নেই। আমরা ছোটোবেলায় গ্রামে একশ টাকার নোট তো দূরের কথা, দশ টাকার একটা নোটও দেখিনি। ১০ টাকার নোট গ্রামের বড়ো হাটে গেলে দেখা যেত। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে টাকা এত সস্তা ছিল না। ১০ টাকা, ৫ টাকা অনেক টাকা। আজকের অবস্থা কী? আজকের দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ডলার নোট দিয়ে শিশুরা খেলাধুলা করে। কোত্থেকে পায় তারা ওইসব নোট। আত্মীয়স্বজন, বাপ-কাকা যারা বিদেশে থাকে তারা যখন বেড়াতে বাড়িতে আসে, তখন শিশুদের হাতে ডলার নোট উপহার হিসাবে দিয়ে যায়। কত বড়ো পরিবর্তন, তা আজ ভাবা যায় না। কারণ এখন এটা নিত্যদিনের ঘটনা। টাকার মান বা শক্তি, বৈদেশিক মুদ্রা বা রিজার্ভে স্ফীতি কোত্থেকে এলো? বলা বাহুল্য, গত পঞ্চাশ বছরে, বিশেষ করে বিগত ১০-১৫ বছরে দেশের যে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে, এর ফলস্বরূপই টাকার শক্তি বেড়েছে। প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আমাদের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রবৃদ্ধি এক উচ্চতার পর আরেক উচ্চতা অর্জনের ফলে দেশের সামাজিক ও আর্থিক বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আর্থিক পরিবর্তনের একটা চিত্র তুলে ধরা যাক। স্বাধীনতা-পূর্বকালে দেশি-বিদেশি ব্যাংকসহ দেশে মোট ব্যাংক ছিল মাত্র ১৬টি। মোট শাখা সংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজার ২০০টির মতো। মোট আমানত (ডিপোজিট) মাত্র ৫০০ কোটি টাকার মতো। লোকবল ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার। আর আজ? ব্যাংকের শাখা ১১ হাজারের ওপরে। ব্যাংকের সংখ্যা ৬০টির ওপরে। শতাধিক বিমা কোম্পানি আছে। গোটাবিশেক আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান। আর আমানত? ১৩-১৪ লাখ কোটি টাকার মতো হচ্ছে আমানত (ডিপোজিট)। লক্ষাধিক লোক কাজ করে শুধু ব্যাংকগুলোতেই। আর্থিক খাতে অন্যূন দুই লাখ লোক কাজ করছে। এখন গ্রামে গ্রামে ব্যাংকের শাখা আছে। এজেন্ট ব্যাংকিং দ্বারা গ্রামগুলো সংযোজিত হচ্ছে ব্যাংকিং সেবায়। টাকা পাঠানো এখন মুহূর্তের বিষয়। বিকাশ, নগদের মতো সেবা মানি ট্রান্সফারকে সহজতর করে তুলেছে। এতে ব্যাবসাবাণিজ্য ত্বরান্বিত হয়েছে। ব্যাংকিং সেবার এই সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের শিল্পায়নে ও ব্যবসায় অবদান রেখে চলেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১২৯ ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে নতুন হিসাবে আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৫৪ ডলার। কতগুণ বৃদ্ধি? জিডিপির আকার ছিল নগণ্য। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৪০৯ বিলিয়ন ডলার (এক বিলিয়ন সমান শতকোটি)

১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে আমাদের মোট বাজেটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায়। এদিকে উন্নয়ন বাজেটের অবস্থা কী ছিল স্বাধীনতা-উত্তরকালে? তখন উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০১ কোটি টাকা। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে কত? এই বছরে উন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ ছিল মাত্র যথাক্রমে ৩৩ কোটি ও ২৮ কোটি ডলার। এখন এসবের পরিমাণ কয়েক গুণ। তখন রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল নগণ্য। এখন প্রতিবছর 'রেমিট্যান্স' আসে বিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার। এই যে বাজেটের পরিসংখ্যান দিলাম, এর ফলাফল আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে কেমন?

প্রথমেই আসা যাক খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রে। ছোটোবেলায় পাকিস্তানি আমলে আমরা গ্রামে দেখেছি গরিব লোকের ভিড়। গরিব মানুষ ভাত নয়, ভাতের ফেনের জন্য বাড়ি বাড়ি ধরনা দিত। শুধু দুটো ভাত দিলেই মানুষ কাজ করত, কোনো মজুরির দরকার ছিল না। গায়ে কোনো কাপড় নেই, পায়ে জুতা বা সেন্ডেল নেই। উশকোখুশকো চোহারা। দারিদ্র্যের, চরম দারিদ্র্যের ছাপ চোখেমুখে। আবার কিছুদিন পরপরই শুনতাম 'মঙ্গা'-এর কথা। উত্তরবঙ্গের 'মঙ্গা', যাতে হাজার হাজার মানুষ ভাতের অভাবে মারা যেত। ৫০-৫১ বছরের কর্মযজ্ঞের ফল হিসাবে আমরা আজ ভাতের অভাব থেকে মুক্ত। এখন না খেয়ে কোনো দেশবাসী থাকে না। পেটে তাদের ভাত আছে, পরনে জামা আছে, পায়ে জুতা আছে। শীতে সে কষ্ট পায় না। নানা সূত্রে মানুষ একখানা

কম্বল পায়। 'মঙ্গা'? 'মঙ্গা' শব্দটি আজ নির্বাসিত। উত্তরবঙ্গে কোথাও আজ 'মঙ্গা' নেই। চালে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে। আগে মানুষ আটার রুটি খেতে চাইত না। এখন আটার রুটি গরিব, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত–সবাই খায়। এজন্য বেশকিছু গম আমাদেরকে প্রতিবছর আমদানি করতে হয়। পাকিস্তান আমলে চা আমরা রপ্তানি করতাম। এখন চা আমদানি করতে হয়। কারণ? মানুষ এখন চা খায়। সবাই খায়। গ্রামের মানুষও চা খায়; রুটি খায়। ফলমূল, শাকসবজি, মাছ-মাংস, দুধ প্রভৃতি আগে ছিল দুর্মূল্য। এখন সব শ্রেণির মানুষ শাকসবজি, মাছ-মাংস, দুধ, ফলমূল কিছু না কিছু খায়। দারিদ্র্য এখনো আছে; কিন্তু এর পরিমাণ অনেক কমেছে।

পাকিস্তান আমলে দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০-৮০ শতাংশ। তা আজ মাত্র ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দারিদ্র্য একটা বড়ো সমস্যা। এর সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ১০ শতাংশে। বাড়িতে বাড়িতে এখন কেউ দুমুঠো ভাতের জন্য হানা দেয় না। আগে ফলমূল ছিল রোগীদের খাদ্য। সাধারণভাবে ফলমূল গৃহীত হতো না। গ্রামে দেশীয় ফল পাওয়া যেত। এখন গ্রামে গ্রামে আপেল, আঙুর, বেদানা, নাশপাতি পাওয়া যায়। এখন ফলমূল আর রোগীদের পথ্য নয়। সবাই তা খায়। গ্রামে গ্রামে এখন বিদ্যুৎ। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। রয়েছে সোলার শক্তি। কেরোসিনের ব্যবহার সর্বনিম্ন। বিদ্যুৎ বস্তুত পুরো গ্রামের চিত্র বদলে দিয়েছে। ছোটোবেলায় দেখেছি, গ্রামের বাজার বসত বিকালবেলায়। চলত রাত ১১-১২টা পর্যন্ত। এখন আর এই অবস্থা নেই। বাজার চলে দিনরাত। দোকানপাট আলোয় ঝলমল করে। বেচাকেনা যথেষ্ট। গ্রামের বাজারে পর্যন্ত স্বর্ণের দোকান আছে। তাও আবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ধর্মপ্রাণ মহিলারাও রাতে গ্রামের বাজার করেন। পরিবহণ ও যাতায়াতের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ায় তারা বাজার করে টেম্পোতে বাড়ি পৌঁছে যান। গ্রামে গ্রামে এখন পাকা রাস্তা। গ্রামের ছেলেরা রাতে নাশতা করে না। তারা চলে যায় উপজেলা শহরে নাশতার জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে অনেক। আগে ঢাকার আশপাশ অঞ্চল থেকে ঢাকায় আসতে রেল এবং নৌপথ ছাড়া কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখন বাস সার্ভিস এত উন্নত হয়েছে যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া যায় ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যে। বস্তুত ঢাকা থেকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় বাসে এখন ৫-৭ ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। কাঁচা রাস্তা দেশে খুব কম। বলা যায়, পাকা রাস্তার আর দরকার নেই। দরকার রক্ষণাবেক্ষণ। বঙ্গবন্ধু ব্রিজসহ বড়ো বড়ো ব্রিজ হওয়ার ফলে এখন যাতায়াত হয়েছে নির্বিঘ্ন। ঢাকা শহরে হচ্ছে মেট্রোরেল।

যাতায়াতের এই অভূতপূর্ব উন্নতি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকব্যবস্থার উন্নতি–বিকাশ, নগদ প্রভৃতি সেবা, যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যাবসাবাণিজ্যের জগতে এসেছে বিশাল পরিবর্তন। ঢাকা থেকে আগে গ্রামে গ্রামে মালামাল যেত নৌপথে। এখন নৌপথ আর অবশিষ্ট নেই। নদীগুলো অচল হয়েছে। নৌপথের জায়গা নিয়েছে সড়কপথ। এখন ট্রাকই হচ্ছে মালামাল পরিবহণের মাধ্যম। আগে বাজার ছিল নদীর তীরঘেঁষে। এখন আন্তঃজেলার বাজারের সঙ্গে নদীভিত্তিক বাজার-শহর বিলীন হচ্ছে। ব্যবসায় 'ট্রেড ক্রেডিট' কমছে। মালামাল এখন পাইকাররা গ্রামের বাজারে বাজারে পৌঁছে দিচ্ছে। খুচরা বিক্রেতাদের আর পাইকারি বাজারে আসার প্রয়োজন সেভাবে নেই। পেমেন্ট হচ্ছে বিকাশে। চুরি-ডাকাতির ভয় নেই বললেই চলে। গ্রামের বাজারে এখন পাওয়া যায় না এমন কোনো জিনিস নেই। ঢাকার বাজারে যা পাওয়া যায়, বস্তুত গ্রামের বাজারেও এখন তা পাওয়া যায়। স্কুল আছে, কলেজ আছে, মহিলা কলেজ আছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রভৃতি আছে। জেলা শহরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোয় ঢাকার বড়ো বড়ো ডাক্তার নিয়মিত যান। ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকদের চিকিৎসাসেবা পাওয়া সহজতর হয়েছে। গ্রামের বাজারের সঙ্গে শহরের বাজারগুলোর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আগে ছিল ছনের ঘর, টিনের ঘর। এখন যারা পারছে তারাই ঘরবাড়ি পাকা করছে। ফলে ইট, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, গ্লাস প্রভৃতি ব্যাবসা গ্রামে জমে উঠেছে। এসবের মিস্ত্রিরও কদর বেড়েছে। পেশা বদল হচ্ছে। তাঁতি, জেলে, কামার, কুমার, চাকরিচ্যুত, ব্যাবসাচ্যুত, কর্মচ্যুত যারা, তারা নতুন নতুন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। শ্রমিকদের আন্তঃজেলা গমনাগমন বেড়েছে। ফলে তাদের বেকার থাকার আশঙ্কা হ্রাস পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলের মানুষ এখন ঢাকায় চলে আসছে। রিকশা চালিয়ে রোজগার করছে। কিছু 'ক্যাশ' নিয়ে সে গ্রামে যাচ্ছে, আবার ঢাকায় ফেরত আসছে। এতে গ্রামে, উত্তরাঞ্চলের গ্রামে ক্যাশ যাচ্ছে। রেমিট্যান্সের টাকাও গ্রামের ব্যাবসাবাণিজ্য নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। রেমিট্যান্স গ্রাহকরা জমিতে টাকা বিনিয়োগ করছে, বাড়িঘর পাকা করছে, কৃষি যন্ত্রপাতি কিনছে। এতে তাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তাদের স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং উন্নত হচ্ছে। শহরের মতো গ্রামাঞ্চলেও একটা নতুন মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছে। এককথায়–১৯৭০-৭১ সালের গ্রাম আর নেই। নদীনালা নেই, নেই পালতোলা নৌকা, মাঠে গোরু নেই, রাখালও নেই। নৌঘাটে মাঝিও নেই। মাঝির সেই গানও নেই। পুরোনোদের কদর কমেছে, নতুনদের আধিপত্য বাড়ছে। ঢাকার অনেক খাবার জিনিস ঢুকে পড়ছে গ্রামবাংলায়।

> বিশেষ করে বিগত ১০-১৫ বছরে দেশের যে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে, এর ফলস্বরূপই টাকার শক্তি বেড়েছে। প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার আমাদের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে

সার্বিকভাবে তাহলে কী চিত্র দাঁড়ায়? স্বাধীনতার ৫০-৫১ বছর পর আর্থিক অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? স্বাধীনতা-পূর্বকালের তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ সাড়ে তিন গুণ বেড়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৫২ লাখ মেট্রিক টন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার মেগাওয়াটের ওপর। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার করোনা-পূর্ববর্তীকালে ছিল ৭ শতাংশের ওপরে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২,৫০০ ডলারের ওপরে। ২০১৯ সালে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৭২ দশমিক ৬ শতাংশে। সাক্ষরতার হার ২০১৯ সালে ছিল ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রতি হাজারে শিশু (এক বছরের নিচে) মৃত্যুর হার ছিল মাত্র ২১। বলাই বাহুল্য, এ ধরনের অনেক সূচকের নিরিখে আমরা আজ পাকিস্তান ও ভারতের চেয়েও এগিয়ে। আমরা আজ উন্নয়নশীল দেশ। জাতিসংঘ এর চূড়ান্ত স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব সাফল্য, অর্জন ও অগ্রগতির দাবিদার বর্তমান সরকার, যার প্রধান বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশকে এই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

লেখক: সাবেক শিক্ষক, ঢাবি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

সৌরভ, গৌরব আর অহংকারের বাংলাদেশ

আজিজুল ইসলাম ভুঁইয়া

১৯৭২ সাল। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ। বাতাসে তখনও লাশের গন্ধ। থামেনি স্বজনহারা মানুষের কান্নার রোল। যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই দগদগে ঘায়ের মতো ধ্বংসের চিহ্ন। দেশের অর্থনীতিকে শেষ করে গেছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এমনকি বাংলাদেশের জাহাজগুলো পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেসময়ে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিটি ভাষণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের চিত্র পাওয়া যায়। বাহাত্তর সালের ১০ মে পাবনায় আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু আক্ষেপ করে বলেন, 'আমি যেদিন সরকার নিই, এক পয়সার বৈদেশিক মুদ্রা আমার কাছে ছিল না। জাহাজ নেই, পোর্ট ভেঙে দিয়েছে। মানুষকে আমি বলেছি, আমার দুঃখী মানুষকে বাঁচাও।...চট্টগ্রাম পোর্টে জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজ কোথায় পাব! রেললাইন ভেঙে দিয়েছিল, রেললাইন চলে না। রেললাইন মেরামত করতে হবে। রাস্তার পুল ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। ট্রাক ছিল না, ভিক্ষা করে ট্রাক এনে একেক জেলায় দিতে হয়েছে।' বাস্তবিক অর্থেই নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি এক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে–১৯৭২ সালের জুনে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যে বাজেট দিলেন, এর আয়তন ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা। সেই জায়গা থেকে আজ ৫০ বছর পর বঙ্গবন্ধুতনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা ভাবলে মুগ্ধ বিস্ময় লুকিয়ে রাখা যায় না।

বাহাত্তর সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন সোনার বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, জাতির পিতা বহুদিন রাতে ঘুমাতে পারেননি। নির্ঘুম রাতে তিনি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বারান্দায় পাইপ হাতে পায়চারি করতেন। এ কথা তিনি তাঁর জনগণের কাছে বলেছেন অকপটে নিজের বক্তৃতায়। তখন কোষাগারে রিজার্ভ বলতে

ছিল না। তারপরও বঙ্গবন্ধুর বুকভরা স্বপ্ন ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ তথা কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্র-জনতার ওপর তাঁর ভরসা ছিল অপরিসীম। পাশে ছিল ভারত প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ প্রগতিশীল বিশ্ব। বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি–হেনরি কিসিঞ্জারের এই ধরনের নিকৃষ্ট উপহাসের উচিত জবাব দেওয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা এবং দেশের মানুষকে তৈরি করছিলেন ঘুরে দাঁড়ানোর মতো করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের অভিশপ্ত ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে একদল বিশ্বাসঘাতক জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে কালিমা লেপটে দেয় সভ্যতার ললাটে। বাঙালির আর্থসামাজিক মুক্তির সব প্রচেষ্টা যেন ভেসে যায় ১৫ আগস্টের রক্তস্রোতে। আর বাংলাদেশ পথ হারাল জিয়া-মোশতাকের সৃষ্ট কালের কৃষ্ণগহ্বরে। কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষকথা নয়। সেই ব্ল্যাকহোলের পরিব্যাপ্তি ছিল টানা একুশ বছর। একুশ বছর পর তিমির দুয়ারে হানি আঘাত এলো নতুন প্রভাত। বঙ্গবন্ধুতনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পেল জনগণের রায়ে। গঠিত হলো জাতীয় ঐকমত্যের সরকার। এই আলো দীর্ঘস্থায়ী না হলেও অমানিশাকালে সৃষ্ট দগদগে ঘা সারিয়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয় কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। এই জঘন্য ইনডেমনটি অধ্যাদেশবলে বিশ্বাসঘাতক মোশতাক ১৫ আগস্ট পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

এই কালো আইন বাতিলের ঘটনাটি ছিল নতুন আলোর পথে শেখ হাসিনা সরকারের প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর অচিরাৎ শুরু হয় পঁচাত্তরের হিংস্র ঘাতকদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া। ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ৩২ নম্বর বাড়ির রিসিপশনিস্ট কাম বঙ্গবন্ধুর রেসিডেন্ট পিএ আ ফ ম মহিতুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন। তিন মাসাধিককাল তদন্ত করে সিআইডির তৎকালীন সহকারী পুলিশ সুপার আবদুল কাহহার আকন্দ ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দায়ের করেন। খন্দকার মোশতাকসহ চারজন আগেই মারা যাওয়ায় অভিযোগপত্রে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঐতিহাসিক এই মামলায় ২০২ কার্যদিবসে মোট ৬১ জনের সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিচারক ৮ নভেম্বর ১৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। তিনজনকে বেকসুর খালাস দেন। আসামিরা নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপলি করলে হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিভক্ত রায় দেন। নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয় তৃতীয় বেঞ্চ। এরই মধ্যে আবারও নতুন করে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী জামায়াত-শিবির ও বিএনপিচক্রের ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এরা লিপ্ত হয় ঘৃণ্য চক্রান্তে। লতিফুর রহমানের তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে গদি দখল করে বিএনপি-জামায়াত জোট। ফলে বঙ্গবন্ধুর হত্যার আসামিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়টি ঝুলে পড়ে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বঙ্গবন্ধু হত্যার আসামিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভবপর না হলেও শান্তি ও অগ্রসরতার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, তা আমাদের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মাইলস্টোনস্বরূপ। এর আগে টানা একুশ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে চলেছে রক্তের হোলিখেলা। পার্বত্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শান্তিবাহিনী লিপ্ত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাতে। রক্তপাতের এই একুশ বছরে কত যে নিরীহ নারী ও পুরুষের প্রাণহানি ঘটেছে, এর কোনো লেখাজোখা নেই। পঁচাত্তরপরবর্তী একুশ বছর এই সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জিয়াউর রহমান এমন অপকৌশল গ্রহণ করে, যা ছিল গণবিরোধী ও আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার নামান্তর।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি। সেই শান্তিচুক্তির ফলে পরের বছর ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহী জনসংহতি সমিতির দুই সহস্রাধিক সদস্য অস্ত্র সমর্পণ করে। এদের প্রত্যেককেই পুলিশ, আনসারসহ বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়। ওই বছর জুলাইয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ছাড়াও তিনটি জেলা পরিষদ সক্রিয় রয়েছে। মোট কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এখন নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ও জীবনমান উন্নয়নের অবাধ সুযোগ পাচ্ছেন, যা এই চুক্তির আগে ছিল প্রায় অকল্পনীয়। এই ঐতিহাসিক চুক্তির বেশির ভাগ শর্তই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির আগে পাহারের জনজীবনে কী মৃত্যুভয়াল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, সেই সময়ের পত্রিকার পাতা খুললেই এর অজস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এর অগে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চার দশকেরও বেশি সময় বিরাজমান ফারাক্কা বাঁধের কারণে সৃষ্ট গঙ্গার পানি সমস্যার সমাধান করা হয় ঐতিহাসিক পানিবণ্টন চুক্তির মাধ্যমে। বন্ধুপ্রতিম দুটি রাষ্ট্র–বাংলাদেশ ও ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দশকের পর দশক একটি বিব্রতকর ইস্যু হিসাবে বিরাজমান ছিল এই গঙ্গার পানি। বাংলাদেশের প্রধান নদীপ্রবাহের উজানে পাকিস্তান আমলে ইসলামাবাদের সঙ্গে একধরনের সমঝোতার মাধ্যমে ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন চ্যানেলে পানি ডাইভার্ট করে দেওয়ার কারণে বাংলাদেশ নিপতিত হয় ভয়াবহ পানি সংকটে। পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র–এই তিনটি নদী শুকিয়ে ধু-ধু বালুচরে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দেশের উত্তরাঞ্চলে শুরু হয়েছিল মরুকরণ প্রক্রিয়া। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছিল দ্রুত। দেশের উত্তরাঞ্চলে দেখা দিত খাবার পানির তীব্র সংকট। একই সঙ্গে দেখ দিয়েছিল সেচ সংকট। অকেজো হয়ে পড়েছিল গভীর ও অগভীর নলকূপগুলো। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রো-পাকিস্তান খুনি স্বৈরাচারী সরকার নিজেদের ক্ষমতা পোক্ত করার স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চর্চা করেনি। সুদীর্ঘ ২১ বছর গঙ্গার পানিবণ্টন প্রশ্নে আলোচনার নামে চলেছে প্রহসন। এমন হাস্যকর ঘটনাও ঘটেছে যে, ভারত ঘুরে এসে তৎকলীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, গঙ্গার পানিবণ্টনের কথা আমার মনে ছিল না। পানি প্রশ্নে স্বৈরাচারকবলিত বাংলাদেশের এহেন নির্বিকার অবস্থানের কারণে ওই সময়ে দুই দেশের মধ্যে একাধিক বৈদেশিক চুক্তি ও আলোচনা হলেও জীবনমরণ সমস্যা পানির কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়নি। এই পটভূমিতে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে ভারতের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি সামগ্রিক বৈদেশিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ন্যূনতম পানি সরবরাহের গ্যারান্টিসহ ৩০ বছরের পানিবণ্টনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়।

গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলেই ভিশন-২০২১-এর আলোকে ডেল্টাপ্ল্যান-১৮ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়ে উঠেছে। নেদারল্যান্ডসের মতো করে গ্রহণ করা শতবর্ষী ডেল্টাপ্ল্যান বাংলায় 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনাকে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি মনে করা হয়ে থাকে। নদীভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা

নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসাবে ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এই পরিকল্পনার অনুমোদন দেয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল'। পরিকল্পনামন্ত্রীকে ডেল্টা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। এই পকিল্পনার সুফল বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছে।

এরই মধ্যে আমাদের অভিলক্ষ্যবর্ষ তথা ভিশন-২০২১ শেষ হতে চলল। পাশাপাশি আমরা এবার উদ্‌যাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ। বলা নিস্প্রয়োজন যে, বদ্বীপ পরিকল্পনা ভিশন-২১ এরই অংশ। আরও সহজভাবে বলা যায়, ভিশন-২১ অর্জনের পথে বদ্বীপ পরিকল্পনা একটি অপরিহার্য কৌশলপত্র। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী দেশজুড়ে নদীখনন ও ভাঙন প্রতিরোধী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেচ ও খাবার পানির প্রাপ্যতা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। বন্যার প্রকোপ ও নদীভাঙনের সমস্যা কমে এসেছে বহুলাংশে। দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে ইতোমধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশে ২০১০ সাল থেকে সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির যে উন্নতি ঘটেছে, তা কোনো চক্ষুষ্মানের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়।

২০০১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল দরিদ্র। সেটা ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে নেমে এসেছিল ২১ দশমিক ৮ শতাংশে। ২০০৭ সালে যেখানে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৬৮৬ মার্কিন ডলার, সেটা এখন বেড়ে হয়েছে ২,৫৫৪ মার্কিন ডলার। ২০০৯ থেকে ২০২১–বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের এই এক যুগকে পর্যবেক্ষকমহল নির্দ্বিধায় উন্নয়নের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করতে পারেন। বস্তুত, এই ১২ বছরে আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সেক্টরে বাংলাদেশ অর্জন করেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। স্পর্শ করেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা। যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ, কৃষি, শিল্প, জনশক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সেই সঙ্গে লেগেছে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া। বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার মেগাওয়াট, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বণ্টনব্যবস্থায় এখনো কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। হারিকেন-কুপিবাতির দিন ফুরিয়ে গেল বলে। দেশব্যাপী সড়ক যোগাযোগের যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। গ্রাম থেকে উপজেলা সদর, উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে বিভাগীয় সদর ও রাজধানীতে সড়কপথে যাতায়ত এখন সহজ সম্ভব। বিস্তৃত সড়ক ও মহাসড়কের অব্যাহত সম্প্রসারণের সঙ্গে একের পর এক যুক্ত হচ্ছে সর্বাধুনিক উন্নয়নচিন্তা। রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জনাকীর্ণ এলাকায় যানজট নিরসনকল্পে নির্মিত হয়েছে বহুসংখ্যক উড়াল সড়ক। নির্মাণাধীন রয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবপুর পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এলিভেটেড সড়কের পাশাপাশি নির্মিত হচ্ছে বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট। অন্যদিকে সমাপ্তির পথে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মেট্রোরেল প্রকল্প। আশা করা যায়, বছরখানেকের মধ্যেই এই তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হবে। এগুলো হয়ে গেলে ঢাকা-গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের যোগাযোগব্যবস্থায় সূচিত হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অন্যদিকে মহলবিশেষের সব চক্রান্ত ভন্ডুল করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

গত এক যুগে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে অকল্পনীয় অগ্রসরতা। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন নিঃসন্দেহে রোল মডেলের দাবি করতে পারে। শিল্পকারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রসার ঘটে চলেছে রপ্তানিমুখী ছোটো-বড়ো শিল্পের। উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, বিদ্যুদায়ন, শিক্ষা প্রসার–সর্বোপরি ডিজিটালাইজেশনের ফলে মানুষের আয়-রোজগার বেড়ে গেছে বহুগুণ। বেড়েছে লোকের ক্রয়ক্ষমতা। এসব কারণে শহরের প্রায় সব সুযোগ-সুবিধা এখন পৌঁছে গেছে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায়। একই সঙ্গে বেড়েছে লোকের কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহা। বৈদেশিক কর্মসংস্থানও ক্রমবর্ধমান। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে সামগ্রিক অগ্রসরতার অভিঘাত; সে তো অবধারিত। বিশ্বসমাজের বিচারে বাংলাদেশ এখন আর দরিদ্র নয়। মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করেছে ইতোমধ্যে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এক্ষণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর প্রায় অর্ধেক আসছে বিদেশে কর্মরত জনশক্তির পাঠানো রেমিট্যান্স আকারে।

> অর্ধশত বছর ধরে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থানপতন এবং নানা দোলাচলের মধ্য দিয়ে অবশেষে মানবতার জননী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৌঁছেছে নতুন এক উচ্চতায়

এই ডিসেম্বর গেলে আমাদের সামনে আসবে নতুন বছর, নতুন অভিলক্ষ্য। সোনার বাংলার পঞ্চাশ বর্ষে এসে একাত্তরের বীর বাঙালি আজ জেগে উঠেছে সন্তোষ আর নতুন প্রত্যাশার স্পন্দনে। অর্ধশত বছর ধরে বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থানপতন এবং নানা দোলাচলের মধ্য দিয়ে অবশেষে মানবতার জননী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৌঁছেছে নতুন এক উচ্চতায়। বঙ্গবন্ধুর বাংলার মানুষ আজ অনায়াসে বুকভরে টেনে নিতে পারে মুঠো মুঠো স্নিগ্ধ বাতাস। সত্যিই এখন গত হয়েছে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দুর্দিনের দিনলিপি।

লেখক: সম্পাদক, বাংলাদেশের খবর ও
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যা

অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন–'বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।' এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম, সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার। বাংলার মানুষের সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এ বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সব রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে চাই একটি স্বাস্থ্যবান জাতি। এজন্য তিনি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনই গ্রহণ করেছেন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে একটি শক্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা, অবকাঠামো রেখে গেছেন, যার ওপরে গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্বনন্দিত অনেক কার্যক্রম।

সদ্যস্বাধীন বিধ্বস্ত, কপর্দকহীন দেশে বঙ্গবন্ধু যখন দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য অহর্নিশ দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পরিশ্রম করে চলেছেন, তখন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাশিক্ষা ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিতে ভুলেননি। শত ব্যস্ততার মধ্যে বিদেশ থেকে ফিরে এসে চিকিৎসকদের আপত্তি সত্ত্বেও ১৯৭২-এর ৮ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তৎকালীন আইপিজিএমআর (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়)-এ কেন্দ্রীয় রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ ও নতুন মহিলা ওয়ার্ড উদ্‌বোধন করতে এসে তিনি দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাশিক্ষা নিয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর সেই ভাষণে সদ্যস্বাধীন দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে এক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সে ভাষণে

তিনি দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাশিক্ষার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, ভাবনা মন খুলে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ধ্যানজ্ঞান-কর্মে সব সময় ছিল গরিব-দুঃখী মানুষ। তিনি চিকিৎসাসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে গরিব রোগীদের মমতা দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন পিজি হাসপাতালের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'এক টিভি সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার কোয়ালিফিকেশন কী? আমি হাসতে হাসতে বলেছি–আই লাভ মাই পিপল।' What is your disqualification? জবাবে তিনি বলেছিলেন– I love them too much. বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতার শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শহিদ চিকিৎসকদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। শহিদ চিকিৎসকদের তালিকা পিজি হাসপাতালের দেওয়ালে লিপিবদ্ধ রাখার জন্য তৎকালীন পরিচালক ডা. নূরুল ইসলামকে নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু সেদিন যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ব ও সৎ থাকার জন্য পরামর্শ দেন।
২. ওষুধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন।
৩. সবাইকে নিয়মকানুন মেনে সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠু গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রচলনের আহ্বান জানান।
৪. প্রত্যেক থানায় এক বছরের মধ্যে ২৫ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন।
৫. পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
৬. ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের সেবার মনোভাব গ্রহণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে মানসিক পরিবর্তনের আহ্বান জানান।
৭. বিত্তবান লোকদের হাসপাতালে ওয়ার্ড তৈরি করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।
৮. চিকিৎসক-নার্সদের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানে আন্তরিক হওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দেন।
৯. নার্সিং শিক্ষার সুযোগ ও মান বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেন। নার্সদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সবাইকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের অনুরোধ জানান।

চিকিৎসা একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা, সেখানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিকভাবে মানবিক দায়িত্ব হিসাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। দেশের গরিব-মেহনতি মানুষ যেন সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা পায়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানের ১০(ক) ধারায় চিকিৎসাকে মৌলিক অধিকার এবং ১৮(১) ধারায় জনগণের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যকে রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসাবে সন্নিবেশিত করেন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সব স্বাস্থ্যভাবনা বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, যা আজও আমাদের জন্য বড়ো পাথেয় এবং বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য:

১. অনুন্নত অঞ্চলগুলোয় স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টারের দ্বারা সমন্বিত ও ব্যাপক আকারে চিকিৎসাসেবা প্রদান।
২. তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের নেতৃত্বে অনুন্নত অঞ্চলগুলোয় সর্বাধিক জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করা।
৩. নবজাতক ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করার মাধ্যমে নবজাতক, শিশু ও মায়েদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৪. সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণ নিশ্চিত করা এবং জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার কর্তৃক সমর্থিত মহামারি পরিষেবার মাধ্যমে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৫. শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের তাদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং তাদের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ তৈরি করা। শিল্পশ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
৬. বর্তমানে যেসব হাসপাতাল আছে, সেগুলোর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর গুরুত্বের সহিত হাসপাতাল বেড বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। পরিকল্পনার সময়কালের মধ্যে প্রতিটি অনুন্নত থানায় কমপক্ষে একটি ২৫ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করার মাধ্যমে প্রতি ৩,৫০০ জনের জন্য একটি করে হাসপাতাল বেডের লক্ষ্য অর্জন করা।
৭. মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল সুবিধা প্রদান এবং যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ক্যানসার, মানসিক রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত হাসপাতাল বেডের ব্যবস্থা করা।
৮. স্নাতকোত্তর ও স্নাতক অধ্যয়নরত মেডিক্যাল, প্যারা মেডিক্যাল এবং নার্সিংকর্মীদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তী সময়ে তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সঠিক পরিষেবা শর্ত নিশ্চিত করা।
৯. অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে টিকাদান কর্মী নিয়োগ করা।
১০. প্রত্যেক জনগণের জন্য তাদের বাসস্থান ও কর্মস্থলে পরিবেশসম্মত পায়খানা, পানযোগ্য পানির সরবরাহ, বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় নিশ্চিত করা।

বঙ্গবন্ধু সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধুর তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসাসেবার জন্য থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প আজও বিশ্বে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার এক সমাদৃত মডেল। বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রয়েছে:

১. ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র অন্তর্ভুক্তিসহ থানা পর্যায়ে হাসপাতাল সম্প্রসারণ। নতুন নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন।
২. সচিব পদে চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান।
৩. আইপিজিএমআর (পিজি হাসপাতাল)-কে শাহবাগে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল হিসাবে স্থাপন।
৪. বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) প্রতিষ্ঠা।
৫. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠা।
৬. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন।

৭. ১৯৭৩ সালে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান।
৮. চিকিৎসকদের সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান।
৯. নার্সিং সেবা এবং টেকনোলজির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
১০. উন্নয়শীল দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূলনীতি হলো– Prevention is better than cure. এ নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন নিপসম (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ ও সোশ্যাল মেডিসিন)।
১১. যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা।
১২. জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ডা. আরজে গার্সটের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক বিদেশ থেকে এ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসেন।
১৩. ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
১৪. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্থাপন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করার পর সুদীর্ঘ ২১ বছর চলেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত ধারায়, পাকিস্তানি ভাবধারা অনুসরণ করে। যে কারণে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সব উন্নয়ন ব্যাহত হয়, বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করার পর সুদীর্ঘ ২১ বছর চলেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত ধারায়, পাকিস্তানি ভাবধারা অনুসরণ করে। যে কারণে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সব উন্নয়ন ব্যাহত হয়, বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ

সুদীর্ঘ ২১ বছর লড়াই-সংগ্রাম, নির্যাতনের পর ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাবার আজীবন লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে সরকার পরিচালনায়ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা অগ্রগণ্য থাকে। তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন দেশে একটি গণমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিক্যাল শিক্ষার সব ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আজকে তিনি বিশ্বের দরবারে সমাদৃত এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদার সুযোগ।

দেশের চিকিৎসকরা এখন আর বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যায় না, দেশেই সৃষ্টি হয়েছে উচ্চশিক্ষার চাহিদামতো সুযোগ। প্রতিটি ছাত্র মেডিক্যালে ভর্তি হওয়ার সময় মানবসেবার ব্রত হৃদয়ে ধারণ করে। এর আগে সুযোগের অভাব ছিল। গোটা দেশে বঙ্গবন্ধুকন্যা স্বাস্থ্যব্যবস্থার গ্রাম পর্যন্ত অভূত সম্প্রসারণ করে আমাদের সেই ব্রত পালন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ঋণ আমরা কখনো শোধ করতে পারব না। আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর প্রতি দায়বদ্ধ থেকে যার যার দায়িত্ব পালন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই, তবেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমরা এ দেশের চিকিৎসকরা বাংলাদেশে চিকিৎসার সব সুযোগের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করে যেন দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের সেবা করি– এই হোক এদেশের চিকিৎসকদের বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

বাংলাদেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় শেখ হাসিনার অবদান

বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার চার দফায় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. কমিউনিটি ক্লিনিক

প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ জনগণের জন্য একটি করে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৯৬ সালে এবং ১৯৯৮-২০০১-এর মধ্যে ১০ হাজারের অধিক চালু করা হয়েছিল, যার সফল জনগণ পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে জনগণের অতি প্রয়োজনীয় এ সুবিধা বন্ধ করে দেয় তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার বিপুল ভোটে জাতীয় নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করে। বর্তমানে ১৩ হাজার ৮৮১ টি ক্লিনিক চালু আছে। যেখান থেকে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান, স্বাভাবিক প্রসবব্যবস্থা, টিকাদান কর্মসূচিসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একটি অতি জনপ্রিয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

২. মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের চিকিৎসকদের তিন দশকের দাবি ছিল মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এর আগে অনেক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ১৯৯৭ সালের ৩১ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি আদেশ প্রদান করেন, যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল। এ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মেডিক্যাল শিক্ষা, সেবা এবং গবেষণায় বিশ্বসেরার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবার ক্ষমতায় এসে আরও চারটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন–চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনায়।

৩. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

১৯৯৬ সালের আগে এদেশে কোনো সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতি ছিল না। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে, ষড়যন্ত্র হয়েছে,

এমনকি ডা. মিলন শহিদ হয়েছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ১৯৯৬-এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সর্বদলীয় কমিটি এবং সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০০০ প্রণীত হয়। এ স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ সালে আবার যুগোপযোগী করা হয়।

৪. মেডিক্যাল শিক্ষা

২০১০-২০২১ পর্যন্ত সরকারি/বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ সংখ্যা এখন ১১২ (এর মধ্যে ৫টি সামরিক বাহিনীর অধীনে), সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং মেডিক্যাল কলেজে ডেন্টাল ইউনিটের সংখ্যা ৩৫, বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিক্যাল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৯টি। সরকারি/বেসরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউশন সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০টি। নতুন ১৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল এবং ৪টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ইনস্টিটিউট হেলথ টেকনোলজি ১০৮টি।

৫. জাতীয় ঔষধনীতি

ঔষধ শিল্প এখন বাংলাদেশের গৌরবের শিল্প। দেশের ৯৮ ভাগ চাহিদা পূরণ করে ১৫১টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে ওষুধ। ওষুধের মান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় ঔষধনীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৬. অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা

এ ধরনের রোগে আক্রান্ত শিশু এবং শিশুর অভিভাবকরা এক অসহায় দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদের বিশেষ উদ্যোগে দেশে অটিজম বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এ শিশুদের পুনর্বাসনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এখন এ শিশুরা আর অবহেলিত নয় এবং এদের অভিভাবকরা অসহায় নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজমে বিশ্ব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সম্প্রতি ইউনেস্কো জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

৭. ক্লিনিক্যাল সেবা

ক. ১৯৯৬-২০০১ সালে শেরেবাংলা নগর ৪০০ শয্যার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ৪০০ শয্যার জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট, কিডনি হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, মানসিক হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকার আজিমপুরে ১৭৫ শয্যার মা ও শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকার মাতুয়াইলে ২০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল ও মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ৬০০ শয্যার ডিএমসিএইচ-২ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা, যা এ সময়ে বাস্তবায়ন হয়েছে। ২০তলাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া, যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে। ঢাকার মিরপুরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ঢাকা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

খ. ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি–(১) এ সময়ে ১৩টি নতুন হাসপাতাল এবং ১০ হাজার ৬৬২টি নতুন হাসপাতাল শয্যা যুক্ত হয়েছে। কুর্মিটোলা ও মুগদায় ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ৩০০ শয্যার ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স, তেজগাঁওয়ে ৩০০ শয্যার নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শেখ ফজিলাতুন নেছা চক্ষু হাসপাতাল। (২) শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর এর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেছেন। ৫০০ বেডের এ হাসপাতালটি বিশ্বের অন্যতম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল। (৩) বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় ১ হাজার শয্যার সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণাধীন।

৮. চিকিৎসক নিয়োগ ও পদোন্নতি

ক. বিসিএসের মাধ্যমে ৯ হাজার ৯৪৪ জন চিকিৎসকসহ এ সরকারের আমলে ১৪,০৭৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চলছে, যাতে তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসক সংকট না থাকে।

খ. পিএসসির দীর্ঘসূত্রতার পরিবর্তে মেডিক্যাল শিক্ষকদের পদোন্নতি ডিপিসি এবং এসএসবির মাধ্যমে নেওয়া–এ সরকারের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। ইতোমধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং কনসালট্যান্ট হিসবে ৫ হাজার ৯০০ চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

গ. চিকিৎসকদের প্রশাসনিক পদে ২ হাজার ২০০ জনকে এবং স্কেলের মাধ্যমে ৮ হাজার জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

৯. নার্সিং পেশা

ক. নার্সদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।

খ. ১৫ হাজার নতুন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গ. নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। ৭টি ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

ঘ. নার্সদের উচ্চশিক্ষার জন্য মুগদায় কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে National Institute of Advanced Nursing Education and Research (NIANER), যেখানে ইতোমধ্যে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে।

ঙ. নতুন করে জনবল কাঠামোসহ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা

ক. ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১-এর আলোকে গ্রাম পর্যায়ের মাঠকর্মী থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং উপজেলা-জেলা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের সব হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

খ. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কাগজনির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে।

গ. ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে।

ঘ. টেলিমেডিসিন সেবাকেন্দ্র ৯৫টিতে উন্নীত হয়েছে।

ঙ. স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থার সব পর্যায়ে অটোমেশনসহ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে।

১১. বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন

ক. ১৯৯৮-২০০৩ সালের জন্য পঞ্চম স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা পর্যায়ে পরিকল্পনা (এইচপিএসপি) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

খ. ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি: তৃতীয় 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ২০১১-২০১৬ প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ. চতুর্থ 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ২০১৬-২০২১' প্রণয়ন করে বাস্তবায়নাধীন আছে।

১২. হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি

৩৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতাল এখন ৪৪১টি, মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোয় প্রায় ২ হাজার ৫০০ শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৩. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

ক. ১৭১টি মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ৫৪টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খ. সাভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭, যা ২০০৮ সালে ছিল ১.৪১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. গড় আয়ু বৃদ্ধি

মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে এখন তা ৭২.৮ বছর।

১৬. জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ও অ্যাম্বুলেন্স

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ৪০০টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্গম হাওর অঞ্চলের জন্য ১০টি নৌ অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

১৭. স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের জন্য কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১৮. নীতি কাঠামো ও আইন

ক. বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১১।

খ. ধূমপান নিবারণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১২।

গ. শতাব্দী পুরোনো অমানবিক কুষ্ঠ আইন (লেপ্রসি অ্যাক্ট) ১৮৯৮ বাতিল।

ঘ. রোগী ও চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক আইন হালনাগাদ করা প্রক্রিয়াধীন।

ঙ. মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন ২০১৭।

চ. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এবং সার্জনস (বিসিপিএস) আইন ২০১৭।

১৯. বেসরকারি খাত

ক. দেশের চিকিৎসা জনবলের অভাব পূরণে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

খ. বেসরকারি পর্যায়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারত্ব প্রকল্প চালু হয়েছে।

২০. আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–

ক. জাতিসংঘের ২০১০ সালে এমডিজি-৪ এবং ২০১১ সালে 'ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক সাউথ সাউথ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

খ. টিকাদান কর্মসূচি সাফল্যের জন্য দুই বার গ্যাভি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ।

গ. সায়মা ওয়াজেদকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় অটিজম বিষয়ে অবদানের জন্য 'এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ' পুরস্কার প্রদান করে।

> আমাদের রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা–বাজেটের স্বল্পতা, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। এরপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিক্যাল শিক্ষার অনেক সূচকই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে

এ প্রবন্ধে দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার কিছু মৌলিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মেডিক্যাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা–বাজেটের স্বল্পতা, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। এরপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিক্যাল শিক্ষার অনেক সূচকই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক, মানবসম্পদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে (বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন ১১ অক্টোবর ২০১৮)। এখন প্রয়োজন (১) দুর্নীতি দমন, (২) দক্ষ, সৎ, দেশপ্রেমিক মানবসম্পদ গড়ে তোলা এবং (৩) আধুনিক সময়োপযোগী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে আধুনিক বিশ্বের মতো ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। এ উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি হয়েছে শেখ হাসিনার সুপরিকল্পিত নেতৃত্বের জন্য। এ ধারা দেশের মানুষের প্রয়োজনে অব্যাহত রাখতে হলে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বিকল্প নেই।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতের ৫০ বছর

মোল্লাহ আমজাদ হোসেন

দু ই হাজার একুশ সাল। বাংলাদেশ পালন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। চলমান আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশের কাতারে নিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা মেনেই আবর্তিত হচ্ছে দেশের জ্বালানি খাত। কিন্তু সব মানুষের জন্য অ্যাফোর্ডেবল দামে বিদ্যুৎ জ্বালানি নিশ্চিত করা যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব নিয়ে তিনটি মৌলিক কাজ করেছিলেন। তা হচ্ছে–জ্বালানি বিদ্যুৎ সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করা; ওই জ্বালানি অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং কাজগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি ও তাদের ক্ষমতায়ন। অবশ্য এ কাজ বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে করেননি। বাংলাদেশকে কৃষি অর্থনীতি থেকে শিল্প অর্থনীতির পথে এগিয়ে নিতে ষাটের দশক থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এটি তার রূপায়ণ।

সম্পদ সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান ও জনবল তৈরি

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করার আগে মাত্র সাড়ে তিন বছরে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত নতুন মাত্রায় পৌঁছায়। গড়ে ওঠে আজকের পেট্রোবাংলা। দায়িত্ব দেওয়া হয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণনের। বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ভেঙে গঠন করা হয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। আর খনিজসম্পদ কয়লা, কঠিন শিলাসহ অন্যান্য অনুসন্ধান, উন্নয়ন কাজ করার জন্য গঠন করা হয় 'বাংলাদেশ মিনারেলস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন'। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম 'মেরিটাইম বাউন্ডারি আইন' প্রণয়ন করে। কেননা বঙ্গবন্ধু তখনই

বুঝতে পেয়েছিলেন জ্বালানিসম্পদসহ নানা সম্পদের আধার বঙ্গোপসাগর। যার ওপর নির্ভর করেই আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়। আইন সংশোধন করে গ্যাসসম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা নিশ্চিত করার পর অনুধাবন করেছিলেন, পাকিস্তান আমলের রয়্যালিটির আওতায় আবিষ্কার করা গ্যাসক্ষেত্রগুলোর মালিকানা বাংলাদেশের নেই। যদি শুরুতে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের ছেড়ে যাওয়া সিলেট অঞ্চলের গ্যাসক্ষেত্রগুলো গ্রহণ করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড নামে কাজ শুরু করা হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় 'শেল বিভি'র আবিষ্কার করা পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা ও রশিদপুর এবং তিতাস বিতরণ কোম্পানি মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে কিনে নিতে সক্ষম হন। অপরদিকে ওই সময় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে তেলের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে পড়ার কারণে মাত্র এক বছরের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করে বঙ্গোপা সাগরে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রথম এ কাজ শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু যখন বিপিডিবি গঠন করেন, তখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৫০০ মেগাওয়াটের মতো। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিল ২০০ মেগাওয়াটের সামান্য বেশি। উৎপাদনে মূল নিয়ামক ছিল জলবিদ্যুৎ আর তেল। গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছিল কেবল হবিগঞ্জ আর সিদ্ধিরগঞ্জের দুটি ছোটো বিদ্যুৎকেন্দ্রে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল অনেক দূরে যাওয়ার। তখন পরিকল্পনা নিতে শুরু করেন সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা ছিল অবহেলিত। বঙ্গবন্ধু সব মানুষের বিদ্যুৎ পাওয়ার বিষয়টি অধিকার হিসাবে সংবিধানে যুক্ত করেন। তৎকালীন বিশ্বে যা ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। তখন পরিকল্পনা করে আশুগঞ্জ আর ঘোড়াশালে বিদ্যুৎ উৎপাদন হাব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর এ পরিকল্পনায় অংশীদার হিসাবে হাত বাড়ায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানি। বলে রাখা দরকার, তাঁর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। যদিও এই বিদ্যুৎ সবার জন্য অ্যাফোর্ডেবল রাখা সম্ভব হয়েছে কি-না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে।

আর বাংলাদেশ মিনারেল করপোরেশন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় জয়পুরহাটের চুনাপাথর, মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা এবং জামালগঞ্জের কয়লা অনুসন্ধান ও তা ব্যবহার করার কাজ শুরু করে। কিন্তু এগুলোর সাফল্য বঙ্গবন্ধু দেখে যেতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধু-উত্তর জ্বালানি খাত

বলে রাখা দরকার–জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের এই তিন প্রতিষ্ঠানের ছিল স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার। বঙ্গবন্ধু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেন সেই সময়ের যোগ্যতম মানুষকে। কার্যত প্রতিষ্ঠান তিনটির প্রধান, সচিবের মর্যাদায় স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়, জ্বালানি বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো তা থেকে মুক্ত ছিল না। প্রথমেই পেট্রোবাংলার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পেশাজীবী বিশেষজ্ঞরা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। ফলে নিজস্ব জ্বালানি ও খনিজসম্পদ আহরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়নের জন্য অ্যাফোর্ডেবল দামে জ্বালানি সরবরাহ করার লক্ষ্য বড়ো ধরনের হোঁচট খায়।

বলতে বাধা নেই, দীর্ঘ বিরতির পর বঙ্গবন্ধুর পথ ধরে জ্বালানি খাতকে এগিয়ে নেওয়া শুরু হয় ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। কিন্তু রাজনৈতিক পালাবদলের পর অন্য দল ক্ষমতায় আসায় ওই ধারায় আবার ছেদ ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে–শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলেও আগের ধারাবাহিকতায় ফিরতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে নিজস্ব জ্বালানিসম্পদ আহরণের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বদলে চলে আসে অবহেলার পর্যায়ে। অবশ্য সরকারের নীতিনির্ধারকরা দাবি করেন 'পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে' নিজস্ব জ্বালানিসম্পদের অগ্রাধিকার ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। তবে খাতসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ২০০৯ সালে আগের সময়ের মতো নিজস্ব জ্বালানিসম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে না পারা টেকসই উন্নয়নের জন্য জ্বালানির নিরাপদ জোগানের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ব্যর্থতা।

বিদ্যুৎ খাত উৎপাদন

বলতে বাধা নেই, অবকাঠামো উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ৫০ বছর সময়কালে সবচেয়ে বড়ো অর্জন বিদ্যুৎ খাত। আর তার সাফল্য হিসাবে প্রায় ১০০ ভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। দুদশক আগেও অনেকেই বিশ্বাস করেননি বাংলাদেশের পক্ষে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বিদ্যুৎ খাতের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান 'পাওয়ার সেল'-এর মহাপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেনের বিশ্লেষণ হচ্ছে, 'সরকারে এসে তড়িঘড়ি করে নয়, দলীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা যা আওয়ামী লীগ তার ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে তুলে ধরেছিল; তার সফল বাস্তবায়নই বিদ্যুৎ খাতের আজকের অর্জনকে নিশ্চিত করেছে।' তিনি আশাবাদী যে অর্থনীতির মুখ্য চালিকাশক্তি হিসাবে বিদ্যুৎ খাতের ২০৩০ ও ২০৪১ মেয়াদের পরিকল্পনাগুলো সঠিক সময়ে অর্জিত হবে।

বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা আমদানিসহ ২২ হাজার মেগাওয়াটের সামান্য বেশি। আর শিল্পের নিজস্ব উৎপাদনক্ষমতা মানে ক্যাপটিভ পাওয়ারকে বিবেচনায় নিলে মোট উৎপাদনক্ষমতা ২৫ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। ২০০৮ সালের শেষে গ্রিডযুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত সক্ষমতা ছিল প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট। ফলে গত এক যুগ সময়কালে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮ হাজার মেগাওয়াট। যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থাপিত হয়েছে ৪৫ শতাংশের মতো। বাকিগুলো বিডিডিবি ও বিপিডিবির কোম্পানি নিজস্ব এবং যৌথ বিনিয়োগে স্থাপন করেছে। পরিকল্পনা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন সক্ষমতা ৪০ হাজার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট হওয়ার কথা। কিন্তু নিজস্ব গ্যাস মজুত কমে আসায় বিদ্যুৎ জ্বালানি উৎপাদনে তেলের অবদান বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন খরচ আবার কমিয়ে আনার জন্য পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান অনুসারে জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে উৎপাদন খরচ আর কমে আসেনি। বরং ২০১০ সালের পরিকল্পনা অনুসারে কয়লাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসাবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও পরের পরিকল্পনায় কয়লা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সর্বশেষ সরকারের নীতি হচ্ছে–কয়লা থেকে সরে এসে গ্যাসনির্ভরতা বৃদ্ধি করা। উৎপাদন খরচে তা নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত করবে। কিন্তু সেটা সহনীয় থাকবে কি না, তা নিয়ে সরকারের এখনো কোনো সমীক্ষা নেই।

বিতরণ

বলার অপেক্ষা রাখে না, ২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত কর্মসূচি ২০২০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য এটা একটি বড়ো অর্জন। সরকারি হিসাবে এখন ৯৯.৭৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। কিন্তু সরকার দ্রুত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে গিয়ে বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিবেচনায় না নিয়েই বিনিয়োগ করেছে। ফলে আগামী বছরগুলোয় আরইবি এবং এর সমিতিগুলোর লোকসান বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিতরণব্যবস্থায় সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানসম্মত বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা। বিতরণ সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে– নগর শহরে ২০২৩ সালের মধ্যে এবং গ্রামে ২০২৫ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু নগর শহরে কাজ করা বিতরণ সংস্থাগুলো ঝুঁকিতে আছে শিল্পে ব্যবহার বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ করে শিল্প ও বাণিজ্য পর্যায়ে বিক্রি বৃদ্ধি না হলে বিনিয়োগ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি ঝুঁকিতে পড়বে। অবশ্য গ্রিড বিদ্যুতের চেয়ে গ্যাসনির্ভর ক্যাপটিভ বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কম হওয়ার কারণে উদ্যোক্তারা গ্রিড বিদ্যুৎ ব্যবহারে আগ্রহী হচ্ছে না। যদিও বলা হচ্ছে বিতরণ কোম্পানিগুলো মানসম্মত বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে দিতে পারছে না বলেই তারা ক্যাপটিভনির্ভর থাকছে। কার্যত বিতরণ প্রতিষ্ঠানগুলো শতভাগ না হলেও এখন শিল্পাঞ্চলগুলোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। অবশ্য অনেকে মনে করছেন, উৎপাদন খাতের মতো বিতরণ পর্যায়ে এখন বেসরকারি বিনিয়োগ উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। তাতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

সঞ্চালন

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা খাত হচ্ছে সঞ্চালনব্যবস্থা। সঞ্চালন সীমাবদ্ধতার কারণে দেশে অপারেশনে থাকা ১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এখন অর্ধেক ক্ষমতায় চালু রাখা হয়েছে। দেশে আরও কয়েকটি ছোটো অঞ্চল রয়েছে, যেখানে সঞ্চালন সীমাবদ্ধতার কারণে পিক সময়কালে বিদ্যুৎ সরবরাহ কখনো কখনো বিঘ্নিত হচ্ছে। সঞ্চালনের দায়িত্বে থাকা সংস্থা পিজিসিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জমি অধিগ্রহণ জটিলতা এবং চলমান কোভিডের কারণে তাদের অনেক প্রকল্প বিলম্বিত হয়েছে। আবার অনেক অঞ্চলে জেনারেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করে তারা সঞ্চালনব্যবস্থা তৈরি করলেও তা অলস বসে আছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত পিজিসিবির সামনে রয়েছে আরও বড়ো চ্যালেঞ্জ। সেটা হচ্ছে ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রিড আপগ্রেডেশন ও রূপপুর পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ শেষ না হলে দেশের একমাত্র পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন শুরু বিঘ্নিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, পরামাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র একবার চালু হলে তা আর বন্ধ রাখা যাবে না। ফলে সেটাকে ফিড করার জন্য বিশ্বমানের সঞ্চালনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন বাংলাদেশের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ।

অবশ্য এর বাইরে রয়েছে আরও একটি বড়ো কাজ। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান বাড়ানোর নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এটার জন্য স্টোরেজ ও গ্রিড ইন্টিগ্রেশন একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। অবশ্য বিষয়টি এখনো খুব প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও সংশ্লিষ্টরা কাজ শুরু করেছে।

কার্বন দূষণ কমানোর জাতীয় ॥ পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ খাতের প্রস্তুতি

আলোচ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। গ্রিনহাউজ গ্যাস দূষণ কমানোর জন্য আগে সরকারের ন্যাশনালি ডিটারিমন কন্ট্রিবিউশন বা এনডিসি অনুসারে নিঃশর্তভাবে ৫ শতাংশ দূষণ কমানোর জন্য তিনটি খাত চিহ্নিত ছিল। সেগুলো হচ্ছে– বিদ্যুৎ, শিল্প ও পরিবহণ। এর সবকটির সঙ্গেই রয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র। আগের পরিকল্পনা অনুসারে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতা লাগানো, এনার্জি এফিসিয়েন্সি রোডম্যাপের আওতায় জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারে সাফল্য পরিকল্পনার চেয়ে বেশি। কিন্তু এতে কী পরিমাণ কার্বন দূষণ কমানো সম্ভব হয়েছে, এর কোনো সমন্বিত হিসাব এখনো চূড়ান্ত করা যায়নি। এজন্য এই অর্জন বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যাচ্ছে না। অন্যদিকে সংশোধিত এনডিসিতে শর্তমুক্ত এবং শর্তযুক্ত মিলিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন দূষণ প্রায় ২২ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্য চূড়ান্ত করে তা ইউএনএফসিসিসিতে গত আগস্টে দাখিল করা হয়েছে। এতে আলোচ্য সময়কালে ৯০ মিলিয়ন টন কার্বন দূষণ কমিয়ে আনা হবে। শর্তহীনভাবে এবার কমানোর লক্ষ্য বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬.৭৩ শতাংশ। পরিকল্পনা অনুসারে প্রায় ২২ শতাংশ দূষণ কমানোর যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে আগামী ৯ বছর সময়কালে বিনিয়োগ লাগবে ১৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে

> ‘মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি’ পরিকল্পনা ২০৪০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ পাওয়ার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যরা তুলে ধরেছেন

বিদ্যুৎ খাতেই কাজের পরিমাণ ৪৯ শতাংশ। শর্তহীন দূষণ কমানোর কাজে বিনিয়োগ দরকার হবে ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর মিটিগেশনের মাধ্যমে কার্বন দূষণ কমানোর ৯৫ শতাংশ কাজই করতে হবে দেশের বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতকে।

অবশ্য বাংলাদেশ এর প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে শুরু করেছে। গত ১০ বছর সময়কালে বিদ্যুতের গড় উৎপাদনদক্ষতা ২৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে দক্ষতা ৫০ শতাংশের ওপরে নিয়ে যাওয়া। দূষণ কমানোর প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে ইতোমধ্যে ৮ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার ১০টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ট্রানজিশন জ্বালানি হিসাবে গ্যাস/এলএনজিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এবং দূষণ কমানোর বিষয় বিবেচনায় রেখে সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। বিষয়টি নিয়ে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসেন আলাপকালে জানালেন, বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিশেষ করে লো-কার্বন উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আবার নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান বাড়ানোর পরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। এজন্য ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ উৎস সরকার নিশ্চিত করেছে।

অন্যদিকে 'মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি' পরিকল্পনা ২০৪০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ পাওয়ার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যরা তুলে ধরেছেন। এর অর্জনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, 'পরিকল্পনা হচ্ছে ২০৪০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আপ-টু ৪০ শতাংশ বিদ্যুতের জোগান পাওয়া'। ইতোমধ্যে সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) ২০৪০ সালের মধ্যে সোলার থেকে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার একটি খসড়া মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্ত করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আদেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তা মূল্যায়নও শেষ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সোলার থেকে ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হবে বাস্তবসম্মত। অবশ্য স্রেডার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মনে করছেন, এখন জলবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের পরিমাণ ৩ শতাংশের সামান্য বেশি। চলমান পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিবেচনায় ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে কমপক্ষে ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। অবশ্য তিনি আশাবাদী জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের অর্জন নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে, এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন রোডম্যাপ অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি ব্যবহার কমিয়ে আনার কথা। ২০১৫ সাল থেকে চলমান এই কাজে ইতোমধ্যে দক্ষ ব্যবহারের কারণে ৭ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে আলাপকালে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপপরিচালক ড. মিজান আর খান বলেন, বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে জিএইচজি দূষণ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে অর্জন অনেক। কিন্তু এর কারণে বাংলাদেশ খাত-উপখাত মিলিয়ে কী পরিমাণ দূষণ কমাতে সক্ষম হয়েছে এর কোনো তথ্য নেই। তাই এখন থেকে এনডিসি প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে কোন খাত-উপখাত থেকে কী পরিমাণ দূষণ কমানো সম্ভব হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নিয়ম মেনে প্রতিবেদন তৈরি ও সংরক্ষণ করা দরকার, যা এনডিসির শর্তযুক্ত অংশ বাস্তবায়নে অর্থায়ন পাওয়ার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রাথমিক জ্বালানি খাত

কয়লা

দেশে খুব উন্নত মানের ৩ বিলিয়ন টন বা প্রায় ৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ কয়লা থাকলেও তা ব্যবহারে তিন দশকেও বাংলাদেশ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। দেশের পাঁচটি কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে বড়পুকুরিয়া থেকে সীমিত পরিমাণে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে, যা কারিগরি কারণে যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, গ্যাসসম্পদ ফুরিয়ে আসার কারণে ২০৫০ সাল পর্যন্ত সহনীয় দামে বিদ্যুৎ জ্বালানি সরবরাহের একমাত্র উৎস ছিল এই কয়লা। কিন্তু গত ১০ বছর সময়কালে সরকারের নীরব সিদ্ধান্ত হচ্ছে– নিজস্ব কয়লাকে মাটির নিচে রেখে দেওয়া। কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদনে আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকা। দায় না থাকলেও ১০টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র না করার সিদ্ধান্ত, কয়লা থেকে সরে আসার চূড়ান্ত সংকেত। যদিও ভারত ও চীনের মতো অতি দূষণকারী দেশ কয়লা উত্তোলন এবং এর ব্যবহার ২০৬০ বা ২০৭০ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কয়লাবিমুখতা কতটা যৌক্তিক, এটা নিয়ে নানা মত আছে। ক্যাবের একটি হিসাব তুলে ধরা যাক, গত ১১ বছর সময়কালে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পাইকারি বিক্রি দাম প্রতি ইউনিট ২.৩৭ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.১৭ টাকা। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১১৮ শতাংশ। গড়ে খুচরা পর্যায়ে বিক্রির দাম প্রতি ইউনিট ৩.৭৬ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.১৩ টাকা। বৃদ্ধির হার ৯০ শতাংশ। জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এরপরও বিপুল ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এর প্রধান কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিজস্ব জ্বালানির জোগান কমে আসা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেল ও এলএনজির অধিক ব্যবহার। তারা মনে করেন, ৫০ বছর সময়কালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা নিজস্ব কয়লাসম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করতে না পারা। তারা এটাও মনে করেন, ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম সহনীয় রাখতে নিজস্ব কয়লা ব্যবহারে সরকারের শেষবারের মতো দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। যদিও তা এখন আর খুব সহজ হবে না।

গ্যাস অনুসন্ধান

১০০ বছর সময়কালে বাংলাদেশের আজকের ভূখণ্ডে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে তা উল্লেখ্যযোগ্য নয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশের তেল গ্যাস অনুসন্ধান উন্নয়ন নতুন মাত্রা পেলেও পরের সময়কালে তা আর ধরে রাখা যায়নি। ২০২৫ সালের মধ্যে স্থলভাগের অনুসন্ধান থেকে ৪/৫ টিসিএফ গ্যাস যোগ করার জন্য সরকার বাপেক্সকেন্দ্রিক একটি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বাপেক্স নিজস্ব এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এই কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আবার ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি গত ৫০ বছরের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হলেও তার সুফল ঘরে তোলা যায়নি। কেননা বিগত সময়কালে সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কোনো সাফল্য নেই। গত ২০ বছর সময়কালে প্রমাণিত গ্যাস মজুত থেকে প্রায় ১৫ টিসিএফ গ্যাস ব্যবহার করা হলেও নতুন যোগ হয়েছে ৩ টিসিএফ-এর মতো। নতুন গ্যাস পাওয়া না গেলে বর্তমান মজুত পুরোটাই ২০৩১ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ফলে গ্যাসনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এলএনজি আমদানি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না, যা বাংলাদেশকে বাধ্য করবে আন্তর্জাতিক বাজার অনুসরণ করে দেশীয় বাজারে গ্যাসের দাম নির্ধারণে। এটা শিল্পায়নের বর্তমান ধারাকে অব্যাহত রাখতে কতটা সহায়ক হবে তা বড়ো প্রশ্ন। তবে অনেকেই মনে করেন, নিজস্ব জ্বালানির ব্যবহার ছাড়া ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার পথে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ স্বপ্নের সফল অর্জন

পাবনার রূপপুরে কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। এগিয়ে যাচ্ছে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজ। এটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের এক সফল বাস্তবায়ন তাঁর কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। ১৩ বিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পটি বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশকে অন্য উচ্চতায় নিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হচ্ছে–এই কেন্দ্রটি পরিচালনার জন্য জনবলও তৈরি হচ্ছে একসঙ্গে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন। কিন্তু সমন্বিত চ্যালেঞ্জ এখনো অপেক্ষমাণ, সেটি হলো যথাসময়ে কেন্দ্রটি উৎপাদনে আনা। বিদ্যুতের উচ্চ উৎপাদন খরচ যখন বাংলাদেশের জন্য মাথাব্যথার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র, আমদানি করা অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় সাশ্রয়ী দামে বিদ্যুৎ দিতে পারবে। পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এটা দেশের নন-কার্বনাইজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হবে।

বিদ্যুৎ আমদানি

দীর্ঘ আলোচনার পর ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির মধ্য দিয়ে শুরু হয় ক্রস বর্ডার পাওয়ার ট্রেড। এখন আমদানি করা হচ্ছে ১১৬০ মেগাওয়াট। ভেড়ামারা ও কুমিল্লার দুটি পয়েন্ট থেকে এই বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি রয়েছে প্রাকচুক্তি পর্যায়ে। এটা হলে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বড়ো সাফল্য হবে। সর্বোপরি সরকার ভারতে সোলার প্রকল্প স্থাপন করে সেখান থেকে বিদ্যুৎ কেনার একটি উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। আর 'আদানি' গ্রুপের একটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনার প্রকল্পটি চলমান আছে।

বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, ৫০ বছরের এই বড়ো অর্জনকে চার জাতি পাওয়ার গ্রিডে রূপান্তর করার মাধ্যমে ইউরোপ বা নর্থ আমেরিকার মতো রিয়াল টাইম বিদ্যুৎ বাণিজ্য শুরু করা সম্ভব হবে।

বদ্বীপ বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানি চ্যালেঞ্জ

জ্বালানি বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনায় প্রায়ই একটি কথা নীতিনির্ধারকরা জোর গলায় বলেন, জাপান, কোরিয়া বা তাইওয়ানের মতো দেশ আমদানি করা জ্বালানি দিয়ে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ কেন পারবে না। তর্কের খাতিয়ে ধরে নেওয়া যাক, সাগরপথে আমদানি করা এলএনজি বা কয়লার দামের চাপ বাংলাদেশের অর্থনীতি সামাল দিতে সক্ষম হলো। কিন্তু বদ্বীপ হওয়ার কারণে দেশের পুরো উপকূলের কম গভীরতায় জ্বালানি আমদানি অবকাঠামো স্থাপনে যে বড়ো চ্যালেঞ্জ, তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার পর এবং পায়রাবন্দর কর্তৃপক্ষ 'ডিপসি পোর্ট' স্থাপন থেকে সরে আসার কারণে কয়লা আমদানি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। সাগরপথে গভীরতা না থাকায় ৫০ হাজার টনের জাহাজে ৮ থেকে ১৩ হাজার টন কয়লা আমদানি হচ্ছে– যা ব্যয় বাড়াচ্ছে, বৃদ্ধি করছে সরবরাহ ঝুঁকি। রামপালের জন্য কয়লা আমদানিতে এই চ্যালেঞ্জ আরও বড়ো হবে। যদিও মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে একটি 'ডিপসি কোল পোর্ট' করা হয়েছে। যার কারণে সেখানে কয়লা আনতে সংকট হবে না। যদিও মাতারবাড়ীর এই 'কোল পোর্ট'কে 'কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল' করার একটি প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরে আসার কারণে তার আর বাণিজ্যিক গুরুত্ব থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। ফলে চলমান কেন্দ্রগুলোয় কয়লা সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কেননা গভীরতা না থাকায় কম কয়লা আনা এবং কয়লা আনার জন্য 'ডিপসি' অবকাঠামো তৈরি উভয়ই ব্যয়সাপেক্ষ।

উপকূলে গভীরতা না থাকায় স্থলভাগের টার্মিনাল স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হবে। এজন্য ভাসমান টার্মিনাল ও রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) করে এলএনজি আমদানি শুরু হয় ২০১৮ সালে। এখন দুটি টার্মিনালের ক্ষমতা প্রতিদিন ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করার। এ দুটি চলতি বছর গড়ে প্রতিদিন ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বিগত কয়েক মাস বিশ্ববাজারে এলএনজির উচ্চমূল্য নিয়ে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত। ফলে সাবসিডির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাতারবাড়ীতে স্থলভাগে একটি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ চলমান আছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের শেষে এটা অপারেশনে আসতে পারে। যদিও সাবসী পাইপলাইন সংকটের কারণে একটি এফএসআরইউ তার সরবরাহ বন্ধ করেছে এবং মধ্য জানুয়ারির আগে তা চালু হবে না।

কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে প্রতিদিন ৬ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দরকার হবে। এর মধ্যে ৬ হাজার এমএমসিএফডি আমদানি করতে হবে, যা বাংলাদেশের জ্বালানির বিশেষ করে প্রাথমিক জ্বালানির ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। আর জ্বালানির দামের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গত অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশকে প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজি ৩৩ মার্কিন ডলারের বেশি দামে কিনতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামের ওঠানামা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে প্রস্তুতি নিতে হবে। কিন্তু তা এখন আছে–এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই।

শেষকথা

বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি দর্শন বিবেচনায় নিয়ে ৫০ বছরে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশের অর্জন কেবল দেশ নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও প্রশংসিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শতবর্ষে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ বাংলাদেশের একটি বড়ো অর্জন। বাংলাদেশ প্রতিটি নাগরিকের বিদ্যুৎ পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার পূরণ করল। কিন্তু কথায় আছে, আলোর নিচেই অন্ধকার। বিদ্যুৎ আলো ছড়ালেও তা উৎপাদনের জন্য দরকার জ্বালানি। কয়লা ও গ্যাস সরবরাহে বিশেষ করে নিজস্ব উৎস থেকে অনুসন্ধান আহরণের বিষয়টি অবহেলা করা হয়েছে। যদিও বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রথমবারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায়। তখন বঙ্গবন্ধুর দর্শন শতভাগ অনুসরণ করে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু ২০০৮ সালে নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় থাকলেও জ্বালানি উন্নয়ন অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়েছে। আর জ্বালানি জোগানের বিষয়ে পিছিয়ে পড়ার কারণে প্রাথমিক জ্বালানি ও বিদ্যুতের ব্যয় বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। নানা সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ তার বর্তমান জ্বালানি পরিকল্পনায় থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে ৯০ শতাংশ জ্বালানি বিদ্যুৎ আমদানিনির্ভর হয়ে পড়বে। এ কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো দ্বিমত নেই। আর বাড়তি দামের চাপে বিদ্যুতের সাফল্যের উজ্জ্বলতা হ্রাস পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তাই এখনই সময় নিজস্ব জ্বালানি জোগানকে অগ্রাধিকার হিসাবে নেওয়া, যা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বির্নিমাণের জন্য সবচেয়ে বড়ো অগ্রাধিকার।

লেখক: সম্পাদক, এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার

প্র ব ন্ধ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং আমাদের ব্যাংকিং খাত

নিরঞ্জন রায়

এ বছর আমরা বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। একটি দেশের জন্য ৫০ বছর তেমন কোনো সময় নয়। বিশ্বের অনেক দেশ স্বাধীনতার দুই শতাব্দীর অধিক সময় পার করেছে; কিন্তু এখনো তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ স্বাধীনতার দুই শতাব্দীর অধিক সময় পার করলেও এখনো বর্ণবাদ, লিঙ্গবৈষম্যসহ অনেক সমস্যা তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সেই তুলনায় পঞ্চাশ বছর আমাদের দেশের জন্য তেমন কিছু সময় নয় মোটেই। তদুপরি এই পঞ্চাশ বছর আমাদের দেশ নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে চলেছে। তাছাড়া বিগত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বই একধরনের বৈপ্লবিক প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির আবিষ্কার এবং এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এমন গতিশীলতা এনে দিয়েছে, যা আগে কখনো ঘটেনি। এই পরিবর্তনের হাওয়ায় আমাদের দেশও বসে থাকেনি, বরং যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের দেশ ভালোই সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে বিগত দেড় যুগ ধরে একটানা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নতিকল্পে যুগান্তকারী সব কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। ফলে দেশ এগিয়েছে সব ক্ষেত্রে এবং পিছিয়ে নেই দেশের ব্যাংকিং খাতও।

ব্যাংকিং খাতের অভাবনীয় অগ্রগতি

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশের ব্যাংকিং খাত এগিয়েছে আশাতীতভাবে। পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীর্ণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত। সেসময় দেশে মাত্র ছয়টি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক

ব্যাংক এবং তিনটি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক চালু ছিল। সেই সঙ্গে নয়টি বিদেশি ব্যাংকের শাখাও চালু ছিল। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের এই ক্ষুদ্র ব্যাংকিং খাত বৃদ্ধি পেয়ে বিশাল এক আর্থিক খাতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৬১টি তপশিলি ব্যাংক চালু আছে। এর মধ্যে ৬টি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংকের শাখা চালু আছে। এছাড়াও তপশিলিভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংকও চালু আছে। এর বাইরে প্রায় ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এই খাতে অবদান রেখে চলেছে। সব মিলিয়ে দেশে বিরাজ করছে বিশাল আকৃতির এক ব্যাংকিং খাত–যা অন্যান্য খাতের মতো স্বাধীনতার ৫০ বছরের এক উল্লেখযোগ্য অর্জন।

বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত আবারও সঠিক প্রমাণিত

বঙ্গবন্ধু দেশের ব্যাংকিং খাতকে জাতীয়করণ করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের ব্যাংকিং খাত মূলত সরকারি মালিকানাধীন থাকা উচিত। বঙ্গবন্ধুর এমন সিদ্ধান্তের অনেকেই সমালোচনা করলেও এতদিন পরে এসে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কিছুদিন আগে লন্ডন থেকে প্রকাশিত দ্য ব্যাংকার ম্যাগাজিন সারা বিশ্বের সেরা ব্যাংকের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় দেখা যায়, বিশ্বের সেরা ২০টি ব্যাংকের মধ্যে নয়টি ব্যাংকই চীনা ব্যাংক। আর চীনা ব্যাংক সবই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। এমনকি ব্যাংকিং খাতে সেরা পারফরম্যান্স করেছে এমন ১০টি দেশের প্রথম দেশটি হচ্ছে চীন, যেখানে সরকারি মালিকানাধীন সব ব্যাংক। সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে যে সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকও সবচেয়ে ভালো ব্যাবসা করতে পারে, এর বড়ো দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের চীনা ব্যাংকের সফল পারফরম্যান্স। ব্যাংক হচ্ছে মানুষের অর্থের জিম্মাদার। আর এই অর্থের জিম্মাদারের দায়িত্ব বেসরকারি খাতে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ, তা ইতোমধ্যে প্রমাণিতও হয়েছে। আর এই কারণেই যখনই কোনো ব্যাংক সমস্যায় পড়েছে, তখনই তাকে উদ্ধার করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে–তা সে উন্নত বিশ্বই হোক আর উন্নয়নশীল বিশ্বই হোক। উন্নত বিশ্বে কথায় কথায় বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া ঘোষিত হয়। অথচ কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার খবর খুব একটা শোনা যায় না। এর বড়ো কারণ হচ্ছে সরকার সব সময় এসব ব্যাংকের পেছনে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশের সরকারও অনেক ব্যাংককে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। পূর্বের আল বারাকা ব্যাংক বর্তমানের ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের বড়ো উদাহরণ। এমনকি আজকের যে ইস্টার্ন ব্যাংক, সেটিও একসময় এক বিদেশি ব্যাংকের শাখা ছিল এবং একদিন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের নির্দেশে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে সরকারই এগিয়ে এসে সেই বিদেশি ব্যাংকের শাখাকে উদ্ধার করে দেশীয় ইস্টার্ন ব্যাংকে রূপান্তর করে। সেই বিবেচনায় সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের ব্যাংকের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মালিকানা থাকে সরকারের কাছেই। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেশের ব্যাংকিং খাতকে জাতীয়করণের অধীনে রাখার বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত যে যথার্থ ছিল, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ব্যাংকিং খাতের পারফরম্যান্স

একটি দেশের ব্যাংকিং খাত কেমন আকার ধারণ করেছে, তা শুধু ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্বারা বিবেচনা করা যায় না। ব্যাংকের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি কার্যক্রমের পরিধি আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তখনই বলা যেতে পারে যে দেশের ব্যাংকিং খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঠিক তেমনটাই ঘটেছে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে যে শুধু ব্যাংকের সংখ্যা বেড়েছে তাই নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাংকিং পারফরম্যান্সের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক তা হলো: সঞ্চয় বা আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ বিতরণ।

সন্তোষজনক ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি

দেশ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে। দেশের সরকার এবং মানুষের কাছে পোড়ামাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অথচ দেশের অর্থনীতি সচল করার জন্য মূলধনের প্রয়োজন, যার একটি অংশ আসে দেশীয় সঞ্চয় বা আমানত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সরকার আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পেরেছিল এবং এর ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে ব্যাংক আমানত সন্তোষজনকভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত সঞ্চয় বা আমানত সংগ্রহে যে অবদান রেখেছে, এর একটি চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

ডিপোজিট এবং জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা মোট দেশজ উৎপাদন) অনুপাত:

বছর	শতকরা হার (%)	% পরিবর্তন
১৯৭৫	৭.৯০%	--
১৯৮০	৮.৩৫%	০.৪৫%
১৯৯০	১২.৯৮%	৪.৬৩%
১৯৯৫	১৯.৪৩%	৬,৪৫%
২০০১	২৮.৫১%	৯.০৮%
২০০৬	৩৯.১৭%	১০.৬৬%
২০১৭	৪৩.৬৩%	৪.৪৬%
২০২১	৫৭.৩৯%	১৩.৭৬%

সূত্র: ফেডারেল রিজার্ভ ইকোনমিক ডেটা (এফআরইডি)

ওপরের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭৫ সালে যখন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, তখনও সঞ্চয় এবং জিডিপি অনুপাত ছিল ৭.৯০%। দেশের টেকসই অর্থনীতির জন্য এই সঞ্চয় হার মোটেই সন্তোষজনক না হলেও সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের জন্য এই সঞ্চয় যথেষ্টই আশাব্যঞ্জক। পাকিস্তান থেকে প্রাপ্ত সীমিত আকারের ব্যাংকিং খাত দিয়ে এরকম সঞ্চয় সংগ্রহ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে এবং এই সফলতাও সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সাহসী নেতৃত্ব এবং দিকনির্দেশনার কারণে। স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু দেশের ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণে মেধাবী, যোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকে এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশের ব্যাংকিং খাতকে একটি ভালো অবস্থায় দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছিল। তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যাংকিং খাত পুনর্গঠনে অবদান রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্টই প্রশংসিত হয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন, তারা জনগণের মধ্যে সঞ্চয় স্পৃহা জাগাতে সক্ষম হননি মোটেই। কেননা ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের ব্যবধানে দেশীয় সঞ্চয় জিডিপির অনুপাত তেমন বৃদ্ধি পায়নি বললেই চলে অর্থাৎ এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ০.৪৫%। গত শতকের আশির দশকে

এসে দেশের ব্যাংকিং খাতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। দেশে শুরু হয় বেসরকারি ব্যাংকের যাত্রা। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের সময়কালে দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। ফলে এই সময়ে দেশে সঞ্চয় এবং জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে সন্তোষজনক হারে। এক দশকে এই সঞ্চয় হার বৃদ্ধি পায় ৬.৪৩% অর্থাৎ ৮.৩৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৯৮% এসে দাঁড়ায়। পরে দেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক উন্নতি, মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় সঞ্চয় বা ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেলেও এর মাত্রা আন্তর্জাতিক মানকেও ছাড়িয়ে যায় বিগত ১৫ বছরে যখন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে সবদিক থেকে। এই সময় দেশের সঞ্চয় এবং জিডিপির অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭.৩৯%। এই অনুপাত যখন ৩০% অতিক্রম করে, তখন সেই দেশের অর্থনীতিতে মূলধন জোগানের নিজস্ব সক্ষমতা বেড়ে যায় অনেক গুণ। এমনকি সেই দেশ তখন নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুসহ অনেক মেগা প্রকল্প হাতে নেওয়া এবং তা সম্পন্ন করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়া সেই সাক্ষ্যই দেয়।

এই সময় দেশের সঞ্চয় এবং জিডিপির অনুপাত এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭.৩৯%। এই অনুপাত যখন ৩০% অতিক্রম করে, তখন সেই দেশের অর্থনীতিতে মূলধন জোগানের নিজস্ব সক্ষমতা বেড়ে যায় অনেক গুণ

দেশের ব্যাংক আমানত হার এত ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাপক প্রসার ভালো ভূমিকা রেখেছে। দেশের ব্যাংক আমানতের এমন সন্তোষজনক বৃদ্ধির ফলে উন্নত দেশের মতো ব্যাংক আমানতের ওপর প্রদত্ত সুদের হার ক্রমাগত হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই প্রবণতা দেশে মূলধন জোগান সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমানতকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং মানুষের মধ্যে সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস পেতে পারে। তাই দেশের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা যেমন, সব মানুষের জন্য পেনশন বা সর্বজনীন পেনশনব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। তা না হলে মানুষ সঞ্চয়বিমুখ হয়ে ভোগবাদী জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে অবসর জীবনে বা বৃদ্ধ বয়সে এসে মারাত্মক সমস্যায় পড়তে পারে।

গণমানুষের এখনো ব্যাংক হিসাব নেই

বিগত ৫০ বছরে দেশে ব্যাংক খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং ব্যাংক আমানত ও জিডিপি অনুপাত সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেলেও দেশের গণমানুষকে এখনো ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে না। খুব সামান্যসংখ্যক মানুষের মধ্যেই এখনো ব্যাংকিং সেবা আটকে আছে। নিচের তালিকা থেকে এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

ব্যাংক হিসাব প্রতি হাজার সাবালক নাগরিক অনুসারে:

বছর	প্রতি হাজার	সাবালকের মধ্যে ব্যাংক হিসাব পরিবর্তন
২০০৪	২৪৮	--
২০১০	৩২৫	৭৭
২০১৫	৬৩৫	৩১০
২০১৭	৭১৫	৮০

সূত্র: ফেডারেল রিজার্ভ ইকোনমিক ডেটা (এফআরইডি)

ওপরের তালিকা অনুসারে ২০০৪ সালে প্রতি হাজার সাবালক মানুষের মধ্যে মাত্র ২৪৮ জন ব্যাংক হিসাব খুলে লেনদেন করে এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫ জনে দাঁড়ায় ২০১৫ সালে এবং ৭১৫ জনে দাঁড়ায় ২০১৭ সালে। দেশে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসারের পরও এত নগণ্যসংখ্যক মানুষের ব্যাংকে হিসাব থাকা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। যেখানে উন্নত বিশ্বে শতভাগ মানুষ ব্যাংকে হিসাব খুলে থাকে। এমনকি আধুনিক জীবনে ব্যাংকে হিসাব না খুলে একমুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এই অল্পসংখ্যক মানুষের ব্যাংকে হিসাব থাকার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে ব্যাংকিং সেবার চেয়ে নন-ব্যাংকিং সেবা অধিক মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠা একটি বড়ো কারণ। যেমন বিকাশ, নগদ বা এজেন্ট ব্যাংকিং, এমনকি ব্যাংক হিসাব না থেকেও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা যারপরনাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণে মানুষ এখন আর ব্যাংকে হিসাব খোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। মানুষ তাদের নিত্যদিনের লেনদেন এসব নন-ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে বিধায় তারা আর ব্যাংকে হিসাব খুলতে চায় না। এই একই কারণে বিগত গভর্নরের সময় মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংকে কৃষকদের হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ার পরও দেশের অধিকাংশ মানুষকে ব্যাংকের লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দেশের অর্থনীতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ভালো ফল বয়ে আনবে না। এ ব্যাপারে এখনই কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। নিয়ম বা বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে যে কোনোরকম আর্থিক লেনদেন তা সে বিকাশ বা নগদই হোক বা মোবাইল ব্যাংকিংই হোক, তা পেতে হলে গ্রাহকের কোনো না কোনো ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে। মোট কথা, দেশের প্রত্যেক নাগরিক যাদেরই কোনো রকম আর্থিক কর্মকাণ্ড থাকবে, তাদের সবাইকে কোনো না কোনো ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা যত দ্রুত চালু করা যায়, ততই দেশের অর্থনীতির এবং ব্যাংকিং খাতের জন্য মঙ্গল।

ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রসার

আমাদের দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রম মূলত সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণদানের মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের ব্যাংকিং খাত যেভাবে এগিয়েছে, এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রসারও সেভাবেই ঘটেছে। দীর্ঘ পাঁচ যুগে দেশের ব্যক্তি খাতে

ব্যাংক ঋণের যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, এর একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ব্যক্তি খাতে ঋণ এবং জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) অনুপাত:

বছর	শতকরা হার (%)	% পরিবর্তন
১৯৭৫	১.৯২%	
১৯৮০	৫.৭৭%	৩.৮৫% বৃদ্ধি ১৯৭৫ এর তুলনায়
১৯৯০	১৩.২২%	৭.৪৫% বৃদ্ধি ১৯৮০ এর তুলনায়
১৯৯৫	২০.৮৮%	৭.৬৬% বৃদ্ধি ১৯৯০ এর তুলনায়
২০০১	২৪.১৮%	৩.৩০% বৃদ্ধি ১৯৯৫ এর তুলনায়
২০০৬	৩১.১৭%	৬.৯৯% বৃদ্ধি ২০০১ এর তুলনায়
২০১৭	৪৭.৮৮%	১৫.৯১% বৃদ্ধি ২০০৬ এর তুলনায়
২০২০	৪৫.২৫%	২,৬৩% হ্রাস ২০১৭ এর তুলনায়

সূত্র: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের তথ্যভান্ডার (ডেটা সোর্স) এফএস, এএসটি, পিআরভিটি, জিডি, জেডএস

ওপরের তালিকায় দেখা যায়, ১৯৭৫ সালে ব্যক্তি খাতে ঋণ এবং জিডিপির অনুপাত ছিল ১.৯২ শতাংশ। এই অনুপাত পরবর্তী পাঁচ বছরে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে ৩.৮৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৭৭%। এই সময়ে দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্যের তেমন প্রসার ঘটেনি। ব্যাংকের সংখ্যাও সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর দেশ এক ভয়ংকর সংকটকাল অতিক্রম করছিল। এহেন পরিস্থিতিতে দেশের ব্যাংক ঋণের প্রসার কোনোভাবেই অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এর পেছনে একটিমাত্র কারণ ছিল যে, সেই সময়ের ক্ষমতাসীন সামরিক সরকার খুব দ্রুত বিপথগামী রাজনীতিবিদদের দলে ভেড়ানোর জন্য একটি সস্তা স্লোগান চালু করেছিলেন যে অর্থ কোনো সমস্যা নয়। আর এই অর্থ সহজ করার জন্য ব্যাংক ঋণ অবারিত করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থা থেকে দেশে শিল্প স্থাপনের নাম করে দেদার ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়, যা মূলত ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ এবং জিডিপির অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। আর এখান থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঋণদানের সংস্কৃতি, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর বর্ধিত দায়ও বর্তমান সরকারকেই নিতে হচ্ছে। গত শতাব্দীর আশির দশকে দেশে বেসরকারি ব্যাংকিং খাতের দ্রুত প্রসার ঘটার সঙ্গে দেশে ব্যাংক ঋণের পরিমাণও বেড়ে যায় অনেক গুণ। আশির দশকে ব্যাংক ঋণ এবং জিডিপি অনুপাত ৭.৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩.২২%। এই বৃদ্ধির হার ১৯৯১-৯৫ বিএনপি শাসনামলে প্রায় একই রাখে। ১৯৭৫ সালের পর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রথমবারের মতো ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে এই ব্যাংক ঋণের লাগাম অনেকটাই টেনে ধরতে সক্ষম হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগের সেই পাঁচ বছরের শাসনামলে ব্যাংক ঋণ এবং জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৩.৩০% অর্থাৎ এই হার ১৯৯৫ সালের ২০.৮৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে এসে দাঁড়িয়েছিল ২৪.১৮%। তবে বিগত প্রায় দেড় যুগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হয়। দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এবং শিল্পায়নে গতি আসার কারণে দেশে ব্যাংক ঋণের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে ব্যাংক ঋণ এবং জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে এসে দাঁড়ায় ৪৭.৮৮%, যা দেশের ব্যাংক খাতের দ্রুত অগ্রগতিরই সাক্ষ্য বহন করে। ২০২০ সালে এই অনুপাত অবশ্য কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪৫.২৫ শতাংশে নেমে আসে। এর মূল কারণ করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত বিশ্ব অর্থনীতির কারণে দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যাবসা-বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রে একধরনের স্থবিরতা নেমে আসে এবং এর প্রভাবে ব্যাংক ঋণও সংকুচিত হয়ে যায়।

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ

আমাদের দেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ব্যাংকিং খাতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খেলাপি ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। তবে স্বাধীনতার শুরুর দিকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ তেমন ছিল না। ব্যাংক ঋণের এই খারাপ প্র্যাকটিস শুরু হয় মূলত স্বৈরাচারী শাসনামল থেকে, যা পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। দেশে খেলাপি ঋণের সংস্কৃতি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর একটি খতিয়ান নিচে উল্লেখ করা হলো।

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ

বছর	খেলাপি ঋণ কোটি টাকা	মোট ঋণের শতকরা হার (%)
১৯৯১	৪৬.৫৪ হাজার কোটি টাকা	২৫%
১৯৯৬	১১০.৫৪ হাজার কোটি টাকা	৩১.৫০%
২০০১	২৩৫.৯৯ হাজার কোটি টাকা	৩১.৫০%
২০০৬	২০০.৯৮ হাজার কোটি টাকা	১৩.১৫%
২০১১	২৪৩.৮০ হাজার কোটি টাকা	৬.৫৯%
২০২১	৯৮.১৬ হাজার কোটি টাকা	৮.৬১%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন

ওপরের তালিকা অনুযায়ী ১৯৯১ সালে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬.৫৪ হাজার কোটি টাকা, যা মোট প্রদত্ত ঋণের ২৫ শতাংশ। এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ পরবর্তী ১০ বছর ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০০১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৩৫.৯৯ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩১.৫০ ভাগ। ২০০১ সালের পর থেকে এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং ২০১১ সালে এসে দাঁড়ায় ২৪৩.৮০ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ ৬.৫৯%। এই হার যদিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে এসে দাঁড়ায় ৮.৬১%; কিন্তু মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালে ২৪৩.৮০ হাজার কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৯৮.১৬ হাজার কোটি টাকায় উপনীত হয়।

ওপরের তালিকায় ১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যে অস্বাভাবিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ দেখা দেয়, এর পেছনে কিছু বাস্তব কারণ এবং কিছু কাগুজে গরমিল আছে। আশির দশকের শুরু থেকে বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর নির্বিচারে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার বড়ো একটি অংশ পরবর্তী সময়ে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়। তাছাড়া সামরিক শাসনামলে বিশেষ করে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে অর্থ কোনো সমস্যা নয় (মানি ইজ নো প্রবলেম) স্লোগানের অধীনে যেসব রাজনৈতিক ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল, এর অধিকাংশই ওই নব্বইয়ের দশকে এসে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়। তাছাড়া গত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি দেশের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়। আর এই রিফর্ম প্রোগ্রামের অধীনে সিএল বা ক্লাসিফিকেশন অব লোন অর্থাৎ ঋণের শ্রেণিবিন্যাস চালু করা হয়। এই সিএল রিপোর্ট যখন নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে তৈরি করা হয়, তখন তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়নি। বলা চলে, নব্বইয়ের দশকের পুরোটা সময় একধরনের পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতেই এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ফলে এই সময়ে সিএল রিপোর্টে যে পরিমাণ খেলাপি ঋণ প্রদর্শন করা হয়েছে, তা প্রকৃত খেলাপি ঋণের চিত্র তুলে ধরেনি। বিগত দেড় যুগে দেশে বিচ্ছিন্ন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটলেও সার্বিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং মোট ঋণের ১০ শতাংশের

নিচেই বিরাজ করছে। যদিও একটি মানসম্পন্ন ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য এই খেলাপি ঋণের হার পাঁচ শতাংশের নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সঠিক খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনার অভাবে সেটি সম্ভব হয় না। তবে এই হার ১০ শতাংশের নিচে রাখতে পারলেও তা সন্তোষজনক হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই খেলাপি ঋণের হার ১০ শতাংশের নিচে রাখার পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের যথেষ্টই অবদান আছে। তারা ঋণ পুনঃতপশিল এবং বৃহৎ ঋণ রি-স্ট্রাকচার করার অস্ত্র খুব ভালোভাবেই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার অধীনে সিএলের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ নির্ণয় কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। আর এ কারণেই দেশে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেবে দেখা উচিত।

আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমাদের ব্যাংকিং খাতে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা এককথায় অভাবনীয়। কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। কেননা দেশের অভ্যন্তরে এর অগ্রগতি সাধিত হলেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্টই পিছিয়ে আছে। অথচ সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে খুব সহজেই এই খাতকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

দেশের ব্যাংকিং খাতকে বলা হয় অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালনের ধমনি। দেশের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার ক্রমাগত স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং শতবর্ষব্যাপী ডেল্টা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে দেশে অবশ্যই আধুনিক ও টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক আলোচনা ও সমালোচনা সত্ত্বেও এটি একটি বাস্তব সত্য যে দেশে রয়েছে বৃহত্তম ব্যাংকিং খাত, যেখানে অর্ধশতাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং শতাধিক নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান চালু আছে। কিন্তু ব্যাংক পরিচালনায় সুশৃঙ্খল নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। আর এই নিয়মনীতি অনুসরণে যথেষ্ট শৈথিল্যের কারণেই আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক নিচে নেমে গেছে। বৈদেশিক লেনদেন পরিশোধে আমাদের ব্যাংকগুলোর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে আমাদের দেশের ব্যাংক ঋণপত্র খুলে বা ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে এর বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করেনি এমন নজির বিরল। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ব্যাংকগুলো কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা গ্যারান্টি উন্নত বিশ্বে গৃহীত হতে চায় না। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের রেটিং উন্নত হলেও ব্যাংকগুলোর রেটিং নিম্নগামী। এ কারণে অধিকাংশ ব্যাংক কাউন্টার পার্টি লিমিট তো দূরের কথা, করেসপনডেন্ট সম্পর্কও অনেক ক্ষেত্রে টিকিয়ে রাখতে পারছে না। অথচ বর্তমানে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া একান্ত জরুরি। কাজটা যে খুব কঠিন তা নয়, কেননা এজন্য যেসব অর্থনৈতিক পূর্বশর্তের প্রয়োজন। এর অধিকাংশই বর্তমানে অনুকূলে আছে। যেখানে ব্যাসেল তিন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, সেখানে দেশের ব্যাংকিং খাতকে কেন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের কাছাকাছি নেওয়া যাবে না। অবশ্যই যাবে, প্রয়োজন শুধু কিছু যুগোপযোগী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

খেলাপি ঋণ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন

আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ একটি বড়ো সমস্যা এবং এই খেলাপি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত উদ্‌বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। খেলাপি ঋণ নির্ণয় করা হয় সিএল (ঋণ শ্রেণিবিন্যাস) পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই সিএল প্রচলিত হয়েছিল গত শতকের আশির দশকে এবং তাও কিছু বিদেশি বিশেষজ্ঞের সুপারিশের ভিত্তিতে। এই সিএল এবং এর প্যারামিটারগুলো যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা অনেক ভালো ঋণকেও যেমন খেলাপি ঋণে রূপান্তর করে, আবার অনেক খারাপ ঋণকেও ভালো ঋণের কাতারে ফেলে দেয়। আমাদের দেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যাংকার একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন যে, ব্যাংকগুলো ঋণের টাকা ফেরত চাইলে ঋণগ্রহীতারা তা ফেরত দিতে পারবে না। বিশ্বের কোনো দেশের ঋণগ্রহীতাই ঋণের অর্থ ঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারবে না। আমেরিকা, কানাডার মতো দেশে যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্রেডিট কার্ড ঋণ, বন্ধকি (মর্টগেজ) ঋণ বা ব্যাবসায়িক ঋণ রয়েছে, তা যদি এখানকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহকদের ফেরত দিতে বলে, তাহলে শুধু সেই ঋণগ্রহীতা নয়, পুরো দেশ দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। আর সে কারণেই তারা কখনো প্রদত্ত ঋণের টাকা ফেরত চাওয়ার কথা ভাবে না বা এর ভিত্তিতে খেলাপি ঋণও নির্ধারণ করে না। উল্লেখ্য, কোনো মেয়াদি (টার্ম) ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তিতে অন্য আরেকটি নতুন মেয়াদি ঋণ নিয়ে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে দেয়, যাকে এই দেশের ব্যাংকিং পরিভাষায় নতুন ডিল ক্লোজ করে পুরোনো ডিল টারমিনেট করা বলা হয়ে থাকে। কোনো প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন। তবে এসব দেশের ব্যাংকগুলো একটি বিষয় নিশ্চিত করে থাকে যে, ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদসহ প্রতিমাসের ন্যূনতম প্রদেয় অর্থ সত্যিকারভাবেই ব্যাংকে পরিশোধ করতে হবে। আর এর ওপর ভিত্তি করেই ভালো বা মন্দ ঋণ নিরূপণ করা হয়ে থাকে। একবার খেলাপি ঋণ চিহ্নিত হওয়ামাত্র পুরো ঋণের পরিমাণ প্রভিশন করে ফেলা হয়। এই প্রচলন আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একেবারেই অনুপস্থিত।

করপোরেট গভর্নেন্সের প্রয়োগ প্রয়োজন

ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে করপোরেট গভর্নেন্স মোটেই সন্তোষজনক নয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পেশাদার লোকের অন্তর্ভুক্তি নেই বললেই চলে। পরিচালনা পর্ষদ নীতি প্রণয়নের চেয়ে ঋণ অনুমোদনসহ নানাবিধ দৈনন্দিন কাজেই বেশি তৎপর থাকে, যা করপোরেট গভর্নেন্সের পরিপন্থি। বর্তমানে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের যুগে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর বা অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা, রিয়াল টাইম রিকনসিলিয়েশনের প্রবর্তনসহ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের সৌভাগ্য–এমন একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, যিনি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা আমাদের দেশেই শুধু নন, সমগ্র বিশ্বেই একজন সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যোগ্যতম রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে পরিচিত। তাঁর যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা সমগ্র বিশ্বেই দারুণভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সাহসী সিদ্ধান্ত এবং সঠিক দিকনির্দেশনার কারণেই দেশের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং দেশ শীঘ্রই মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালই হবে দেশের অর্থনীতির স্বর্ণযুগ। তাই তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতকেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উপনীত করার কোনো বিকল্প নেই এবং তা খুব অনায়াসেই সম্ভব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর তেমনটা করতে পারলেই আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের ব্যাংকিং খাতে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, তা ষোলোকলা পূর্ণ হবে।

লেখক: সিপিএ, সিএমএ, সিএমএস, ব্যাংকার
কমপ্লায়েন্স স্পেশালিস্ট এবং কলাম লেখক, টরেনটো, কানাডা

প্র ব ন্ধ

পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি

আলী হাবিব

২ ৬ মার্চ ১৯৭১। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ধর্মের ভিত্তিতে গড়া পাকিস্তান ভেঙে যায়। অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে আজ কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি। কাঙ্ক্ষিত উদারনৈতিক পরিবেশ কি নিশ্চিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশে? রাজনৈতিক দলগুলো কতটা প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে পেরেছে বাংলাদেশের রাজনীতিকে?

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির অগ্রযাত্রায় সাত দশকেরও বেশি সময় একই সমান্তরালে পথ হেঁটেছে। নেতৃত্ব দিয়েছে সব আন্দোলন-সংগ্রামে। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা অর্জন–বাঙালিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে দলটি। সংগঠিত করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর আত্মনির্ভরশীল হওয়ার কঠিন লড়াইয়েও বাঙালির ঐক্য ধরে রাখার কাজটি করেছে এই দল। অর্জন করেছে জনমানুষের আস্থা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বারবার প্রতিষ্ঠানের কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "...কোথায়ও হল বা জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন সাহেবের রোজ গার্ডেন বাড়িতে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছিল।...সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হলো 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'।...আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নেই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু ম্যানিফেস্টো থাকবে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী', পৃ. ১২১-১২২)। বাঙালির নিজস্ব

রাজনৈতিক তথা পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসাবেই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা পায়।

'...সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নেই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে...।' অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো বলে দেয় শুরু থেকেই দলটি অসাম্প্রদায়িক। জন্মলগ্নেই সংস্কারে বিশ্বাসী। অভিধান মতে, সংস্কার হচ্ছে উৎকর্ষসাধন। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজ শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ। একই সঙ্গে দলটি পরিশীলিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে আধুনিক।

শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে প্রতিষ্ঠা পেলেও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ১৯৫৫ সালে কাউন্সিলের মাধ্যমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। নতুন নামকরণ হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'। নয়াদিল্লির ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের সিনিয়র ফেলো শ্যামলী ঘোষ লিখেছেন, "১৯৫৫ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হলে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার জন্য দলের সদস্যপদ লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯৫৩ সালের জুলাইয়ে কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বপ্রথম বিষয়টি উত্থাপিত হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভাসানী কর্তৃক জনমত যাচাই না হওয়া পর্যন্ত প্রশ্নটি অমীমাংসিত থাকে। ...যুক্ত নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের যে দাবি ছিল তারই অনুসরণে দলের ধর্মনিরপেক্ষতাকরণে বিষয়টি ছিল একটি পদক্ষেপ।" (আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১: শ্যামলী ঘোষ, পৃ. ২২)। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলকে একটি অসাম্প্রদায়িক হিসাবে রূপান্তর করা হয়। তখন এটি নিঃসন্দেহে ছিল একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা নিঃসন্দেহে একটি বড়ো রাজনৈতিক উত্তরণ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূলনীতি হচ্ছে: 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি।' লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা। ২. প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা। ৩. রাষ্ট্রের সব নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা। ৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। ৫. বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে তুলে ধরা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান। এক দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটে এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। সত্তরের নির্বাচনের পর এদেশের মানুষ একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে তিন বছর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াতে শিখেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর রাষ্ট্রভাবনায় পরিবর্তন ঘটান এবং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে মিলিয়ে একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। আওয়ামী লীগের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। তার রাজনৈতিক চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসূচি ও লক্ষ্য পালটে যায়। এবার তাঁর কর্মসূচি ছিল শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ পৌঁছতে পারলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটত বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা। সময়ের প্রয়োজনে এটিও একধরনের রাজনৈতিক সংস্কার।

'...সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নেই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে...।' অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো বলে দেয় শুরু থেকেই দলটি অসাম্প্রদায়িক। জন্মলগ্নেই সংস্কারে বিশ্বাসী

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি গড়ে ওঠে অসাম্প্রদায়িক সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল হিসাবে। আর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দলটি মডার্ন ও সেকুলার ডেমোক্রেটিক পার্টি। যে কোনো সংকটে আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি আছে এবং নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় নতুন নেতা তৈরির সক্ষমতা আছে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর চরম নেতৃত্বহীন অবস্থায়ও দলটি নতুন নেতৃত্ব তৈরিতে সক্ষমতা দেখিয়েছে। হাসিনা-নেতৃত্ব উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে যখনই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে, তখনই বাংলাদেশের মানুষ লাভবান হয়েছে। গত ১২ বছরে অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের দৃষ্টি কেড়েছে। বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে একটি উন্নয়নের রোল মডেল।

২০২১ সালে আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করছি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছেন।

দিয়েছেন শতবর্ষব্যাপী ডেল্টা প্ল্যান। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাত ধরে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য পূরণের পথে পা রেখেছে।

বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শোষিতের গণতন্ত্র। সেই অসাম্প্রদায়িক উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি দেশের মানুষের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাঙালির রাজনৈতিক বাতিঘর। বাঙালির রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের পথে ইতিবাচক আলো ফেলেছে এই ঐতিহ্যবাহী দলটি। পথের বাধা সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করেছে। পাশে থেকেছে। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক আদর্শে প্রাণিত গণমুখী ইতিবাচক রাজনীতি আজ একান্তই অনিবার্য।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

সিনিয়র সাংবাদিক গাজীউল হাসান খান তার সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'দলীয়ভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে বিএনপি। এই দলটিকে হয় আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, নতুবা এর অস্তিত্ব নিভুনিভু প্রদীপের মতো আরও ম্রিয়মাণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। এক-এগারোর পর থেকে কিংবা ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর থেকে বিএনপির রাজনীতিতে দেখা দেয় বিভিন্ন সাংগঠনিক জটিলতা। ২০০৮-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আজ পর্যন্ত ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিগত ১৩ বছরে সাংগঠনিকভাবে না ঘর গোছাতে পেরেছে বিএনপি, না জনগণকে টেনে আনতে পেরেছে গণ-আন্দোলনের কোনো কার্যকর পথে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'দেশের আপামর মানুষ অবশ্যই প্রশ্ন করার অধিকার রাখে–বিএনপি কেন ক্ষমতার রাজনীতি করে কিংবা বিএনপি কেন আবার ক্ষমতায় যেতে চায়? ক্ষমতায় গেলে তারা জাতীয় উন্নয়ন বা সমৃদ্ধির জন্য আর কী কী পরিকল্পনা হাতে নেবে? মানুষের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা কতটুকু করতে চায়? পাশাপাশি দুর্নীতি উচ্ছেদ ও দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ করতে কী কী ব্যবস্থা নেবে, তা মানুষকে জানাতে হবে। উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কী ব্যবস্থা নেবে, তা-ও জানাতে হবে দেশের মানুষকে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার ও পরিবেশদূষণ রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মাঝেমধ্যে সেমিনার কিংবা আলোচনাসভার আয়োজন করে বিএনপি জনমনে প্রচুর উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে।' তার মতে, 'ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপির অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা মারা গেছেন গত ১৩ বছরে। সে স্থানে অপেক্ষাকৃতভাবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন তরুণ নেতৃত্ব গড়ে তোলা উচিত ছিল, যা আশানুরূপভাবে ঘটেনি।' আগামী নির্বাচনের আগে দলের ইউনিয়ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন গাজীউল হাসান খান। তিনি লিখেছেন, 'সত্তর ও আশির দশকে বিএনপি যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করত, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তাতে এখন যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে।' বিএনপি প্রকৃত রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা অর্থে আওয়ামী লীগের চেয়ে বড়ো জাতীয়তাবাদী নয় বলেও মনে করেন তিনি।

বিএনপির অনেক নেতা ও বিএনপিপন্থি বহু বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময় বলে থাকেন যে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একটি দল। কিন্তু তারা কখনোই পরিষ্কার করে বলেন না তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি আসলে কী? তারা কোন অর্থে একটি জাতীয়তাবাদী দল? বিএনপির আদর্শভিত্তিক বাস্তব কর্মসূচি কী হতে পারে, তা নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা নেই, দেশব্যাপী কর্মসূচি নেই, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের সামনে যুগোপযোগী কোনো রূপকল্প তুলে ধরা হচ্ছে না। গাজীউল হাসান খান মনে করেন, 'রাজনীতিগতভাবে বিএনপির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, সামনের পথ অতি বন্ধুর। সে অবস্থায় বিএনপির আদর্শভিত্তিক বাস্তব কর্মসূচি কী হতে পারে, তা নিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা নেই, দেশব্যাপী কর্মসূচি নেই, দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে জনগণের সামনে যুগোপযোগী কোনো রূপকল্প তুলে ধরা হচ্ছে না।'

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মনে করেন, 'বাংলাদেশে বিএনপির রাজনীতির ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যাচার। সেই সঙ্গে তারা হিংসা ও সন্ত্রাসকেও যুক্ত করেছিল। ফলে দেশের মানুষ তাদের হিংসার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে।' বিএনপিতে দলবদ্ধ মিথ্যাচার বেড়েছে বলে মনে করেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে বিএনপি চেষ্টা করছে জিয়াউর রহমানকে তার স্থানে বসানোর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।' ইতিহাস বিকৃত করতে গিয়ে এবং একজন খলনায়ককে মহানায়কের পদে বসানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আজ বিএনপির এই দুরবস্থা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মনে করেন, 'বিএনপিকে খাড়া করতে হলে জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের গত ৪০ বছরের অনাচার-অত্যাচার ও শোষণ-পীড়নের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।' তার মতে, 'ইতিহাস বিএনপির বিরুদ্ধে। ইতিহাস বিকৃত করতে গিয়ে তারা ব্যর্থ হয়েছে।'

অনেকে মনে করেন, বিএনপির সামনে অনেক সম্ভাবনা ছিল। অথচ বিএনপি জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীনতার শত্রু, বিশেষ করে জামায়াতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ থেকে স্বাধীনতার ভিত্তিগুলোই ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরে কোনো কর্মসূচি দেশের মানুষের সামনে হাজির করেনি। দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত হয়–এমন কোনো কর্মসূচি নেয়নি। ফলে দলটি প্রকৃত রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে ওঠেনি। জামায়াতের সঙ্গে জোট পাকিয়ে হয়েছে ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের একটি দল। আদর্শবাদী তরুণরা এই দলের দিকে এগিয়ে আসেনি।

পাকিস্তানি মতাদর্শে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' তত্ত্ব নিয়ে এবং 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা বিএনপি শেষ পর্যন্ত হাত মিলিয়েছে যুদ্ধাপরাধী শক্তির সঙ্গে। ধর্মাশ্রয়ী, সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থিদের পৃষ্ঠপোষক হতে গিয়ে দলটির বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের কোঠায়।

তবু বিএনপি এখনো দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। নির্বাচন করে এই দলটি ক্ষমতায়ও গেছে। এখন তারা দীর্ঘকাল ক্ষমতায় নেই।

বাম দল ও অন্যান্য

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাম দলগুলোর অবদান খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। পঞ্চাশের দশকে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ধারণে সাহায্য করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র গঠনে সাহায্য

জুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। ছয় দফার আন্দোলনে ১১ দফার শক্তি যোগ করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের কথা, ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের কথা আওয়ামী লীগ এখনো বলে। এই পর্যবেক্ষকরাই আবার প্রশ্ন করেন, আওয়ামী লীগের বিকল্প গণতান্ত্রিক দল, বিকল্প গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টি আজ পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারেনি কেন? ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ, বাসদ কী করল? উপমহাদেশের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশে বামধারার রাজনীতি গণমুখী কর্মসূচি নিয়ে সাধারণের কাছে যেতে পারেনি। তাদের তত্ত্বনির্ভর রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক তত্ত্ব মানুষকে আকৃষ্ট করেছে বলে মনে হয় না।

সমাজতান্ত্রিক পথ তৈরির দায়িত্ব তো কমিউনিস্ট ও তাদের সমমনা দলগুলোর। তাদের আন্তর্জাতিক সংযোগও আছে। তাদের শক্তিশালী শ্রমিক ফ্রন্ট, ছাত্রফ্রন্ট ছিল। আজ তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কেন? আওয়ামী লীগের মতো বড়ো দলের সহযোগিতা ছাড়া ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন একটা জাতিকে তারা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রের পথে কি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?

> সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ও বিশেষ কোনো ধর্ম পালনের কারণে ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য লোপ করা হবে বলে অঙ্গীকার ছিল

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে। ৫০ বছর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম এখন একটি বড়ো ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলী রীয়াজ ২০১৩ সালে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় লেখেন, 'বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালের পর জামায়াতে ইসলামী এবং ১৯৮১ সালে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহর (হাফেজ্জি হুজুর) রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়ার মধ্য দিয়ে কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ইসলামপন্থিরা রাজনীতিতে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে। জিয়া ও এরশাদের আমলে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য, সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান, রাষ্ট্রধর্মের ঘোষণা এবং একই সময়ে প্রধান দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আশ্রয়-প্রশ্রয় যেমন জামায়াতে ইসলামীকে শক্তিশালী করেছে, তেমনই কওমি মাদ্রাসার প্রসারের কারণে মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামপন্থি দলগুলোর ভিত্তি জোরালো হয়েছে। সামরিক শাসকরা তাদের অবৈধ শাসনকে বৈধতা দিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির শরণাপন্ন হয়েছেন, অন্যদিকে ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে নির্বাচনি রাজনীতির অতিসরলীকৃত অঙ্কের বিবেচনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছে। দলগুলোর আচরণ থেকে মনে হয়, তাদের এই ধারণা হয়েছে যে সাধারণ মানুষের ধর্মানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার প্রমাণ দিতে হলে ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে সব সময় তাদের সঙ্গে রাখা দরকার।' ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয়, ধর্মভিত্তিক দলগুলোর বিষয়ে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আপসমুখী অবস্থান, এসব দলকে আশু স্বার্থে ব্যবহারের জন্য মরিয়া ভাব, ধর্মভিত্তিক দলের আড়ালে ও নামে সহিংসতার ব্যাপক বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির চেহারা বিষয়ে উদ্‌বেগ যৌক্তিক বলেই মনে করেন তিনি। এটা ঠিক যে বিভিন্ন কারণে ও প্রক্রিয়ার ফসল হিসাবে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে। সামাজিক জীবনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী হলেও বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার দেখতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক আলী রিয়াজ। নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, '১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার ও বিশেষ কোনো ধর্ম পালনের কারণে ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য লোপ করা হবে বলে অঙ্গীকার ছিল। তদুপরি সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে– রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করার বা তাদের সদস্য হওয়ার বা অন্য কোনোভাবে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকবে না। ১৯৭৭ সালের প্রোক্লেমেশন অর্ডার নম্বর ১-এর মাধ্যমে সংবিধানের ধর্মীয় ১২ সম্পূর্ণভাবে ও ৩৮ অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ বিলোপ করা হয়।'

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মভিত্তিক দল এবং ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সমাধান হঠাৎ করে পাওয়া যাবে না বলে মনে করলেও আশাবাদী হতে চান আলী রিয়াজ। তিনি লিখেছেন, "চারটি নির্বাচনে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে এই সমর্থনের পরিমাণ অত্যন্ত কম; নির্বাচনি হিসাবে সব ইসলামপন্থি দল মিলে গড়ে ৮ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। বাংলাদেশের মানুষ এখনো ধর্মকে 'রাজনৈতিক আদর্শ' হিসাবে বিবেচনা করে না। তাদের কাছে সামাজিক জীবনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী; কিন্তু সেই গুরুত্ব যত বিশালই হোক না কেন, রাজনীতিতে তারা ধর্মের ব্যবহার দেখতে চায় না; ধর্মভিত্তিক দলকে তাদের যথাযথ প্রতিনিধিও মনে করে না।"

স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে উত্তরণ প্রত্যাশিত ছিল, তা কি হয়েছে? না হয়ে থাকলে এর কারণ কী? নেপথ্যে কি শুধুই দলগুলোর ব্যর্থতা? নাকি আন্তর্জাতিক চক্রের কারসাজিও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে–এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আরও ৫০ বছর নিশ্চয় অপেক্ষা করতে হবে না।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, ছড়াকার

আমাদের ক্রীড়াঙ্গন ও বঙ্গবন্ধু পরিবার

পবিত্র কুন্ডু

২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর স্মারক। ২০২১ সাল দেখছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশতম জন্মজয়ন্তী। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দুটি জয়ন্তীরই উদ্‌বোধক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। হয়তো নিয়তিরই নির্দেশ ছিল যে– ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য এই মেলবন্ধনের সময় বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারের হাতেই থাকবে দেশের শাসনভার।

নিয়তি হয়তো এটাও চেয়েছিল যে, দেশের ইতিহাসের খেরোখাতায় যখন ৫০ বছরের খতিয়ান লেখা হবে, তাতে যেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর উত্তরসূরির অবদানই আলো ছড়ায়। আর সে আলো থাকুক জনজীবনের সবখানে। দেশের অর্থনীতি চাঙা থাকুক। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা–সব মৌলিক চাহিদা স্বচ্ছন্দে পূরণ হয়ে উন্নতি ঘটুক মানুষের জীবনমানের। আজ সেটা সত্যি। স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে। দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী ঘাতকদের নির্মম বুলেট জীবন কেড়ে নেওয়ার আগে যে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মতো সময় পেয়েছিলেন, তার মধ্যেই বাংলাদেশকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর কাঠামো তৈরি করে ফেলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে শেখ হাসিনাই জাতির পিতার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল– এই পাঁচ বছরে অনেক কাজ শেখ হাসিনার সরকার করেছে; কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। ২০০৯ সালে ভূমিধস বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে নিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। এরই ফলে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া। সবক্ষেত্রেই যখন উন্নয়ন হয়, ক্রীড়াঙ্গনও

আলাদা থাকতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর হাতে ভিত্তি পাওয়া বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন শেখ হাসিনার ভালোবাসায় আজ যেন ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে।

অনন্য এক ক্রীড়ামোদী পরিবারে জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধু নিজে খেলোয়াড় ছিলেন। খেলতেন ফুটবল, ভলিবল, হকি। বাবা শেখ লুৎফর রহমানও ফুটবল খেলতেন। বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীতেই (অসমাপ্ত আত্মজীবনী) লিখে গেছেন স্কুলজীবনে বাবার প্রতিপক্ষ দলের হয়ে ফুটবল ম্যাচও খেলেছেন গোপালগঞ্জে। পরবর্তীকালে ঢাকায় এসে খেলেছেন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে। খেলতেন ফরোয়ার্ড হিসাবে। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের অফিস ঘরে গেলে দেওয়ালে দেখা যায় ফুটবলার বঙ্গবন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল ছবি। এই ছবিটি অ্যালবামে জায়গা পেতে না পেতেই অবশ্য মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন বঙ্গবন্ধু। মানুষের মুক্তিকামী রাজনীতির ঝড়ো হাওয়ায় খেলার মাঠে আর থাকা সম্ভব ছিল না। পরে তো সর্বোচ্চ বিজয় অর্জন করেছেন রাজনীতি আর আন্দোলনের মাঠে, স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে।

তবে সব সময়ই বঙ্গবন্ধুর সহৃদয় পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছে ক্রীড়াঙ্গন, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থেকেছেন ক্রীড়াবিদরা। যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যাওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্রীড়াদলকেই তিনি ডেকে নিতেন গণভবনে। তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন। সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের স্নেহস্পর্শে ভীষণই অনুপ্রাণিত হতেন খেলোয়াড়রা। ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে মালয়েশিয়ার মারদেকা ফুটবল টুর্নামেন্টে যাওয়ার আগে জাতীয় দলকে ডেকে নিয়েছিলেন গণভবনে। ফ্রেমবন্দি সেই মুহূর্তগুলোয় বাঙ্ময় বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাস।

পারিবারিক ক্রীড়াধারা সঞ্চারিত ছিল বঙ্গবন্ধুর বড়ো দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামালের মধ্যেও। বড়ো ছেলে শেখ কামাল ফুটবল খেলেছেন, বাস্কেটবল খেলেছেন, ক্রিকেটে মাঠ মাতিয়েছেন, খেলেছেন ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন, অংশ নিয়েছেন অ্যাথলেটিকসে। চাইলে কতকিছু হতে পারতেন শেখ কামাল। রাজনীতিতে ঢুকে বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। ব্যাবসাবাণিজ্য কবজা করে বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হতে পারতেন। এসবের কিছুই করেননি তিনি। পরিবর্তে সমমনা বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন আবাহনী ক্রীড়াচক্র নামে একটি ক্লাব। কালক্রমে যা আজকের আবাহনী লিমিটেড। আবাহনী আসলে বাংলাদেশে একটি ক্রীড়া আন্দোলনের নাম। আবাহনীর মাঝেই অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন শেখ কামাল। বঙ্গবন্ধুর মেজো ছেলে শেখ জামাল ঢাকার ক্লাব ফুটবলে দাপটের সঙ্গে খেলেছেন ধানমন্ডির হয়ে, যে ক্লাব এখন পরিচিত লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড নামে। বড়ো মেয়ে শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বে পরিচিত মানবতার জননী নামে, তিনিও ভীষণ ক্রীড়ানুরাগী। ছোটো ভাই শেখ কামালের আবাহনী ক্রীড়াচক্র প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁরও ছিল অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকা। শেখ কামালের জীবনসঙ্গী হিসাবে যিনি ঢুকেছিলেন এই পরিবারে, তিনিও প্রতিভাদীপ্ত এক ক্রীড়াবিদ, দেশের অ্যাথলেটিকসের 'ড্রিম গার্ল' সুলতানা আহমেদ (কামাল)।

নিজে ক্রীড়াপ্রেমী তো বটেই, তারওপর বাবার উত্তরাধিকার ও ভাইয়ের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাঁর কারণেই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আজ অনেক অর্জনের আলো। এমন একজন ক্রীড়াপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান পাওয়া যে কোনো দেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্যই আশীর্বাদ। বিদেশে গেলেও অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, এমন ক্রীড়া অন্তঃপ্রাণ রাষ্ট্রনায়ক সচরাচর দেখা যায় না!

২০১৯ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার প্রেসিডেন্ট গিয়ান্নি ইনফান্তিনো সংক্ষিপ্ত সফরে এলেন বাংলাদেশে। ফিফায় নিজের পুনর্নির্বাচনের ভোট জোগাড়ই এ সফরের উদ্দেশ্য। কাজ ছিল মূলত বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে। তিনি প্রথমেই দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইনফান্তিনোর মুখে রইল শুধুই শেখ হাসিনার প্রশস্তিগাথা, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ ক্রীড়াপ্রেমী। তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টার আলোচনায় দারুণ প্রাণশক্তি নিয়ে ফিরেছি।'

পরের মাসেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দল দিবারাত্রির টেস্ট ম্যাচ খেলতে যায় ভারতে। বাংলাদেশ-ভারত দুদেশেরই প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে প্রধান অতিথি হিসাবে ঘণ্টা বাজিয়ে ঐতিহাসিক ম্যাচের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। প্রথম দিনের পুরোটা খেলা দেখেন প্রেসিডেন্ট বক্সে বসে। দিনের খেলা শেষে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁর মুগ্ধতা, 'কী আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়েই না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরোটা দিনের খেলা দেখলেন! তিনি অসাধারণ এক মানুষ।'

বাংলাদেশের স্টেডিয়ামগুলো অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এভাবেই দেখে আসছে। তামিম, সাকিব, মুশফিকদের ব্যাটে চার দেখলে তিনি শিশুতোষ উচ্ছলতায় হাততালি দেন। সাকিব-মোস্তাফিজরা উইকেট তুললে পতাকা দোলান। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন ক্রিকেট। ফুটবল দেখতে এসেও একইরকম সপ্রাণ তিনি স্টেডিয়ামে, বাংলাদেশের পক্ষে কেউ একটা গোল করলেই উচ্ছ্বসিত। খেলোয়াড়রা সব সময়ই তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তাঁর কথায় উদ্বুদ্ধ। বাংলাদেশ দল যে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ পায় প্রধানমন্ত্রীর। নিজেই কথা বলেন অধিনায়ক, কোচ বা ম্যানেজারের সঙ্গে। ব্যক্তিগতভাবেও খোঁজখবর নেন খেলোয়াড়দের।

মাঠে উপস্থিত থাকলে তো জয়ের পর সরাসরিই দলকে শুভেচ্ছা জানান। আর বিদেশের মাঠে এমন কোনো ঘটনা নেই যখন ম্যাচ জিতে প্রধানমন্ত্রীর ফোন পাননি অধিনায়ক। প্রধানমন্ত্রীর এমন আন্তরিক অনুপ্রেরণা পেলে খেলোয়াড়রা জীবনবাজি রেখে খেলতে রাজি। খেলার মাঠে আমরা প্রতিনিয়তই পেয়ে চলেছি এমন উদাহরণ।

দেশের মাঠে আয়োজিত যে কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে আসেন শেখ হাসিনা, আসেন পুরস্কার বিতরণীতেও। হোক সেটি জাতীয় দল বা বয়সভিত্তিক দলের টুর্নামেন্ট। মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্টে তাঁর উপস্থিতি অবধারিত। নারীজাগরণ বা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে উদ্যোগী প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে বাংলাদেশের মেয়েদের ফুটবল এক দশকেই এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ।

এ তো গেল আত্মিক বা মানসিক প্রণোদনা। শেখ হাসিনার মতো আর্থিক প্রণোদনাও আগের কোনো সরকারপ্রধান বা সরকারের কাছ থেকে পায়নি খেলোয়াড়রা কিংবা ক্রীড়া সংগঠনগুলো। যে কোনো আন্তর্জাতিক সাফল্যেই খেলোয়াড়রা পুরস্কার পাচ্ছেন নগদ অর্থ, ফ্ল্যাট বা প্লট (জমি)। নেতিবাচক মানুষ যতই এ নিয়ে সমালোচনা করুক, গণমানুষের এই নেত্রী ঠিকই জানেন পুরস্কার হলো ভালো কাজের স্বীকৃতি, আর স্বীকৃতি মানুষের সামনে খুলে দেয় বড়ো সাফল্যের সোনালি দুয়ার।

১৯৯৭ সালের আইসিসি ট্রফি জয়ের পর জাতীয় জীবনে যখন অভূতপূর্ব ঐক্যের সুর, ছড়িয়ে পড়ে গৌরবদীপ্ত এক সাফল্যের রং, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ক্রিকেট দলকে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে দেন গণসংবর্ধনা। প্রতিটি খেলোয়াড় একখণ্ড করে জমি উপহার পান প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। আইসিসি ট্রফির সাফল্যই ছিল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতামান। ওই দলটাই ১৯৯৯

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে নবীন হিসাবে পেয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য, হারিয়েছে পাকিস্তানের মতো পরাশক্তিকে।

২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজজয়ী মাশরাফি মুর্তজার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দলকে সংবর্ধনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ওঠা ওয়ানডে দল এবং শ্রীলঙ্কার নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে খেলা টি-টোয়েন্টি দলকে ৫০ লাখ করে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেন। মেয়েদের ফুটবল দলও অর্থ পুরস্কার পেয়েছে। ওই বছরই ৩৩৯ জন ক্রীড়াবিদকে ১ লাখ টাকা করে অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন। ২০১৬ গুয়াহাটি-শিলং দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে চারটি সোনার পদকজয়ী সাঁতারু মাহফুজা আক্তার, ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার ও শুটার শাকিল আহমেদকে উপহার দিয়েছেন একটি করে ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট। এই উপহার পেয়ে ওরা চারজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পেয়ে মাবিয়া আপ্লুত, 'প্রধানমন্ত্রীর মতো মানুষ হয় না। আমাদের সৌভাগ্য যে ওনার মতো একজন নেত্রী আমরা পেয়েছি। খেলোয়াড়দের জন্য সব সময় ওনার প্রাণ কাঁদে।'

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আর্থিক প্রণোদনা বা পুরস্কার পেয়েছেন এমন খেলোয়াড়ের তালিকাটা এত বড়ো যে তা ছোটো পরিসরে লিখে শেষ করা যায় না। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান বিশ্ব র‍্যাংকিং প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে টোকিও অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন তিরন্দাজ রোমান সানা। কিন্তু অসাধারণ এই সাফল্যে তেমন হইচই না ওঠায় রোমানের মন আচ্ছন্ন হয় হতাশায়। অনুযোগ করেন, বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট বা ফুটবল ছাড়া ছোটো খেলায় সাফল্যের মূল্য দিতে জানে না। এই খবর কীভাবে যেন পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের মাধ্যমে রোমানকে গণভবনে ডেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাকে মিষ্টিমুখ করান। তার অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার জন্য দেন পাঁচ লাখ টাকা। গণভবন থেকে বেরিয়েই রোমান বলেন, 'এরকম একজন প্রধানমন্ত্রী থাকলে দেশের খেলাধুলা এগিয়ে যাবেই।'

১৯৯৬ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েই দেশের ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেন শেখ হাসিনা। ওই সময়েই গড়ে ওঠে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামসহ আরও অবকাঠামো। অনেক অবকাঠামোর সংস্কার সাধনও হয় ওই সময়।

২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করে গড়েছেন দৃষ্টিনন্দন সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়ামসহ আরও অনেক ক্রীড়া অবকাঠামো। মা-বাবার সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যার শিকার ছোটো ভাই শেখ রাসেলের নামে ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নেন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়ে। এ পর্যন্ত ৩১৭টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ শেষ হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঢাকার নতুন শহর পূর্বাচলে ৩৭.৫ একর জমিতে শুরু হয়েছে ৭০ হাজার ধারণক্ষমতার শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ। কক্সবাজারে ৪৯.২ একর জায়গায় শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং মানিকগঞ্জে ২৫ একর জায়গার ওপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই ৫টি জাতীয় স্টেডিয়াম, ৪টি বিভাগীয় স্টেডিয়াম, ৬২টি জেলা স্টেডিয়াম এবং থানা পর্যায়ে ৫টি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্মাণ ও সংস্কার মিলিয়ে ঢাকাসহ সারা দেশে ৩২টি জিমনেশিয়াম, ২০টি সুইমিংপুল, ৭টি ইনডোর স্টেডিয়াম এবং ৪টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ৫টি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া কমপ্লেক্স, একটি করে হ্যান্ডবল, বক্সিং, ভলিবল ও কাবাডি, শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সের কাজ হচ্ছে। ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ চলছে।

২০০০ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পেছনে সাবের হোসেন চৌধুরী, আশরাফুল হকদের দৌড়ঝাঁপের মূল্য আছে। অবদান আছে আইসিসির সেই সময়কার ভারতীয় সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ারও। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভবত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যেত না। টেস্ট মর্যাদা পাওয়াতেই এ দেশের ক্রিকেট উঠে গেছে মহাসড়কে। অথচ ২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ক্রীড়া প্রশাসনের কাছে টেস্ট মর্যাদা পাওয়াটা মনে হয়েছিল 'বিষম ভার'। বাস্তবতা হলো, টেস্ট মর্যাদা না পেলে সর্বোচ্চ স্তরে বেশি খেলার সুযোগ পাওয়া যেত না। তাতে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আজকের এই সমীহজাগানো জায়গাটা আমাদের হতো না। তুলনায় টেস্টের অগ্রগতি ধীর। তবে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়াকে হারানো এবং নিজেদের শততম টেস্টে শ্রীলঙ্কার মাটিতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে সামনের রাস্তাটা শুধুই এগিয়ে যাওয়ার। উঠে আসছে নতুন প্রজন্ম। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ যুবদল আমাদের স্বপ্নে চড়িয়েছে নতুন রং। যে কোনো বিচারেই এই সাফল্য বিশাল মাপের।

বাংলাদেশের প্রাণের খেলা ফুটবল বয়সভিত্তিক স্তরে ভালো করলেও জাতীয় দল ভালো করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী নিজেও এতে বিচলিত। এজন্য ফুটবলের সার্বিক উন্নয়নকল্পে ২০১৯ সালে ২০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেন ফুটবল ফেডারেশনকে। এর আগে কোনো

> বাংলাদেশের স্টেডিয়ামগুলো অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এভাবেই দেখে আসছে। তামিম, সাকিব, মুশফিকদের ব্যাটে চার দেখলে তিনি শিশুতোষ উচ্ছলতায় হাততালি দেন। সাকিব-মোস্তাফিজরা উইকেট তুললে পতাকা দোলান

সরকারই ফুটবলকে এত টাকা বরাদ্দ দেয়নি। শোনা যাচ্ছে, আগামী বাজেট থেকেই হয়তো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবছর ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাবে ফুটবল। সারা দেশের প্রতিটি কোণ থেকে কিশোর ফুটবল প্রতিভা খুঁজে বের করতে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে বছরদশেক হয়ে আসছে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট। কিশোর ও কিশোরীদের এই দুটি টুর্নামেন্টে প্রায় ১১ লাখ করে ২২ লাখ খেলোয়াড় অংশ নেয়। কিশোর-কিশোরীদের এত বড়ো ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্ভবত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এই দুটি টুর্নামেন্ট থেকে প্রচুর প্রতিভাবান খেলোয়াড় ঢুকছে ফুটবল ফেডারেশনের পাইপলাইনে।

শুধু ফুটবলই নয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে দেশব্যাপী প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৭ সালে। এই কর্মসূচির জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ দিয়েছিল ১৫ কোটিরও বেশি। যে কর্মসূচি থেকে ৩১টি ক্রীড়া ফেডারেশন খুঁজে নিয়েছে তাদের আগামী দিনের তারকা। করোনা মহামারির কারণে কর্মসূচিতে ছেদ পড়লেও সরকার এটি চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অসচ্ছল ও দুস্থ ক্রীড়াবিদদের জন্য শেখ হাসিনার সাহায্যের হাত প্রসারিত সর্বদাই। শেখ কামালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুস্থ ক্রীড়াবিদদের সাহায্যের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠিত হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া কল্যাণ ফাউন্ডেশন, অন্য সরকারগুলো তা বন্ধ করে দেয়। শেখ হাসিনা সরকার ২০০৯ সালে এটি চালু করেছে আবার। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা সিডমানি পেয়েছে এই ফাউন্ডেশন। আর এ পর্যন্ত নয়টি অর্থবছরে ৪৪৯ জন দুস্থ, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের চিকিৎসার জন্য ৯ কোটি ১১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

আগের সরকারগুলো জাতীয় পুরস্কার হিসাবে ক্রীড়াবিদদের নগদ ১০ হাজার টাকার সঙ্গে দিত ২ ভরি ওজনের একটি সোনার পদক। শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালে নগদ টাকা বাড়িয়ে করে ২০ হাজার। তারপর সেটি বাড়ানো হয়েছে আরও–নগদ ১ লাখ টাকা ও ২৫ গ্রাম ওজনের সোনার পদক। শেখ কামালের নামে নতুন করে চালু হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার। যে পুরস্কারের অর্থমূল্য এক লাখ টাকা।

শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন, তরুণদের হাতেই নির্মিত হবে আগামীর সমৃদ্ধতর বাংলাদেশ। তারুণ্যের প্রতীক ক্রীড়াবিদদের জন্য তাই তাঁর অগাধ ভালোবাসা। সেজন্যই দেখি জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আরিফ খান জয়কে করেন যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী। জাহিদ আহসান রাসেলকে দেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর ভার। জাতীয় ক্রিকেট দলের দুই অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও মাশরাফি মুর্তজাকে দেন দলীয় মনোনয়ন। তারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করেন, সংসদে গণমানুষের কথা বলেন। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক ক্রীড়াবিদকে জাতীয় সংসদে দেখতে পাব আমরা।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এ কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহনকারী আওয়ামী লীগ এবং রক্তের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলা শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকা মানেই ক্রীড়াঙ্গনের প্রসার ও উন্নয়ন। আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার কাছে ক্রীড়াঙ্গনের প্রত্যাশাও অনেক।

লেখক: সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক

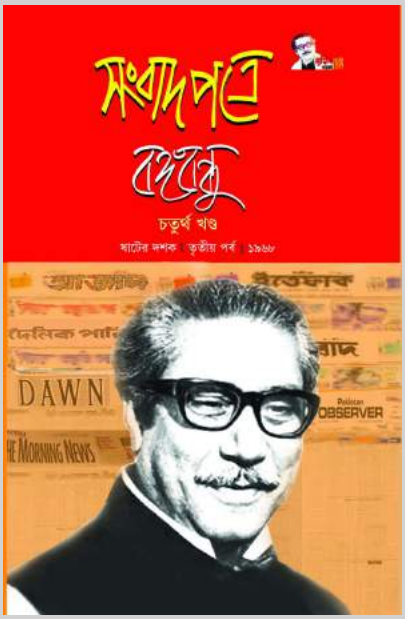

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতাভিত্তিক অগ্রযাত্রা

ইয়াসমীন রীমা

যে হাত দোলনায় দোল দেয়, সেই হাতই যে রাজ্য শাসন করতে পারে, এর বেশুমার নজির না থাকলেও ন্যূনতম প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। তবু সেসব দৃষ্টান্ত উদাহরণ হয় না সংখ্যায় নগণ্য বলেই নয়, সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেও সমাজ তার 'অর্ধেক আকাশ (নারী)' সম্পর্কে যথেষ্ট গোঁড়া ও রক্ষণশীল। তবে আশার কথা–এরকম প্রতিবন্ধকতার বেড়া ডিঙিয়েও নারীদের একটি অংশ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের জায়গা দখল করছেন। কিন্তু সাধারণভাবে পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অসংখ্য বাধা শুধু 'মানুষ' হিসাবে মর্যাদা পাওয়ার প্রশ্নে। যে কোনো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বাস করা নারী কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষ নন। সংবিধানে তার সমান অবস্থান উল্লিখিত হলেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর জন্য ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা তৈরি করে এবং পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রব্যবস্থার নানা অনিয়ম এবং আইনের ফাঁকফোকরে মুখ থুবড়ে পড়ে নারীর জীবন। নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারী ও পুরুষের মাঝে সমতার বিষয়টি বর্তমানে উন্নয়নের অন্যতম সূচক। কারণ মানবিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ক্ষমতায়ন। আর নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, পিতৃতন্ত্র এবং সব প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সব কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

নারীর ক্ষমতায়ন: অগ্রগতি ও সমতাভিত্তিক সমাজ

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি পুনর্গঠনে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে দূরদর্শী দার্শনিক তথা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহিলা লীগ প্রতিষ্ঠা

করেন, যা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সুগম করে। উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সরকারি চাকরিতে নারীদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সব ক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ আবাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। এই বোর্ডের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে নারীর অগ্রযাত্রা। 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়ি' উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের নারীসমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটেছে। নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এবং কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত হয়। যুগ যুগ নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারীসমাজের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর যথাযথ মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। অতীতের কোনো সরকার বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারীর মূল্যায়নে এমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। শেখ হাসিনা যতবার ক্ষমতায় এসেছেন, নারীর ক্ষমতায়নে নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন। আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে নারীর কী ভূমিকা, তা অনুধাবনের জন্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'অ্যান আনসার্টেন গ্লোরি ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস কনট্রাডিকশন' (২০১৩) প্রবন্ধে অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেন: 'বাংলাদেশের বেগবান নারী আন্দোলন, সক্রিয় এনজিও কার্যক্রম ও বেইজিং-পরবর্তী বিশ্ব নারী উন্নয়ন এজেন্ডার প্রভাবে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলের লক্ষ্যে যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে, এর মাধ্যমে বাংলার নারীজীবনে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা ঘটে।'

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারের আলোকে নারীর দারিদ্র্যমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাবিধান এবং আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মূলধারায় নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য। নারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান সংসদে নারী সদস্য আছেন ৭২ জন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে ৬০০ নারী দায়িত্ব পালন করছেন। প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে নয়জন নারী কর্মরত। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, জাতীয় সংসদের স্পিকার একজন নারী, মন্ত্রিপরিষদে চার জন নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, সংসদে সরাসরি নির্বাচিত ২২ জন এবং সংরক্ষিত ৫০টি আসনে রয়েছেন নারী। এছাড়া দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন নারী। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন ১০ জন, পুলিশ প্রশাসনের পাঁচ জন ডিআইজি, ৬৯ জন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন নারী। বিচার বিভাগের অনেকে জেলায় জজের দায়িত্ব পালন করছেন নারী। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির দায়িত্ব পালন করেছেন নারী। হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসাক্ষেত্রে অবদান রাখছেন নারী, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোয় অবদান রাখছেন নারী, বিভিন্ন এনজিওতে নারী, সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের শীর্ষ সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন নারী। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ১২ হাজার নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন, উপজেলায় ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ৬০০ জন। এছাড়া নারী সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক ও কার্যকরী ভূমিকা রাখছেন।

নারী শিক্ষা ও বাল্যবিবাহ রোধ

বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন খাবারের (মিড-ডে মিল) কর্মসূচি চালু এবং প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকসংখ্যক নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এসব কর্মযজ্ঞের ফলে নারী স্বাবলম্বী হচ্ছে, অর্জন করছে অর্থনৈতিক মুক্তি। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বই বিতরণ এবং দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। ১ কোটি ৪০ লাখ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। ফলে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা বিভিন্ন শিরোপা অর্জনে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছে।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআইয়ের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মোবাইল ফোনের খুদে বার্তাভিত্তিক সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন প্রকল্প চালু রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বাল্যবিবাহ কীভাবে কমিয়ে আনা যায়, সেই লক্ষ্যে দেওয়া হচ্ছে অর্থ সহায়তা। বাল্যবিবাহ বন্ধে ২০১৬ সালে সরকারিভাবে কুড়িগ্রামে পাইলট প্রকল্প আকারে শুরু হয়েছে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় রংপুর বিভাগের আরও চারটি জেলাকে আনা হয়েছে এ প্রকল্পের আওতায়। মোবাইল ফোনে *১৬১০০# নম্বরে ডায়াল করলেই সেখানে বয়স যাচাইয়ের একটি অপশন দেওয়া হয়। সেখানে জন্মনিবন্ধন সনদ, শিক্ষা সনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর দিলেই চলে আসবে সঠিক বয়স। যদি জন্মনিবন্ধনটি ভুয়া হয়, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বে ভুয়া জন্মনিবন্ধন ব্যবহারকারী। ইতোমধ্যে সারা দেশে ৮৫ হাজার কাজি, ঘটক, ইমাম, পুরোহিত অর্থাৎ যারা বিয়ে পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত, তাদের একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে।

তৃণমূলে নারীর ক্ষমতায়ন: দক্ষতাবৃদ্ধি ও ট্রেড প্রশিক্ষণ

'দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ' রিপোর্টে বিশ্বের ১৪৪টি দেশের সমীক্ষায় সামগ্রিক উন্নয়নে নারী-পুরুষ সমতায় বাংলাদেশের স্থান ৪৭তম।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আসন শ্রেষ্ঠ। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, জেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সৃজনশীলতার দ্বারায় সঠিক বিচারের মাধ্যমে সমাধান করে চলছে সাধারণ জনগণের নানা সমস্যা। প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর শতভাগ অংশগ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুরক্ষা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনো জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ১০ শতাংশ সুদে ঋণও নিতে পারছেন। বর্তমানে ৩০ লাখের বেশি নারী শ্রমিক পোশাকশিল্পে কর্মরত। এবারের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ৪০টি মন্ত্রণালয় বিভাগকে তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে: (ক) নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি; (খ) উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ এবং (গ) সরাসরি সেবাপ্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি। প্রথম গুচ্ছে নারী উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত সাতটি মন্ত্রণালয় বিভাগ হলো: (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, (২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (৩) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, (৪) মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৫) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, (৬) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং (৭) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নারী উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নির্যাতন প্রতিরোধে পঞ্চাশ লাখ নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এক কোটি গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীদের আবাসিক হোস্টেল সুবিধা প্রদান এবং সরকার সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় প্রায় এক কোটি দুস্থ ও অসহায় নারীকে অরক্ষিত গ্রুপ পোষণ (ভিজিএফ), মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী ল্যাক্টেটিং মা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রদান করছে সরকার। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। নারী ও শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়, সাতটি বিভাগীয় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ সংশোধন করে ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রতিস্থাপন করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে ডিএনএ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স (শূন্য সহিষ্ণুতা) নীতি গ্রহণ করেছে এবং সাতটি বিভাগের জেলা ও উপজেলার ৬৭টি হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু করেছে এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল থেকে নির্যাতিত নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া হচ্ছে। তাদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানসহ হটলাইন ১০৯ ও জয় অ্যাপের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ জরুরি সেবা দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ ও সহিংসতা প্রতিরোধে আট হাজার কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে।

প্রান্তিক নারী উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবা ও কৃষি

প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক। বর্তমানে সারা দেশে ১৩ হাজার ৮৮১টি ক্লিনিক চালু আছে। চালুর অপেক্ষায় আছে আরও ১৪৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক। এসব ক্লিনিক থেকে দৈনিক গড়ে ৩০ জন সেবা নেন। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে বিনামূল্যে প্রায় ৩০ ধরনের ওষুধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে সার্বিক প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় অন্তঃসত্ত্বা নারীর প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সেবা। এছাড়া সাধারণ জখম, জ্বর, কাটা, পোড়া, হাঁপানি, চর্মরোগ, কৃমি এবং চোখ, দাঁত ও কানের সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সময়মতো প্রতিষেধক টিকা যেমন: যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া প্রভৃতিসহ কমিউনিটি ক্লিনিকে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবাও দেওয়া হয়। ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সে সন্তান ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মায়েদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন, এক থেকে পাঁচ বছরের শিশুকে ছয় মাস পর পর প্রয়োজনীয় ভিটামিন খাওয়ানো, রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণকারীদের জটিল কেসগুলোকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানপূর্বক দ্রুত উচ্চতর পর্যায়ে রেফার করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রামীণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে প্রতি ছয় হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। ক্লিনিকগুলো বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় এবং সেখানে বিনামূল্যে সাধারণ রোগের ওষুধ পাওয়া যায়

> প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর শতভাগ অংশগ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুরক্ষা এবং নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে

বলে দিনদিন সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াত খরচও এখন সরকার বহন করে। এতে মাতৃকালীন মৃত্যুহার এখন প্রতি লাখে ১৭০ জন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ২০১৮ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশের ৭১.০৫ শতাংশ নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত। নারী কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে। কৃষিপণ্য বাজারজাত প্রক্রিয়াকরণের যে ২২টি ধাপ আছে, এর প্রায় ১৭টি ধাপে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। নারীরা এখন সবক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং কর্মজীবী নারীর অংশগ্রহণ সহজ করতে মাতৃকালীন ছুটি চার মাস থেকে ছয় মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে একটি, যা শুধু দরিদ্র মানুষের জন্য নিবেদিত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 'আমার বাড়ি আমার খামার' (৪র্থ সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নারী উপকারভোগীদের মধ্যে ৫০ ভাগ পরিবারে আগে সারা বছর খাদ্য নিরাপত্তা ছিল। বর্তমানে ৮৫ ভাগ নারী উপকারভোগী পরিবারের কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেরেছে। প্রান্তিক তথা গ্রামীণ নারীদের সক্ষমতা অর্জনে পরিবার, সমাজ, তথা রাষ্ট্রের অগ্রগতির পেছনে নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ নারীদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে তাদের অর্জন টেকসই উন্নয়নের মূলকথা। বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ নারীরা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হতে পারেন এবং শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেন–এই প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভাবনীয় উদ্যোগে দেশের প্রতিটি গ্রামের হাজার হাজার নারীর শ্রম ও প্রচেষ্টায় বিকাশমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে নারীর ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই।

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ: আইন প্রণয়ন পরিষেবা

এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার ৫০ বছরের বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা ঈর্ষণীয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্য প্রতিবেদন ২০২০-এ উঠে এসেছে লিঙ্গবৈষম্য নিরসনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। শিক্ষায় নারীর শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা প্রদান ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানামুখী কর্মপরিকল্পনায় প্রতীয়মান হয় যে নারী-পুরুষের সমতা বর্তমান রাষ্ট্রের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক কৌশিক বসু প্রজেক্ট সিন্ডিকেট 'হোয়াই ইজ বাংলাদেশ বুমিং' শীর্ষক এক নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের এই রূপান্তরের কারণ কী–এই প্রশ্নের সুর্নিদিষ্ট উত্তর না থাকলেও মূলত সামাজিক পরিবর্তনই বাংলাদেশের এই অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছে। নারীর ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়েই এই রূপান্তর শুরু হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু ঘরেই নয়, বাইরেও হয়েছে। নারী শিক্ষার অগ্রগতির কারণেই শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে।' পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন কার্যক্রমের 'সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' পরিষেবাটি নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করে এবং অভিযোগকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তিগত ও আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকে। সাইবার বুলিং, ট্রলিং, পরিচিতি তথ্য অপব্যবহার ও প্রকাশ, ব্ল্যাকমেইলিং, রিভেঞ্জ পর্নসহ বিভিন্ন উপায়ে সাইবার স্পেসে ভুক্তভোগী নারীরা অধিকাংশ সময় বুঝতে পারেন না কীভাবে, কী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কাকে বিষয়টি জানাবেন। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে জানাতে বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার কাছে তারা অভিযোগ জানানোর ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করেন। এই নারীদের পাশে দাঁড়াতে ২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন যাত্রা শুরু করে। নারীর জন্য 'নিরাপদ সাইবার স্পেস নিশ্চিতকরণ' রূপকল্প নিয়ে পরিষেবাটি চালু হয়েছিল। ভুক্তভোগী নারীরা যাতে সহজে তাদের হয়রানির বিষয়টি জানাতে যোগাযোগ করতে পারেন, সেজন্য এই সার্ভিসের একটি হটলাইন নম্বর (০১৩২০-০০০৮৮৮) রয়েছে। তাছাড়া তাদের সমস্যা পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেনের ফেসবুক পেজে মেসেজ পাঠিয়ে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও জানাতে পারেন। এরই মধ্যে ১২ হাজার ৯৪১ জন ভুক্তভোগী নারী সাইবার স্পেসে হয়রানির সমাধান পেতে যোগাযোগ করেছেন। ৮ হাজার ৩৩১ জনের অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তিগত ও আইনগত পরামর্শ এবং সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে নির্ধারিত বাল্যবিবাহ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০-এর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকার নারীর প্রতি সহিসংতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করেছে পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন-২০১২। নারীর সুরক্ষা নিশ্চিন্তে প্রণয়ন করা হয়েছে মানব পাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২, বাল্যবিবাহ নিরোধ করে মেয়েশিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়েশিশুদের নিরাপত্তায় শিশু আইন-২০১৩ প্রণীত হয়েছে। হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

'ও বোন' নামে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ সেবা থেকে শুরু করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ড্রিমলাইনার 'আকাশবীণা' উড়িয়ে হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছেন নারী। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সব খাতে সরব উপস্থিতি নারীর। তৃণমূল থেকে কেন্দ্রে দৃঢ় অবস্থান গড়েছেন বাংলার নারী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে বহির্বিশ্বে ঈর্ষণীয় অবস্থান বাংলাদেশের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীদের এই অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। তাঁর এই আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য জাতিসংঘ তাকে 'প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে। তাঁর এই আন্তর্জাতিক সম্মাননাপ্রাপ্তি পুরো নারীসমাজকে নেতৃত্বের পথে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগাবে। বর্তমান সময়ের বৈশ্বিক কর্মসূচি স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি), যেখানে বলা হয়েছে–২০৩০ সালের পৃথিবী হবে ৫০:৫০ অর্থাৎ, সমতার বিশ্ব, সেখানে বাংলাদেশও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরাও দেখছি নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণ ও অবদানের অগ্রসরমান বাংলাদেশ।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক বর্ণপাঠ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডেইলি নিউএইজ

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত শূন্য থেকে বঙ্গভ্যাক্সের যুগে

অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল)

বর্তমানীংকালে যে বিষয়ে বলা আর বিশেষ করে লেখা সবচেয়ে কঠিন, তা বোধ করি বিগত একটি যুগে দেশের নানাখাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জন আর দেশের মানুষগুলোর জন্য তার সরকারের ভালোর চেয়েও আরও ভালো কাজগুলোর ফর্দ প্রণয়ন। আমি হলফ করে বলতে পারি– আওয়ামী লীগের অন্ধতম সমর্থকটিও এই কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না। কারণটা সোজা। কারণ, এমন কিছু কোনোদিনও দেখেনি বাংলাদেশ। জানি না দেখেছে কি না কোনো জাতি, কোনোদিনও এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। কাজেই পেশায় যতই চিকিৎসক হই না কেন, যে বিষয়ে লিখতে বসেছি, তা লেখার শেষে যে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে–তা নিয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহই নেই। আর সে কারণেই খুবই সচেতনভাবে লেখার শিরোনামটি নির্ধারণ করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের স্বাস্থ্য খাতে অন্যতম অর্জন একটি জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন। ২০০০ সালে সর্বশেষ হালনাগাদকৃত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এই সরকারের মেয়াদকালেই ২০১১ সালে যুগোপযোগী করা হয়েছে। একইভাবে হালনাগাদ করা হয়েছে জাতীয় ওষুধনীতিটিও। বর্তমানে দেশের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করার পাশাপাশি বিশ্বের শতাধিক দেশে আমাদের ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে একটি আধুনিক জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির পাশাপাশি একটি যুগোপযোগী ওষুধনীতির প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। আওয়ামী লীগ সরকার সেই দায়িত্বটি সুনিপুণভাবে পালন করেছে।

স্বাস্থ্য খাতে আওয়ামী লীগ সরকারের আরেকটি নন্দিত অর্জন কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতি ছয় হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রথম মেয়াদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি

ক্লিনিক। পরবর্তী সময়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার এসব ক্লিনিককে গবাদিপশুর চারণক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। আবারও ক্ষমতায় এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু যে এই অনন্য মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যাই বাড়িয়েছেন তাই নয়, বরং একে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যেও নিয়ে এসেছেন যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ খামখেয়ালির বশে কমিউনিটি ক্লিনিককে বন্ধ করে দিতে না পারে। বর্তমানে এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে ৩০ ধরনের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে।

পাশাপাশি দেশে বিদ্যমান সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিরবচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার তাগিদে গত এক যুগে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২০ হাজারেরও বেশি চিকিৎসককে। ঢেলে সাজানো হয়েছে দেশের স্বাস্থ্য প্রশাসনকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিভাগকে দুটি বিভাগে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা হয়েছে। নিয়মিত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বাস্থ্য প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রান্তিক পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা প্রশাসকদের আবাসন, পরিবহণসহ অন্যান্য সুবিধাদি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মর্যাদা দিয়েছিলেন আর তাঁর সুযোগ্য কন্যা দায়িত্বে এসে নার্সদের দিয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার সম্মান।

দেশে অসংখ্য নতুন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি, নিউরোসায়েন্স, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ইএনটিসহ একাধিক ন্যাশনাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট। কুর্মিটোলা, মুগদা, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ইউনিট-২, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ইউনিট-২, শেখ ফজিলাতুন নেছা চক্ষু হাসপাতালসহ নতুন নতুন হাসপাতাল শেখ হাসিনার সরকারেরই অর্জন। নতুন শয্যা সংযোজন আর আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয় হৃদ্‌রোগ, কিডনি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, অর্থোপেডিক ইনস্টিটিউট, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আর আজিমপুরের মা ও শিশু হাসপাতালসহ অসংখ্য হাসপাতালের। পাইপলাইনে আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপারস্পেশালাইজড হাসপাতাল এবং জাতীয় লিভার ও ফিজিক্যাল মেডিসিন ইনস্টিটিউটের মতো অতি প্রয়োজনীয় হাসপাতালগুলো।

পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৪টি নতুন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ আর এগুলো স্থাপিত হয়েছে জেলায় জেলায়। ফলে ভবিষ্যতে চিকিৎসার জন্য এদেশে চিকিৎসকের ঘাটতিজনিত হাহাকার যে আর থাকবে না, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। পাশাপাশি চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিকমানের বিশেষজ্ঞ হিসাবে গড়ে তোলা আর দেশে চিকিৎসাক্ষেত্রে গবেষণার প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নতুন পাবলিক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। ক্ষমতায় ফিরে এসে দেশের অবশিষ্ট বিভাগগুলোয়ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

স্বাস্থ্য খাত বাদ যায়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটালাইজেশনের সুফল থেকে। দেশের কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে শুরু করে জাতীয় ইনস্টিটিউট পর্যন্ত সব হাসপাতালে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রবর্তন করা হয়েছে ই-গভর্নেন্স ও ই-টেন্ডারিং। সরকারি হাসপাতালগুলোকে শীঘ্রই আনা হবে অটোমেশনের আওতায়। স্বাস্থ্য বাতায়ন কল সেন্টার চালু করার মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী চিকিৎসাক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকারের যে বিপুল অর্জন, এর স্বীকৃতিতে ভুল করেনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও। আরও অসংখ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে অর্জিত সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, এমডিজি ফোর অ্যাওয়ার্ড প্রভৃতিও আমাদের রাষ্ট্রীয় তোষাখানা জাদুঘরকে আলোকিত করে রাখবে।

করোনাকালে প্যান্ডেমিক মোকাবিলায়ও ঈর্ষণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। একদিকে যেমন মৃত্যুর সংখ্যাটিকে প্যান্ডেমিকের শুরু থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে, তেমনই পরপর দু-দুবার সীমিত সামর্থ্য নিয়েও কোভিডের ওয়েভকে বশে আনার কাজটি করে দেখিয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য খাত। কোভিড চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রতিটি ওষুধই দ্রুত দেশে উপলব্ধ হয়েছে আমাদের দক্ষ ওষুধশিল্পের দক্ষতায়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের একটি বড়ো সাফল্য কোভিডের ভ্যাকসিন বিনামূল্যে রোল আউট করার বিষয়টি। আমরা যে শুধু পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের আগেই কোভিড ভ্যাকসিন রোল আউট করেছি তাই নয়, বাংলাদেশ পৃথিবীর সেই গুটিকয় হাতেগোনা দেশের অন্যতম, যারা বিনামূল্যে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য কোভিডের ভ্যাকসিনপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে যাচ্ছে।

> আর এই ভ্যাকসিনের জায়গাটিতেই যুক্ত হতে যাচ্ছে সাফল্যের এক নতুন পালক, রচিত হতে যাচ্ছে এক অসামান্য সাফল্যগাথা

আর এই ভ্যাকসিনের জায়গাটিতেই যুক্ত হতে যাচ্ছে সাফল্যের এক নতুন পালক, রচিত হতে যাচ্ছে এক অসামান্য সাফল্যগাথা। দেশে আবিষ্কৃত প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন বঙ্গভ্যাক্স মানুষের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে। এই ভ্যাকসিনটি যেদিন দেশে চলমান কোভিড গণটিকা কার্যক্রমে সংযুক্ত হবে, সেই বিশেষ দিনটিতে স্বাস্থ্য খাতে সংঘটিত হবে এক নতুন বিপ্লব। আমার জানামতে, এখন পর্যন্ত মাত্র আটটি দেশ কোভিড ভ্যাকসিন উদ্ভাবন শেষে রোল আউট করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই 'ফর বাংলাদেশ, অব বাংলাদেশ, বাই বাংলাদেশ'। বঙ্গভ্যাক্স যেদিন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের শরীরে প্রয়োগ করা হবে, সেই দিন 'এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে' দেখবে যে বাঙালি আর বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত এমনকি এমনটিও করে দেখানোর যোগ্যতা রাখে।

লেখার যখন শেষপ্রান্তে, মুগ্ধ হয়ে ভাবছি সাধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই মহীয়সী নারীকে রোল মডেলের আসনে বসায়নি। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা পেয়েছি আমাদের মাথার ওপর 'মাদার অব হিউম্যানিটি' যিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন 'এ ডটারস টেলকে' বাস্তবে রূপায়িত করায়। তিনি যে শুধু স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান আর স্বপ্নপূরণ করেন তাই নয়–তিনি দেখেন বহুদূর। তাঁর দৃষ্টি এখন রূপকল্প-২০২১, মিশন ইনোভেশন-২০৪১ ছাড়িয়ে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-তে প্রসারিত। তাঁর জাদুর ছোঁয়াতেই শূন্য থেকে যাত্রা করে আমাদের স্বাস্থ্য খাত আজ বঙ্গভ্যাক্সের যুগে প্রবেশ করছে।

লেখক: ডিভিশন প্রধান, ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য সচিব, সম্প্রীতি বাংলাদেশ

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্য

প্রণব মজুমদার

বাংলাদেশের সাহিত্য মানে স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্য। আর তা হলো বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক উত্তরাধিকার। আশার কথা হলো বাংলাদেশের সাহিত্য এগিয়েছে স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান এবং এর তারও আগে অবিভক্ত বাংলার পথ অনুসরণ করেই। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা পথ চলেছি সমুজ্জ্বল সাহিত্য সৃজনে। সাহিত্যে আমাদের পঞ্চাশ বছরে অর্জন কম নয়।

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্য বিশাল এক অধ্যায়! ছোট্ট ক্যানভাসে একে চিত্রিত করা সে এক কঠিন কর্মযজ্ঞ বটে! বিশেষ করে আমার মতো কম জানা মানুষের কাছে। সাহিত্য চর্চা করি দীর্ঘ সময় ধরে। তাই এ স্বল্প পরিসরে দুরূহ কাজটি সম্পাদন করার ইচ্ছা প্রকাশ এক ধৃষ্টতা বৈকি! কতটুকু করতে পারব তা পাঠক বিচার করবেন। অনেকের নামই মনে পড়ছে না। বয়স হয়েছে! স্মৃতিভ্রম হতেই পারে! তাই মার্জনা প্রত্যাশা করি।

গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া ও অনুবাদ মূলত সাহিত্যের অংশ। অর্ধ শত বছরে আমাদের সাহিত্যে শেষে এসে বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে স্মৃতিগদ্য ও ভ্রমণগদ্য। সাহিত্যের শাখা-প্রশাখায় ৫০ বছরে পথচলার পরিভ্রমণ দীর্ঘ। ওপার বাংলাসহ বিশ্বে নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এটা বলতেই হয়। ৫০ বছরে এ দেশের সাহিত্যে সাতচল্লিশে দেশভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামবাংলা বিষয় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে লেখকদের কাছে।

বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্যকে সার্বিক অর্থে মূল্যায়নের নিরিখ কী হতে পারে তা নিয়ে নানা মত পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। স্বাধীনতার পাঁচ দশকের সময়কালকে

সাধারণভাবে বিবেচনায় নিলে এই সময়ে কী মানের সাহিত্য এই মাটির সৃজনশীল সন্তানেরা তৈরি করেছে?

বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সমালোচকরা '৪৭ পূর্ববর্তী এবং '৪৭ পরবর্তী ধারার কথা বলেন।

স্বাধীনতার পরের দশকগুলোতে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের লেখকদের হাতে; তাঁরা অনেক প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের লেখার ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয়েছিল দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের নানা বয়ান। আমরা কিছু লেখকের নাম স্মরণ করতে পারি, যারা আমাদের সাহিত্যের বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। এঁদের লেখায় বাংলাদেশের স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে। গ্রামবাংলা, আঞ্চলিক ও শহুরে জীবন, নর-নারী সম্পর্ক, মনোজগত, ইতিহাস চেতনা ও সামাজিক বৈষম্য বোধ ইত্যাদি বেশ বিস্তৃত পরিকাঠামোতে বাংলা কথা সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোট গল্প রচিত হয়। সোমেন চন্দ, আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ, আবু ইসহাক, আবু রুশদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কাজী আফসার উদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শওকত ওসমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আতাহার আহমদ, আশরাফ উজ্জামান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইসহাক চাখারী, চৌধুরী শামসুর রহমান, জহির রায়হান, তাসাদ্দুক হোসেন, শহীদ সাবের, দিলারা হাশেম, নীলিমা ইব্রাহিম, বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ, রশীদ করীম, রাজিয়া খান, শহীদুল্লা কায়সার, শহীদ আখন্দ, শওকত আলী, সত্যেন সেন, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ুন কাদির প্রমুখ কথাশিল্পী বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন বেশ ভালোভাবে। এর বাইরে অনেক লেখক রয়েছেন। অর্ধশতকে কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান যাঁদের নাম বলতেই হয় তাঁরা হলেন হেলেনা খান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, জাহানারা ইমাম, হুমায়ূন আহমেদ, হাজেরা নজরুল, রাবেয়া সিরাজ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, শেখ তোফাজ্জল, রকিব হাসান, বুলবুল চৌধুরী, বুলবন ওসমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইন্দু সাহা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, দিলারা মেসবাহ, নয়ন রহমান, আফরোজা পারভীন, অনামিকা হক লিলি, আকিমুন রহমান, নাসরীন জাহান, নাসরীন নঈম, তসলিমা নাসরিন, আহসান হাবীব, আফসানা বেগম, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মশিউল আলম, প্রশান্ত মৃধা, মণীষ রায়, প্রণব মজুমদার, দীপক চৌধুরী, ইশরাত তানিয়া, মাহবুব আজিজ, মোজাফ্ফর হোসেন, স্বকৃত নোমান, দীপু মাহমুদ, মনি হায়দার, মোশতাক হোসেন, অমল সাহা, আনিস রহমান, শাহেদ ইকবাল, সাদাত হোসেইন ও আয়মান সাদিক প্রমুখ।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপন্যাসের নাম করা যায় যা স্বাধীনতার ঠিক পরে রচিত। মুক্তিযুদ্ধ এসব উপন্যাসের প্রধান বিষয়। আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত'; শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হইতে বিদায়'; রশীদ করীমের 'আমার যত গ্লানি'; সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন', 'নিষিদ্ধ লোবান', 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'; শওকত আলীর 'যাত্রা'; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'; রাবেয়া খাতুনের 'ফেরারি সূর্য'; মকবুলা মনজুরের 'শিয়রে নিয়ত সূর্য'; রাজিয়া খানের 'দ্রৌপদী'; দিলারা হাশেমের 'একদা এবং অনন্ত'; মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন', 'খেলাঘর'; রশীদ হায়দারের 'খাঁচায়', 'অন্ধ কথামালা'; আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়'; আহমদ ছফার 'ওঙ্কার', 'অলাতচক্র', শামসুর রাহমানের 'অদ্ভুত আঁধার এক'; মিরজা আবদুল হাইয়ের 'ফিরে চলো'; সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'জীবনতরু'; সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড'; হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি'; রিজিয়া রহমানের 'একটি ফুলের জন্য', 'কাছেই সাগর'; আন্দালিব রুশদীর 'সুসময়'; জোবাইদা গুলশান আরার 'সুবাস ফেরেনি'; মাহবুব তালুকদারের 'বধ্যভূমি'; হারুণ হাবীবের 'সোনালী ঈগল ও উদ্বাস্তু সময়', 'প্রিয়যোদ্ধা', শহীদুল জহীরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'; মঞ্জু সরকারের 'প্রতিমা উপাখ্যান'; আবুবকর সিদ্দিক রচিত 'জলরাক্ষস', 'একাত্তরের হৃদয়ভস্ম'; হাসনাত আবদুল হাইয়ের 'তিমি'; হরিপদ দত্তের 'একাত্তরের ধ্রুপদী'; শাহরিয়ার কবিরের 'একাত্তরের যীশু'; ইমদাদুল হক মিলনের 'কালো ঘোড়া'; আনিসুল হকের 'মা'; আফরোজা পারভীনের 'যুদ্ধদিনের কাব্য'; ইসহাক খানের 'লড়াই'; ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থের 'বন্দী দিন বন্দী রাত্রি'; সালাম সালেহ উদ্দীনের 'ছায়া শরীর'; শাহীন আখতারের 'তালাশ'; আফসান চৌধুরীর 'বিশ্বাস ঘাতকগণ', তাহমিমা আনামের 'সোনাঝরা দিন', রফিকুর রশীদের 'দাঁড়াবার সময়' প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধের গল্প নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বশীর আল হেলালের 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া' 'রণকৌশল', সৈয়দ শামসুল হকের 'জলেশ্বরীর গল্পগুলো', শওকত ওসমানের 'জন্ম যদি তবে বঙ্গে', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা', আবুবকর সিদ্দিকের 'মরে বাঁচার স্বাধীনতা', সৈয়দ ইকবালের 'একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'অপঘাত', রাহাত খানের 'মধ্যিখানের চর', সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প', হুমায়ূন আহমেদের 'শীত', 'উনিশ শ একাত্তর', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'কেয়া', 'আমি' ও 'জারমান মেজর', মইনুল আহসান সাবেরের 'কবেজ লেঠেল', 'ভুলবিকাশ', রশীদ হায়দারের 'কল্যাণপুর' ও 'এ কোন ঠিকানা'।

এছাড়া কায়েস আহমেদের 'আসন্ন', মাহমুদুল হকের 'কালো মাফলার', জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে', মামুন হুসাইনের 'মৃত খড় ও বাঙাল একজন', শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পুঁই ডালিমের কাব্য', আমজাদ হোসেনের 'উজানে ফেরা', সত্যেন সেনের 'পরিবানুর কাহিনী', মঞ্জু সরকারের 'শান্তি বর্ষিত হোক', শওকত আলীর 'সোজা রাস্তা', 'আকাল দর্শন', হুমায়ুন আজাদের 'যাদুকরের মৃত্যু', সুচরিত চৌধুরীর 'নিঃসঙ্গ নিরাশ্রিত', রিজিয়া রহমানের 'ইজ্জত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন' গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই বিষয় ও আঙ্গিকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জীবন চেতনার সার্থক শিল্পরূপ দেখতে পাই আমরা। 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে মুক্তিযোদ্ধাদের অপরিমেয় জীবনীশক্তির বিন্যাস ঘটেছে। 'ঘরগেরস্থি' গল্পে যুদ্ধোত্তর কালের জনজীবনের অনিশ্চিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বরূপ হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময়।

ষাটের গল্প বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক বা লিপিকৌশল, গদ্যভঙ্গী, লেখক-চিন্তা এমনকি পরিপ্রেক্ষিত অবলোকনের সঙ্গে সত্তরের গল্প লেখকদের সাযুজ্য অধিক। ষাটের লেখকদের মতো সত্তরের দশকের গল্পকাররাও মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং সমাজসচেতন। এরা যে শ্রেণি ও অবস্থানের মানুষ তা তাঁরা তীব্র মনোযোগের সঙ্গে গল্পে তুলে এনেছেন। সমাজের ভাঙন-নির্মাণ, ক্ষয় বিকাশ, বিক্ষোভ, ঘুম ও আলোড়নের বিষয়কে সত্তরের গদ্যশিল্পীরা গল্পের বিষয় করেছেন। ষাটের দশকে নির্মিত এই গল্পের জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে সত্তরের লেখকরা গল্পের ফসল আরও সজীব করে তোলেন। সত্তর দশকের প্রায় সব লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প লিখেছেন। যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতার চাপ লেখকদের দিয়ে গল্প লিখিয়ে নিয়েছে। তবু সত্তর দশকের কোনো গল্পকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শিল্পসফল গল্প লিখিত হয়নি। সত্তর দশকের গল্প বিকাশের পেছনে ক্রিয়া করেছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। তৎকালীন পাকিস্তান

রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এই ভূখণ্ডে মানুষের ক্রম-মুক্তি এবং অগ্রগতি ছিল প্রায় অসম্ভব। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনে নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল অনিবার্য এবং তা অর্জন করেছে এই জাতি। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন বিপর্যয়, শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা, তার মধ্যে সামরিক শাসন তছনছ করে দিয়েছে সমাজকাঠামো এবং মানুষের প্রত্যাশা। তা সত্ত্বেও ঘুরেছে সমাজের চাকা। সত্তর দশকের গল্পকার সবাই সমসাময়িক লেখক। আগে-পরের লেখক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কাজ। একের সঙ্গে অন্যের বয়সে সামান্য পার্থক্য থাকলেও একজনের পাশ থেকে উঠে এসেছেন আরেকজন। বুলবুল চৌধুরী, জাহানারা আরজু, হুমায়ূন আহমেদ, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শাহরিয়ার কবির, তাপস মজুমদার, আনওয়ার আহমেদ, শহীদ আখন্দ, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আফসান চৌধুরী, বারেক আব্দুল্লাহ একই সময়ের লেখক। জাফর তালুকদার, আরেফিন বাদল, মুস্তাফা পান্না, আতা সরকার, মঞ্জু সরকার একই সময়ের লেখক। সত্তর ও আশির দশকে সময়ে গল্প লিখতে শুরু করেন হরিপদ দত্ত, আবু সাঈদ জুবেরী, বিপ্লব দাশ, সৈয়দ ইকবাল, আহমদ বশীর, ইমদাদুল হক মিলন, সুশান্ত মজুমদার, সৈয়দ কামরুল হাসান, মঈনুল আহসান সাবের, প্রণব ভট্ট, সারোয়ার কবীর, ইসমাইল হোসেন, ইসহাক খান, নকিব ফিরোজ, অরুণ চৌধুরী, আফরোজা পারভীন পপি, হুমায়ূন মালিক, সৈয়দ নূরুল আলম, শাহনাজ মুন্নী প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বড়ো একটা অংশজুড়ে আছেন কবিতায়। আশি, নব্বই বা শূন্য দশক বা দ্বিতীয় দশকজুড়ে আমরা অজস্র কবিকে দেখি কবিতার পথে এসব বিষয়ের স্রোতে।

সত্তর দশকের গল্পকার সবাই সমসাময়িক লেখক। আগে-পরের লেখক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য কাজ। একের সঙ্গে অন্যের বয়সে সামান্য পার্থক্য থাকলেও একজনের পাশ থেকে উঠে এসেছেন আরেকজন

কবিতায় ভাষা আন্দোলন, দ্রোহ, সাম্যবাদ, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের বিষয়াবলিতে নতুন দ্যোতনায় প্রকাশিত হতে আমরা দেখেছি আমাদের প্রধান কবিদের সৃষ্টিতে। বয়স বা সাহিত্য সৃজনকর্মে প্রবেশের সময়ক্ষণের হিসাবে এদের নাম আগে পিছে হতে পারে! এঁরা হলেন সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, শহীদ কাদরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জিয়া হায়দার, আবদুস সাত্তার, কে জি মুস্তাফা, হুমায়ুন কবির, ওমর আলী, আবুবকর সিদ্দিক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, বেলাল চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, মোহাম্মদ রফিক, জিনাত আরা রফিক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, দাউদ হায়দার, ফজল-এ-খোদা, আসাদ চৌধুরী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, কায়সুল হক, সাযযাদ কাদির, হেলাল হাফিজ, সমুদ্র গুপ্ত, মতিন বৈরাগী, দিলওয়ার, সানাউল হক, জুলফিকার মতিন, আবুল হাসান, মাহবুব হাসান, মাসুক চৌধুরী, মুশাররাফ করিম, মোফাজ্জল করিম, হায়াৎ সাইফ, ইমরান নূর, সাইফুল বারী, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, হুমায়ুন আজাদ, রফিক আজাদ, রবিউল হুসাইন, মনজুরে মওলা, শামীম আজাদ, দিলারা হাফিজ, ত্রিদিব দস্তিদার, কামাল চৌধুরী, ফরহাদ মজহার, অসীম সাহা, শাহনুর খান, খালেদা এদিব চৌধুরী, মোহন রায়হান, শিহাব সরকার, অরুণাভ সরকার, জাহিদুল হক, নাসির আহমেদ, রবীন্দ্র গোপ, ফরিদ আহমদ দুলাল, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, মিনার মনসুর, সানাউল হক খান, মাকিদ হায়দার, আবু কায়সার, হাসান হাফিজ, সৈয়দ হায়দার, জরিনা আখতার, ইকবাল আজিজ, আবু হাসান শাহরিয়ার, মোস্তফা মীর, আবু করিম, রেজা সেলিম, তুষার দাশ, জাফর ওয়াজেদ, দুলাল সরকার, মোহন রায়হান, সলিমুল্লাহ খান, অরুণ দাশগুপ্ত, মাসুদুজ্জামান, জাহিদ হায়দার, মাহমুদ কামাল, সরোজ দেব, কাজী রোজী, সোহরাব পাশা, গোলাম কিবরিয়া পিনু, ফেরদৌস নাহার, সোহেল অমিতাভ, রেজা ফারুক, সোহরাব হাসান, তিতাশ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, শাহদাত বুলবুল, আইউব সৈয়দ, শফিক আলম মেহেদী, ফরিদ কবির, সৈয়দ আল ফারুক, তারিক সুজাত প্রমুখ।

স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন আতাউর রহমান, অঞ্জনা সাহা, আবিদ আজাদ, সমুদ্র গুপ্ত, মাহমুদ আল জামান, ত্রিদিব দস্তিদার, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আল মুজাহিদী, সুরাইয়া খানম, রুবী রহমান, নাসিমা সুলতানা, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ময়ুখ চৌধুরী, জাহিদ হায়দার, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, আ ন ম বজলুর রশীদ, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, শামসুল ইসলাম, দাউদ হায়দার, আবিদ আনোয়ার, জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ, আসাদ মান্নান, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, বুলান্দ জাবীর, হালিম আজাদ, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, ওয়াহিদ রেজা, মুজিবুল হক কবীর, বাবুল আনোয়ার, সমরেশ দেবনাথ, বাবুল আশরাফ, আবু মাসুম, সুহিতা সুলতানা, রেজাউদ্দিন স্টালিন, কামাল মাহমুদ, দারা মাহমুদ, শিমুল মাহমুদ, মেহেদী ইকবাল, বিলোরা চৌধুরী, শাহেরা খাতুন বেলা, জুয়েল মাজহার, মাহফুজ পারভেজ, কিশওয়ার ইবনে দেলওয়ার, শুচি সৈয়দ, ইকবাল বাবুল, শিহাব শাহরিয়ার, সরকার আমিন, সাজ্জাদ শরীফ, সরকার মাসুদ, মারজুক রাসেল, টোকন ঠাকুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আশির ও নব্বইয়ের দশকে কবিতায় যাঁরা নিয়মিতভাবে সরব ছিলেন তাঁরা হলেন তমিজউদ্দীন লোদী, মাহমুদ সাদিক, মাহমুদ শফিক, ইউসুফ পাশা, সুজাউদ্দিন কায়সার, আলমগীর রেজা চৌধুরী, শাহীন রেজা, মাহমুদ বারী, জহীর হায়দার, আবদুল হাই সিকদার,

মারুফ রায়হান, মনিকা রহমান, রুহুল আমিন বাবুল, শ্যাম সুন্দর সিকদার, আবু মুসা চৌধুরী, ভাস্কর চৌধুরী, শিহাব শাহরিয়ার, ফাহিম ফিরোজ প্রমুখ।

সমকালে নিজ স্বাতন্ত্র্যে যেসব কবি অনেকদিন ধরে কবিতার আকাশকে আলোকিত করে রেখেছেন তাঁরা হলেন ওবায়েদ আকাশ, মাসুদ মুস্তাফিজ, চঞ্চল আশরাফ, শুক্লা গাঙ্গুলি, আদিত্য নজরুল, মিলু শামস, ফারুক সুমন, তপন বাগচী, মাসুদ পথিক, রহিমা আখতার কল্পনা, শেলী সেনগুপ্তা, মাহফুজ রিপন, অশোক কর, বীরেন মুর্খাজ্জী, ফারুক আফনদী, ফারুক আহমেদ, স্বরূপ মন্ডল, আবদুর রাজ্জাক, কুশল ভৌমিক, হেনরী স্বপন, মিজান খান, শামসুল বারী উৎপল, মাশরুরা লাকী, বীথি রহমান, চন্দন কৃষ্ণ পাল, মাহফুজা অনন্যা, তাহমিনা শিল্পী, নাহিদা আশরাফী, আলতাফ শাহনেওয়াজ, গৌতম কৈরী, চন্দন চৌধুরী, রহমান হেনরী, জোবায়ের মিলন, অভ্র ভট্টাচার্য্য, আদ্যনাথ ঘোষ, মাসুদ চয়ন, জাকির জাফরান, শুক্লা পঞ্চমী, গাফফার মাহমুদ, সোমের কৌমুদী, প্রণব মজুমদার, রফিকুজ্জামান রণি, মাহফুজুর রহমান সৌরভ প্রমুখ।

স্বাধীনতা উত্তর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি স্বীকৃত সাহিত্যিকগণ হলেন আবদুল গণি হাজারী. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রশীদ করীম, শহীদ সাবের, বদরুদ্দীন উমর, কল্যাণ মিত্র, ফজল শাহাবুদ্দীন, শহীদ কাদরী, রাবেয়া খাতুন, রাহাত খান, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, বুলবন ওসমান, কবীর চৌধুরী, সুফী মোতাহার হোসেন, রাজিয়া খান. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আবদুল হক, মোবাশ্বের আলী, সাজেদুল করিম, আবুল হাসান, শাম্স রাশীদ, মিন্নাত আলী, আলী আহমদ, সাঈদ আহমদ, ড. আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন, আবদুস সাত্তার, মতিউল ইসলাম, দিলারা হাশেম, সুরচিত চৌধুরী, সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী, মমতাজউদদীন আহমদ, ফয়েজ আহমেদ, সরদার ফজলুল করিম, আবদুর রশীদ খান, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, মাহমুদুল হক, মিরজা আবদুল হাই, হাসনাত আবদুল হাই, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, জিয়া হায়দার, সুকুমার বড়ুয়া, আবদুল হাফিজ, কে.এম. শমশের আলী, ইমাউল হক, রাজিয়া মজিদ, রিজিয়া রহমান, নাজমুল আলম, শহীদ আখন্দ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল-মামুন, কাজী আবুল কাশেম, মনিরউদ্দীন ইউসুফ, আবদার রশীদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আবদুশ শাকুর, ড. জহুরুল হক, ড. আহমদ রফিক, শামসুল হক, আবু শাহরিয়ার, দিলওয়ার, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন কাদির, ড. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, আল-কামাল আবদুল ওহাব, নেয়ামাল বাসির, ওমর আলী, রফিক আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ, লায়লা সামাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল কাসেম ফজলুল হক, ড. হালিমা খাতুন, রাজিয়া মাহবুব, ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গুণ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ড. গোলাম মুরশিদ, ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, মামুনুর রশীদ, মহাদেব সাহা, সুব্রত বড়ুয়া, খালেক দাদ চৌধুরী, সেলিম আল্ দীন, আবুল হাসনাত (মোহাঃ ইসমাইল), মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, হায়াৎ মামুদ, গাজী শামছুর রহমান, বেলাল চৌধুরী, রশীদ হায়দার, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিক, হুমায়ুন আজাদ, আসাদ চৌধুরী, দ্বিজেন শর্মা, আবুবকর সিদ্দিক, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আজীজুল হক, ড. সৈয়দ আকরাম হোসেন, ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, জাহানারা ইমাম, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ইমদাদুল হক মিলন, মুনতাসীর মামুন, বশীর আল হেলাল, খালেদা এদিব চৌধুরী, ওয়াকিল আহমেদ, সিকদার আমিনুল হক, সৈয়দ আবুল মকসুদ, শাহরিয়ার কবির, মঈনুল আহসান সাবের, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সন্জীদা খাতুন, মঞ্জু সরকার, নাসরীন জাহান, কায়সার হক, শামসুজ্জামান খান, আলী ইমাম, জাহিদুল হক, মোবারক হোসেন খান, আবু সালেহ, আবদুল হাই সিকদার, সাঈদ-উর-রহমান, মুশাররাফ করিম, আমজাদ হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু, মুহম্মদ আসাদ্দুর আলী, জাফর আলম, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ফরিদুর রেজা সাগর, রেজাউদ্দিন স্টালিন, মকবুলা মনজুর, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, হরিপদ দত্ত, আলী আনোয়ার, মুহাম্মদ ইব্রাহিম, মান্নান হীরা, আমীরুল ইসলাম, মনজুরে মওলা, যতীন সরকার, লুৎফর রহমান রিটন, ড. মাহবুব সাদিক, ড. করুণাময় গোস্বামী, হেলেনা খান, অরুণাভ সরকার, আনোয়ারা সৈয়দ হক, সুশান্ত মজুমদার, ড. আবুল আহসান চৌধুরী, রফিকুল হক, রুবী রহমান, নাসির আহমেদ, বুলবুল চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক অজয় রায়, শাহজাহান কিবরিয়া, অসীম সাহা, কামাল চৌধুরী, আনিসুল হক, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, বেলাল মোহাম্মদ, ডা. বরেন চক্রবর্তী, অধ্যাপক আলী আসগর, আখতার হুসেন, সানাউল হক খান, আবিদ আনোয়ার, অধ্যাপক হরিশংকর জলদাস, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হক, ড. ফখরুল আলম, মাহবুব আলম, তপন চক্রবর্তী, মাহবুব তালুকদার, হেলাল হাফিজ, পূরবী বসু, মফিদুল হক, জামিল চৌধুরী, প্রভাশু ত্রিপুরা, অধ্যাপক কায়সার হক, হারুণ হাবীব, মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, কাইজার চৌধুরী, আসলাম সানী, শিহাব সরকার, জাকির তালুকদার, অধ্যাপক শান্তনু কায়সার, অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, মঈনুস সুলতান, খালেক বিন জয়েনউদদীন, আলতাফ হোসেন, শাহীন আখতার, আবুল মোমেন, অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুস সেলিম, তাজুল মোহাম্মদ, ফারুক চৌধুরী, মাসুম রেজা, শরীফ খান, সুজন বড়ুয়া, আবু হাসান শাহরিয়ার, মোরশেদ শফিউল হাসান, ড. নিয়াজ জামান, ডা. এম এ হাসান, নূরজাহান বোস, রাশেদ রউফ, মোহাম্মদ সাদিক, মারুফুল ইসলাম, মামুন হুসাইন, মাহবুবুল হক, রফিকউল্লাহ খান, আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, কামরুল হাসান ভূঁইয়া, সুরমা জাহিদ, শাকুর মজিদ, মলয় ভৌমিক, মোশতাক আহমেদ, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, কাজী রোজী, মোহিত কামাল, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, আফসান চৌধুরী, মাকিদ হায়দার, ওয়াসি আহমেদ, স্বরোচিষ সরকার, খায়রুল আলম সবুজ, রতন সিদ্দিকী, রহীম শাহ, রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, নাদিরা মজুমদার, ফারুক মঈনউদ্দীন, সাইমন জাকারিয়া, মুহাম্মদ সামাদ, ইমতিয়ার শামীম, বেগম আকতার কামাল, সুরেশ রঞ্জন বসাক, রবিউল আলম, আনজীর লিটন, সাহিদা বেগম, অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেরদৌসী মজুমদার এবং ড. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান।

নাটক সাহিত্যের অন্যতম একটি মাধ্যম। দৃশ্যকাব্য নামে পরিচিত এই মাধ্যমটিতেও উঠে এসেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এ পর্যায়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মমতাজউদদীন আহমদের নাম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তাঁর রচিত নাটকগুলো হচ্ছে স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম, বর্ণচোর, বকুলপুরের স্বাধীনতা, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, ক্ষত বিক্ষত, সাতঘাটের কানাকড়ি, জিয়া হায়দারের সাদা গোলাপে আগুন, নীলিমা ইব্রাহিমের যে অরণ্যে আলো নেই, আলাউদ্দিন আল আজাদের নিঃশব্দ যাত্রা, নরকে লাল গোলাপ, সৈয়দ শামসুল হকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, রণেশ দাশগুপ্তের ফেরী আসছে উল্লেখযোগ্য। নাটকগুলোর মধ্যে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মঞ্চ সফল নাটক। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরের সময়ের স্বৈরশাসন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লিখিত

মঞ্চ ও পথ নাটকগুলো সাড়া জাগায় সারা দেশে। ১৯৭২ থেকে ৩০ বছর অবধি দেশে এসব নাটক মঞ্চায়ন। এ সময়ে আমাদের নাট্য সাহিত্যকে মৌলিক সত্তায় প্রধানত যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন সাঈদ আহমদ, মমতাজউদদীন, কল্যাণ মিত্র. সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, এস এম সোলায়মান, ইনামুল হক, নিরঞ্জন অধিকারী, মলয় ভৌমিক, মাসুম আজিজ, কাজী রফিক, মান্নান হীরা, সাদেক বাচ্চু, আজিজুস সামাদ, রানা নাসের, শামসুল আলম বকুল, বাবুল বিশ্বাস প্রমুখ। সাঈদ আহমদের 'প্রতিদিন একদিন'; আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়'; 'এখনও ক্রীতদাস' ও 'তোমরাই'; মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'ইবলিশ'; সেলিম আল দীনের 'কেরামত মঙ্গল', নাসিরউদ্দীন ইউসুফের 'একাত্তরের পালা', এস এম সোলায়মানের 'ইঙ্গিত', 'এই দেশে এই বেশে' উল্লেখ করার মতো মঞ্চ নাটক।

বাংলাদেশের সাহিত্যে নাটক যে বিচিত্র সম্ভাবনার পথে গেছে তাঁর কারণও আমাদের স্বাধীনতা। যুদ্ধফেরত মুক্তিকামী মানুষের আত্মাকে পড়তে পেরেছিলেন আমাদের নাট্যকারেরা। স্বাধীনতার আগে লিখতেন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, তাঁদের নাট্য রচনার গতি থিতিয়ে আসে। ব্যতিক্রম ছিলেন মুনীর চৌধুরী তিনি স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নিয়ে নাটক রচনা ও তার মঞ্চায়ন করেছিলেন। আমরা আরও লক্ষ করি যে, নতুন এক ঝাঁক লেখককে নাটকের হাটে। এদের সবাই যে খুব মানসম্পন্ন নাটক লিখেছেন, তা নয়। তবে এসময় নাট্যকারদের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হন মঞ্চনাটকের জড়িত নাট্যকর্মীরা। এরা বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোক নাট্যধারা থেকে তারা রসদ সংগ্রহ করেছেন। মুনীর চৌধুরীর নাট্য ভাবনার মৌলিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেন অনেকে।

প্রবন্ধ সাহিত্যে আমাদের কাজ সুবিশাল। কবি, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও নাট্যজন অনেকেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যের অন্য শাখার বিখ্যাতজনরাও ৫০ বছরে লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ

প্রবন্ধ সাহিত্যে আমাদের কাজ সুবিশাল। কবি, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও নাট্যজন অনেকেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যের অন্য শাখার বিখ্যাতজনরাও ৫০ বছরে লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ। অন্যান্য শাখার মতো অধিকাংশ প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত হয় বেশকিছু প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য এম আর আখতার মুকুলের 'আমি বিজয় দেখেছি', শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের রণাঙ্গন', সেলিনা হোসেনের 'একাত্তরের ঢাকা', মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস', মেজর রফিকুল ইসলামের 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি', রফিকুল ইসলামের (বীর উত্তম) 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে', কাজী জাকির হাসানের 'মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', আসাদ চৌধুরীর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ', হেদায়েত হোসেন মোরশেদের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম,' 'ঢাকায় গেরিলা অপারেশন', রশীদ হায়দার সম্পাদিত '১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা'। পান্না কায়সার সম্পাদিত 'হৃদয়ে একাত্তর'। প্রবন্ধে লোকসাহিত্যে বড়ো অবদানের জন্য শামসুজ্জামান খানের নাম বলতেই হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোকিত অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরা হলেন সরদার ফজলুল করিম, অজয় রায়, কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, আহমদ রফিক, আনিসুজ্জামান, আহমদ শরীফ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, দ্বিজেন শর্মা, করুণাময় গোস্বামী, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সন্তোষ গুপ্ত, নির্মল সেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নরেন বিশ্বাস, আবুল কাসেম ফজলুল হক, আহমদ ছফা, সৈয়দ আকরাম হোসেন, খান সারওয়ার মুরশিদ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সনৎ কুমার সাহা, মোবাশ্বের আলী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, কামাল লোহানী, যতীন সরকার, গোলাম মুরশিদ, হায়াৎ মামুদ, ফয়েজ আহমেদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সাঈদ-উর-রহমান, সন্‌জীদা খাতুন, হাসান ফেরদৌস, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মফিদুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন, আতিউর রহমান, সুকুমার বিশ্বাস, আলী যাকের, স্বরোচিষ সরকার, মতিন বৈরাগী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সরকার আবদুল মান্নান, পিয়াস মজিদ প্রমুখ।

অর্ধশত বছরে অনুবাদ সাহিত্য খুব একটা এগোয়নি। সত্তর ও আশির দশকে এ ক্ষেত্রে উত্তরণ লক্ষ করা গেছে। হাতেগোনা যে ক'জন সাহিত্যের অনুবাদে হিরন্ময় হয়ে আছেন তাঁরা হলেন কবীর চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুস সাত্তার, সরদার ফজলুল করিম, আবদুল হাফিজ, মনিরউদ্দীন ইউসুফ, আবদার রশীদ, নেয়ামাল বাসির, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, গাজী শামসুর রহমান, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, ফকরুল আলম, কায়সার হক, আবদুস সেলিম, সুরেশ রঞ্জন বসাক, নিয়াজ জামান, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, খায়রুল আলম সবুজ ও হাইকেল হাশমী এ সময়ের আলোকিত অনুবাদক।

৫০ বছরে আমাদের দেশের সাহিত্যে সাময়িকীর পর্যাবৃত্ত সংখ্যা অর্থাৎ লিটল ম্যাগাজিন বা লিটল ম্যাগ বড়ো অবদান রেখে আসছে। আধুনিক যন্ত্রকৌশলের ডিজিটাল দুনিয়ায় এসবের আঙ্গিক বেশ রুচিশীল ও সমৃদ্ধ এখন। প্রতিষ্ঠিত লেখকগণও লিটল ম্যাগে লিখছেন।

সমালোচনা সাহিত্য অর্থাৎ সত্তর, আশি ও নব্বই- তিন দশকে আমরা সরব ছিলাম। সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা অধিকাংশ লেখকই পছন্দ করেন না। শূন্য দশক থেকে এখন অবধি সমালোচনার নামে যা দেখি তা লেখা পরিচিতির পর্যালোচনা এবং প্রশংসার অতি কথন।

আদি ছড়ার রূপ-রস-ছন্দ প্রকরণ আঁকড়ে ধরে বাংলাদেশের ছড়ার সূচনালগ্নে আমাদের অধিকাংশ কবিই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন

করেছেন। জসীমউদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, খাঁন মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, সানাউল হক, হোসনে আরা, কাজী আবুল কাশেম, হাবীবুর রহমান, সরদার জয়েনউদ্দীন, মযহারুল ইসলাম, রোকনুজ্জামান খান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান জান, মনোমোহন বর্মন, হালিমা খাতুন, কাজী লতিফা, আতোয়ার রহমান, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমেদ, আবদার রশীদ প্রমুখ।

একেবারে সমকালীন নানান বিষয়কে উপজীব্য করে এরপর ঝাঁক ঝাঁক ছড়া নিয়ে হাজির হন কিছু কীর্তিমান ছড়াকার। এঁদের মধ্যে যে নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন নিয়ামত হোসেন, হোসেন মীর মোশাররফ, ফজল-এ-খোদা, রফিকুল হক, সুকুমার বড়ুয়া, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, গোলাম সারওয়ার, আবু কায়সার, মাহমুদউল্লাহ, আখতার হুসেন, রশীদ সিন্‌হা, প্রণব চৌধুরী, আবু সালেহ, কাজী রাশিদা আনওয়ার, শামসুল হক দিশারী, সিরাজুল ফরিদ, মসউদউশ শহীদ, আলতাফ আলী হাসু, খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন, দীপংকর চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মেধাদীপ্ত ছড়াকাররা ছড়ার ছন্দ বিন্যাস ও নানা নিরীক্ষাধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই দীর্ঘ তালিকার প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকজনের নাম হচ্ছে আবু জাফর সাবু, লুৎফর রহমান রিটন, তপংকর চক্রবর্তী, বিমল গুহ, সুখময় চক্রবর্তী, শাহাবুদ্দীন নাগরী, অজয় দাশগুপ্ত, শামসুল হক দিশারী, রোকেয়া খাতুন রুবী, আবু হাসান শাহরিয়ার, সৈয়দ আল ফারুক, ফারুক নওয়াজ, নাসির আহমেদ, আসলাম সানী, হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, জ্যোতির্ময় মল্লিক, আমীরুল ইসলাম, আহমাদউল্লাহ, হাসান হাফিজ, আহমাদ মাযহার, খালেদ হোসাইন, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, ফজিলাতুন নাহার রুনু, লীনা চৌধুরী, জাকির তালুকদার, আলম তালুকদার, ফারুক হোসেন, উৎপল কান্তি বড়ুয়া, প্রবীর বিকাশ সরকার, সজল দাশ, আলী হাবিব, বিলু কবীর, তুহীন রহমান, আনিস রহমান, জাকির আবু জাফর, মাহবুবা হক কুমকুম, আনজীর লিটন, টিপু কিবরিয়া, আনোয়ারুল কবীর বুলু, সৈয়দ নাজাত হোসেন, রংগু শাহবুদ্দীন, সজল আশফাক, অমিতাভ দাশ হিমুন, বাপী শাহরিয়ার, হাসনাত আমজাদ, প্রণব মজুমদার, আবদুর রহমান বিক্রম, রহীম শাহ্‌, হোসেন আনোয়ার, বদরুল বোরহান, মিহির মুসাকী, শফিক ইমতিয়াজ, রাশেদ রউফ, গোলাম নবী পান্না, মনসুর হেলাল, ওবায়দুল গনি চন্দন, সিকদার নাজমুল হক, মিয়া মনসফ, তপন বাগচী, সারওয়ার-উল-ইসলাম, ওয়াসিফ এ খোদা, অদ্বৈত মারুত প্রমুখ।

এ সময়কালে বিদেশি ছড়ার অনুকরণে বাংলা ভাষার ছড়ার আদল বা আঙ্গিক নির্মাণের প্রচেষ্টাও কোনো কোনো ছড়াকারের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষত জাপানি হাইকুর আঙ্গিকে বাংলায় হাইকু চর্চার চেষ্টা আমাদের ছড়া সাহিত্যের দিগন্তে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। শুধু হাইকু নয়, ক্লেরিহিউ নামে আরও এক প্রকার বিদেশি ছড়া আঙ্গিকের চর্চাও সাম্প্রতিক অতীতে বাংলা ভাষায় রচিত ছড়ার বলয়কে করেছে সম্প্রসারিত।

বাংলায় ছড়া চর্চার পাশাপাশি কিশোর কবিতার কথাও সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে হয়।

ছড়া বা কিশোর কবিতার তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও শিশুতোষ রূপকথা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখে ছোটদের মানস গঠন এবং নির্মল আনন্দ দানে যারা ভূমিকা পালন করেছেন, তাদেরও মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জসীমউদ্‌দীন, হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ নাসির আলি, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মোদাব্বের, সাজেদুল করিম, আতোয়ার রহমান, রাবেয়া খাতুন, স্বপন কুমার গায়েন, হালিমা খাতুন, এখলাসউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ূন আজাদ, রাহাত খান, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, মকবুলা মঞ্জুর, আনোয়ারা সৈয়দ হক, সেলিনা হোসেন, শাজাহান কিবরিয়া, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, কাইজার চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, আলী ইমাম, হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, হেলেনা খান, শাহজাহান তপন, ভবেশ রায়, খালেদা এদিব চৌধুরী, দিলারা মেসবাহ, ঝর্ণা রহমান, মিলা মাহফুজা, তাহমিনা কোরাইশী, জুবাইদা গুলশান আরা, আফরোজা পারভীন, মঈনুল আহসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন, ফরিদুর রহমান, অঞ্জন নন্দী, নীতিশ সাহা, আমজাদ হোসেন, ফরিদুর রেজা সাগর, মঞ্জু সরকার, শরীফ খান, রোকেয়া খাতুন রুবী, আমীরুল ইসলাম, আনিসুল হক, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, নশরত শাহ, মনি হায়দার, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, মো. রেজাউল করিম, ধ্রুব এষ, মাহবুব রেজা, অমল সাহা, আবু সাঈদ জুবেরী, মোস্তফা হোসেইন, শাকিল কালাম, আশরাফুল আলম পিন্টু, রণজিৎ সরকার, জ্যোস্নালিপি, অরুণ কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

স্যাটেলাইট টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবস্থার সঙ্গে নব্বইয়ের দশকেই আমাদের পরিচয় ঘটে। শূন্য দশকে এসে এগুলোর ব্যবহার মাত্রা বেড়েছে বহুগুণ। বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। নিজস্ব বৃত্ত ভেঙে এখন আমরা বিশ্বায়নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। ব্যক্তি এখন নিজেকে বিশ্বায়নের আয়নায় পর্যবেক্ষণ করে, তার সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

নব্বইয়ের দশকে উত্তরাধুনিক চেতনা বাংলাদেশের সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও তা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা। তারপরও এ ধারণাকে মাথায় রেখে অনেকে সাহিত্য চর্চা চালিয়েছেন। বাঁক বদল ঘটাতে চেয়েছেন নিজেদের সৃষ্টির গতিপথ। কতটা সফল হয়েছেন তারা, তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সময় থেকে পিছিয়ে যে পড়েননি, সামনের দিকেই হেঁটেছেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে শূন্যের দশকে উত্তরাধুনিক আন্দোলন অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আগের তুলনায় আমাদের সাহিত্যিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছরই নতুন লিখিয়েরা যুক্ত হচ্ছেন। নতুন ও পুরোনোদের মধ্যে অনেকে অবশ্য হারিয়েও যাচ্ছেন। প্রতিদিনই রচিত হচ্ছে সাহিত্য। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে আজ অবধি প্রযুক্তিগত কারণে মুদ্রণ কাজ সহজতর হওয়ায় মিডিয়া ও প্রকাশনা শিল্প, এ দুটোই এ দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সপ্তাহান্তে দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীর পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে প্রচুর কবিতা ও গল্প। সাহিত্যে সর্বশেষ সংযোজিত মাধ্যম হলো তথ্য ও প্রযুক্তির সামাজিক যোগাযোগ। লেখা প্রচারে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম বেশ জনপ্রিয়। মুক্তিযুদ্ধের পরপর স্বাধীন বাংলাদেশে সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে পেয়েছিলাম দেয়ালিকা। আর এখন ই-পেপার ও ই-বুক। প্রযুক্তি অগ্রসর হচ্ছে। সাহিত্যের জোয়ার যাত্রার হয়তো আর কিছু নতুন মাধ্যম যুক্ত হবে। ই-বুকের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম মনে হয় সেদিকেই তাকিয়ে আছে।

তথ্য সহায়তা

বাংলাদেশের সাহিত্য : স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ⇨ মোস্তফা তারিকুল আহসান
বাংলাদেশের সাহিত্য ⇨ বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা
বাংলাদেশের গল্প : সত্তর দশক ⇨ বাংলা একাডেমি, ঢাকা
বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য ⇨ রফিকুর রশিদ
মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চ নাটক ⇨ প্রণব মজুমদার, পাক্ষিক শৈলী, ঢাকা ১৯৯২
বাংলা কবিতার পঞ্চাশ বছর, অরণি, সম্পাদক ও প্রকাশক ⇨ মাহমুদ কামাল

লেখক : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

প্র ব ন্ধ

৫০ বছরে শিক্ষার রূপ-রূপান্তর

ড. মিল্টন বিশ্বাস

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, এর মূলে রয়েছে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন। ১৯৭১-এর আগে পাকিস্তান আমলে শিক্ষাকে ইসলামীকরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববাংলার গড়ে তোলা হয়েছিল বৈষম্য। পাকিস্তান আমলে ছাত্রসমাজের শিক্ষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর সেই আন্দোলনে সম্পৃক্ততা একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোয় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন কিংবা ১৯৭৩ সালের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ১৯৭৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষা টেকিং ওভার অ্যাক্ট, মাদ্রাসা শিক্ষা অর্ডিন্যান্স অর্ডার (১৯৭৩), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অ্যাক্ট (১৯৭৩) এবং দ্য বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন অর্ডার (১৯৭২) প্রভৃতির কথা স্মরণে রেখে বলা যায়, শিক্ষার রূপ-রূপান্তর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে শুরু হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে এর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

২.

মূলত আধুনিক, বৈজ্ঞানিক, অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর আমলে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর বেতার-টেলিভিশন ভাষণে বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না।' ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির

অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে চার ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সব শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিক্যাল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যেন উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।'

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বৈষম্যহীন সমাজ তৈরিতে মনোযোগী ছিলেন। স্বপ্ন দেখতেন পাকিস্তান আমলের সব বৈষম্য নিরসনের। ভাবতেন স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যেন একটি সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের সন্তানরা বেড়ে উঠতে পারে সংস্কারমুক্ত পরিবেশে।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্নির্মাণ করা এবং স্বাধীন দেশের উপযোগী পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশের দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হয়। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য শিক্ষক শহিদ হওয়ায় তাদের পদগুলো পূরণ করা, নয় মাস শিক্ষকদের বেতন বন্ধ ছিল–সেই বেতন পরিশোধ করাও ছিল গুরুদায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রসমাজ যে নিদারুণ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেতন মওকুফ করা হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সম্মতিক্রমে ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন। এর অধিকাংশ অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণে ব্যয় হয়। ১৯৭২ সালে ভাষার মাসে, ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। স্কুল-কলেজের বেতনও পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই প্রদান করবে সরকার। সেই সঙ্গে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৪০ শতাংশ কম দামে বই দেওয়া হবে। নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের অবদান আছে। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ফলে নারী শিক্ষার জন্য যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ সূচিত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা নিয়ে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, 'শিক্ষার্থীরা যেন শুধু ডিগ্রিধারী না হয়ে বরং সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষিত হয়ে দেশের কাজে ভূমিকা রাখতে পারে, এই লক্ষ্যে তাদের পাঠদান করাই হবে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।' এজন্য তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। গণমুখী শিক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে মিল রেখেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে তিনি এই শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশন ১৯৭৪ সালের ৩০ মে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন শিরোনামে ৩০৯ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব, মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা, প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূলে শিক্ষা, কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান, নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলি, সৃজনশীলতা ও গবেষণা এবং সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি স্বৈরশাসকদের দ্বারা অবহেলিত হয় এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে দেশের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নমুখে ধাবিত হয়।

৩.

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর এদেশে শিক্ষার অগ্রগতি পুনরায় সঠিক পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। বিএনপি-জামায়াত ও সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ২০০১ থেকে ২০০৮ অবধি সেই অগ্রগতি থমকে দাঁড়ালেও ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা সেক্টরে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিশদ। এজন্য 'শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান হবে একটা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণের মাপকাঠি'–এই মুখ্য মন্ত্র আজকের শিক্ষার চালিকাশক্তি। একইভাবে উচ্চশিক্ষায় গবেষণা কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, 'উচ্চশিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এখন বেশি জোর দিতে হবে গবেষণার ক্ষেত্রে। তবেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে নয়, বরং শিক্ষার গুণগত মান হবে একটা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণের মাপকাঠি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে উচ্চশিক্ষা তথা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সূতিকাগার।'

বর্তমান সরকারের সাড়ে ১২ বছরে দেশের ৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ও দক্ষ উপাচার্য নিয়োগ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রশংসা অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জীবনবৃত্তান্ত, একাডেমিক সাফল্য পর্যালোচনা করেই তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমত, উপাচার্যরা নিয়োগ পেয়েছেন একাডেমিক যোগ্যতায়। এরপর তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও সংস্কারমুক্ত মুক্তবুদ্ধির অনুসারী কি না, তা বিবেচনায় এনে প্রশাসনিক পদে পাঠানো হয়।

৪.

মনে রাখতে হবে, মানবজাতির কল্যাণকর, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি শিক্ষার মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।' তিনি আরও বলেছেন, 'শিক্ষা হলো, বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধন।' মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে নানা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ হয়। উন্নত মানসিক বিকাশের ক্রমচর্চার মধ্য দিয়ে নৈতিকতার পরিগঠনের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি ঘটে। এজন্য বলা হয়ে থাকে–দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে নিজেকে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। শিক্ষা মানবজীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ কখনোই খোয়া যায় না বা বিলুপ্ত হয় না। বেঁচে থাকার জন্য, নিজেকে অভিযোজিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন এবং দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের প্রথম সরকার কর্মকাণ্ড শুরু করে। এখন ২০২১ সাল 'মুজিববর্ষ'। এই দীর্ঘ প্রায় পাঁচ

দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে, পালটে গেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি, নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের চিন্তাচেতনা। পাকিস্তান আমলে শিক্ষাপদ্ধতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি করেছিল। একাধিক শিক্ষাপ্রণালি ছিল এর মূল কারণ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন'-এর রিপোর্টে এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নানারূপ বৈষম্য অবসানের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাকিস্তানের পুরোনো ভূত ভর করে। ১৯৭৩ সালে চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, এরও মৃত্যু ঘটে পঁচাত্তর-পরবর্তী স্বৈরশাসকদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি হস্তক্ষেপের কারণে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ব্যাপক উন্নয়নের জোয়ার চলছে। ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় ভালো সাফল্য দেখাচ্ছে। রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজাদপুর-শিলাইদহে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর নতুন উৎসাহে একাডেমিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। যুগান্তকারী এসব উদ্যোগ চার দশকের শিক্ষাচিত্রে অনন্য সংযোজন।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং তা বিশ্ব পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর আলোকে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ২০১২' প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। দু-একটি বাদে এতদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় প্রচলন ছিল না। বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অনুরোধ রক্ষা করেছে অনেকেই; স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগে বাংলা ভাষা-সাহিত্য পড়ানো হয়। বাংলাদেশে বিদেশি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থান ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

ইউজিসির বদৌলতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণা কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিমাসে পোস্ট ডক্টোরালে ৫০ হাজার এবং পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষণার জন্য ৩০ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া গবেষণা প্রকল্পেও অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। 'হেকেপ'সহ বেশকিছু প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উপপ্রকল্পে কয়েক শ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে গবেষণায় এর আগে এত বরাদ্দ কখনো দেওয়া হয়নি। গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সংযুক্তি একটি অনিবার্য দিক। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক যোগাযোগে উচ্চ গতিসম্পন্ন ডেটা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই ইউজিসি ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ-এর মধ্যে কোম্পানিটির দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ২০ বছরব্যাপী ব্যবহার বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ও এসএমএস-এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদনপত্র ও ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার আগে ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রদেয় গবেষণা সহায়তা মঞ্জুরি অনলাইনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ ইউজিসিতে আয়োজিত 'অনলাইন সাবমিশন ফর রিসার্চ গ্র্যান্টস' সফটওয়্যার উদ্‌বোধন করেন। তাঁর মতে, 'অনলাইন সাবমিশন ফর রিসার্চ গ্র্যান্টস সফটওয়্যারটি ব্যবহার করলে কাউকেই আর ইউজিসিতে গবেষণা সহায়তা মঞ্জুরির জন্য আসতে হবে না। এর মাধ্যমে সেবা দ্রুত পাওয়া যাবে। এটি ইউজিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং কর্মপরিবেশ উন্নত করবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশিত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সাড়ে ১২ বছরে উচ্চশিক্ষাঙ্গনের অশান্ত পরিস্থিতিকে দ্রুত স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা ও উচ্চ মানসম্পন্ন মনন সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। মুক্তচিন্তার চর্চা, নিরাসক্তভাবে সত্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য, যার প্রধান অবলম্বন হলো গবেষণা।

> ১৯৭৩ সালে চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, এরও মৃত্যু ঘটে পঁচাত্তর-পরবর্তী স্বৈরশাসকদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি হস্তক্ষেপের কারণে

৫.

বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফলের গড়ের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের পর ডিসেম্বরে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল অটোপাশ হিসাবে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ২০২০ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা সরাসরি গ্রহণ না করে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষা না নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন শিক্ষা বোর্ডগুলোর জন্য একেবারেই নতুন।

৬.

৫০ বছরের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, 'শিক্ষানীতি-২০১০' সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া। শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, প্রায় ১০ বছর আগে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই এখন শিক্ষানীতিকে সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার শিক্ষানীতি সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দেশের ক্রান্তিলগ্নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ৬৪ জেলার ৮ হাজার ৪৯২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) নন-এমপিও ৮০ হাজার ৭৪৭ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা হারে এবং ২৫ হাজার ৩৮ জন নন-এমপিও কর্মচারীর প্রত্যেককে ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে মোট ১ লাখ ৫ হাজার ৭৮৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর 'বিশেষ অনুদান'-এর খাত থেকে ৪৬ কোটি ৬৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ৬৪ জন জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের তালিকাভুক্ত EIIN-ধারী নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশালসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর হালনাগাদ তথ্যাদি ইতঃপূর্বে সংগ্রহ করে ডেটাবেজ তৈরি করা হয় এবং স্থানীয় প্রাশাসনের মাধ্যমে নামের তালিকা যাচাই-বাছাই করা হয়। সেই তালিকার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর 'বিশেষ অনুদান' খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ জেলা প্রশাসকরা সংশ্লিষ্ট নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে চেক/ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ২০২০ সালের জুনে বিতরণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, করোনা মহামারির চলমান দুর্যোগকালীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিশালসংখ্যক নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর অনুকূলে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ অনুদান এবং ইতঃপূর্বে গত অর্থবছরে নতুন ২ হাজার ৭৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিসহ ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্তির আওতায় এনে তাদের বেতনভাতাসহ চাকরি সুনিশ্চিত করা শেখ হাসিনা সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। করোনাকালে রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষাবান্ধব সরকারে পরিণত হয়েছেন শেখ হাসিনা।

৭.

অনলাইনে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'অনলাইনে বিজ্ঞানশিক্ষা কোনোভাবেই করা যাবে না তা নয়। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল ল্যাবরেটরি রয়েছে। এটি অসম্ভব তা নয়। যত রকমের চ্যালেঞ্জ থাকুক আমরা তা মোকাবিলা করব। আওয়ামী লীগ ও সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারেও এটি রয়েছে। আমাদের কোথাও আটকে রাখার সুযোগ নেই। আমাদের আটকে রাখতে পারে আমাদের মাইন্ড সেট। তাই আমাদের মাইন্ড সেট পরিবর্তন করতে হবে।' এখানে উল্লেখ্য, ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে তিনটি মোবাইল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট প্যাকেজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর চেষ্টায় জুমে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ ঘটেছে শিক্ষকদের।

এসএসসি ও এইচএসসির সিলেবাস কমানো হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনো গ্রহণ করা হয়নি। আসলে সংকট পুষিয়ে নিতে গত শিক্ষাবর্ষ ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হবে কি না, না ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকবে, তা ভাবনা-চিন্তা চলছিল। শিক্ষাবর্ষ বাড়ানো হলে ২০২১ সালের ঐচ্ছিক ছুটি কমানোর প্রয়োজন হবে। একটি শিক্ষাবর্ষে ১৪০-১৪২ দিন পড়ানো হয়। বাকিটা ছুটি থাকে। তাই ২০২০ সালের শিক্ষাবর্ষ বাড়াতে হলে ২০২১ সালের ছুটি কমিয়ে হলেও তা করা হবে বলা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা অর্জনের দিকটিতে আপস করা হবে না। কারিগরি শিক্ষায় যতটুকু শিখনফল ও দক্ষতা কাম্য, সেটুকু যদি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, শিশুদের উপযোগী রঙিন রূপক এবং প্রতীক দিয়ে অ্যানিমেশনটি তুলে ধরেছে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির চারটি মূলনীতি–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং জাতীয়তাবাদ। যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ছোটো মেয়েকে পাখির বাসা তৈরি শেখান, সঙ্গে তিনি বলে যান সেসব পেছনের গল্প যা জাতির জন্য একটি কাঠামো পরিকল্পনায় তার নীতি-আদর্শকে প্রভাবিত করেছিল।

জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অনলাইন ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শতকরা প্রায় ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে আমরা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। অনলাইনে পাঠদানে আজ নতুন একটি প্ল্যাটফরম চালু করা হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয় এটি ব্যবহার করতে পারবে।' এসময় শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন শিক্ষা সহজলভ্য করতে মোবাইল ও ইন্টারনেটের ওপর প্রস্তাবিত শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন।

৮.

৪৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দের কারণে অনেক কাজ সম্পন্ন হয় না। আবার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের অপচয় করা হয়। এজন্যই ২০২০ সালে বাজেট পাশের পর অক্টোবরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মদক্ষতা যাচাই করে বাজেট বরাদ্দের কথা বলা হয় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তরফ থেকে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে গড়ে তুলতে গবেষণায় বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হবে বলে জানায় ইউজিসি। কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযোজ্য নয়।

সব মিলে গত ৫০ বছরের মধ্যে করোনাকালে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার শিক্ষা খাত। এজন্য শিক্ষায় ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনা সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা যদি শিক্ষকদের সহযোগিতায় ঋদ্ধ হয়, তাহলেই উত্তরণ সম্ভব। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের হতাশার হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়গুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তাদের পথ দেখিয়ে দিতে পারলে স্বস্তি পাবে পরিবারগুলো। সব প্রতিকূল অবস্থা জয় করে শিক্ষার পরিবেশ আশাজাগানিয়া সময়কে ফিরিয়ে আনবে বলে আমরা মনে করি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিচারে নয় বরং মানসম্পন্ন শিক্ষাদান কেন্দ্রের পক্ষে কথা বলছি। যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মান বজায় রাখতে পারবে, তারাই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বে উজ্জ্বল করে তুলতে পারবে।

লেখক: ইউজিসি পোস্ট ডক্টোরাল ফেলো, কলামিস্ট
অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতে ৫০ বছর

রাজন ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন করা। বিশ্বমানচিত্রে নতুন করে জায়গা করে নেওয়া দেশকে এগিয়ে নিতে তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। খালি হাতে ফিরেননি তিনি। ভারতসহ মিত্র অনেক দেশ তখন বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। বাংলাদেশকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বিরাট এক স্বপ্ন জাতির পিতার চোখে-মুখে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে তিনি শুধু স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কথাই চিন্তা করেননি। একটি পরিকল্পিত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গোটা দেশকে এক করার স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। আজ যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে, এর অনেককিছুই তিনি নিজ হাতে করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যার ধারাবাহিকতায় আজ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। তেমনি বিশ্বমানের সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সবচেয়ে আশার কথা হলো–আগামী কয়েক বছরের মধ্যে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সড়কপথে আমদানি-রপ্তানিসহ যাতায়াত শুরু হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না–স্বাধীনতার ৫০ বছরে যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের সাফল্য একেবারেই আকাশচুম্বী। এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যদি বিবেচনা করা যায়, এক্ষেত্রেও যোগাযোগ বিপ্লবে এগিয়ে বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যখন গোটা জাতি উদ্‌যাপন করছে, তখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তেমনই কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেলের কাজও এগিয়ে চলছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে মেট্রোর যুগে প্রবেশ করছে

বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে রাজধানীতে আরও পাঁচটি মেট্রো লাইন নির্মাণ হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১২৮ কিলোমিটার পথ আসছে মেট্রোর আওতায়। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিআরটি প্রকল্পের সফলতা খুব কাছাকাছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বুলেট ট্রেন চালুর ঘোষণা এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে। এটা ঠিক, ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর থেকে প্রায় ১৩ বছর দলটির একটানা শাসনামলে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিরাট সাফল্য এসেছে। বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ খাতে যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা করে গিয়েছিলেন, সেগুলো তাঁর কন্যার হাত ধরেই এখন সমাপ্তির পথে।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন দেশটি মাত্র সাড়ে তিন বছর পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচি। একটি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় এমন কোনো বিষয় নেই যে, তিনি স্পর্শহীন রেখেছেন। রেখে গেছেন বাংলাদেশের সব উন্নয়নের শক্ত ভিত। খাদ্য নিরাপত্তা, যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ ও যোগাযোগব্যবস্থা সচল রাখা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে মোকাবিলা করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সর্বত্র ছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ধ্বংসলীলার ক্ষতচিহ্ন। নাগরিকদের খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব ছিল প্রকট। কলকারখানায় উৎপাদন শূন্যের কোঠায়, যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি চালু রাখা ও একেকটি শরণার্থীর পুনর্বাসনসহ দেশের সমস্যা ছিল অগণিত। এই পরিস্থিতির মধ্যে তিনি কখনো মানসিকভাবে দুর্বল হননি।

যমুনা সেতু

১৯৭৩ সালের ১৮-২৪ অক্টোবর জাপান সফরকালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের সূচনা করেন শেখ মুজিব। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু উন্নয়নের নানা দিক থেকে বীজ বপন করেছিলেন। কিন্তু ফল পাওয়ার জন্য যে সময়ের দরকার ছিল, তা তিনি পাননি। আজকের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ খাতের যে উন্নয়ন, যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, এর ভিত্তি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ওই আমলে।

১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় দিবসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুভেনিয়রে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়, তিনশর বেশি রেলসেতু এবং তিনশর বেশি সড়ক সেতু যুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনী ধ্বংস করেছে। ২৯টি জাহাজ ডুবিয়ে বন্দরের প্রবেশপথ অচল করে দেওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ হয়ে যায়।

পলায়নরত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বন্দরের চ্যানেলে মাইন পুঁতে যাওয়ায় দেশের প্রধান এই সমুদ্রবন্দর ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। তারা আত্মসমর্পণের আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নগদ টাকা ও মজুত স্বর্ণ জ্বালিয়ে দেয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সরিয়ে নেয়। এতে সদ্যস্বাধীন হওয়া এই দেশটি অর্থশূন্য হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার দেশের যোগাযোগব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ বিতরণ পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে দেশের বড়ো বড়ো সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন ভবন পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়, যা ছিল দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়।

পরবর্তী বছরগুলোয় সরকার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, তিস্তা ও ভৈরব রেলওয়ে ব্রিজ পুনর্নির্মাণ করে যানবাহনের জন্য খুলে দেয়। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাইন ও ভাঙা জাহাজ অপসারণ করে বন্দর চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় ছিল–১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত জনসভায় দেওয়া ভাষণে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেন। ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতি পুনর্নির্মাণ, সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষণটি অনেকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার একটি বিশদ রূপরেখা বা পরিকল্পনা হিসাবেও দেখা হয়। ভাষণে তিনি দেশের রাস্তাঘাট ও গৃহনির্মাণ এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য বিশ্বনেতাদের অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বের সব দেশের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, আমার বাংলাদেশে কোনো রাস্তা নেই, কোনো খাদ্য নেই। আমার জনগণ গত নয় মাসে তাদের গৃহ হারিয়েছে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই।' তিনি শীঘ্রই বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে সহায়তা করার জন্যও বিশ্ববাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে। ১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। এরপর প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক-বিমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্পকারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

সড়ক যোগাযোগে এরশাদের অবদান

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আবারও স্থবিরতা দেখা দেয়। সেই সঙ্গে ক্ষমতার পালাবদল, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বড়ো সমস্যা হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনানায়ক থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছিলেন, ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। ক্ষমতা গ্রহণ করে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের যোগাযোগব্যবস্থার দিকে নজর দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অনেক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতাও রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না করতে

পারলে অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। যোগাযোগ খাতে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া উদ্যোগগুলো এগিয়ে নিতে তিনি কাজ করেছেন।

স্বৈরশাসকখ্যাত এরশাদের আমলেও অসংখ্য রাস্তা, পুল, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ হয়েছে। তিনি প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার সড়ক পাকা করেছেন এবং দেড় হাজার ছোটো-বড়ো সেতু নির্মাণ করেছেন। মহানন্দা, ঘাঘট আর নাগর নদীতে সেতু নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন মেঘনা সেতু, কর্ণফুলি সেতু, বুড়িগঙ্গা সেতু, রামপুরা সেতু, টঙ্গী সেতু, টেকেরহাট সেতু, শম্ভুগঞ্জ সেতু, কামারখালী সেতু, বান্দরবানে সাংগু সেতু, পঞ্চগড় সেতু, সিলেটে শাহজালাল-লামা কাজী সেতুসহ অসংখ্য সেতু।

এরশাদ রাজধানীকে যানজটমুক্ত রাখারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রোকেয়া সরণি, প্রগতি সরণি, মুক্তি সরণি, বিজয় সরণি, পান্থপথ, জনপথ, নর্থ সাউথ রোড, সোনারগাঁও রোড, লিংক রোডসহ অসংখ্য রাস্তা করেছেন তিনি। এলাকার নামকরণের দিক থেকেও তিনি বেশ পটু ছিলেন। ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সায়েদাবাদ, মহাখালী ও গাবতলী তিনটি বড়ো বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়েছে তার আমলে।

তিনি ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০ ফুট প্রশস্ত নগরবাড়ী-রংপুর এবং দিনাজপুর-পঞ্চগড় সড়ক নির্মাণ করেছেন। তিনি চারটি ডিসি-১০ বিমান ক্রয় করে অত্যন্ত নাজুক অবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিমানকে সম্প্রসারিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ বিমানব্যবস্থায় দুটি এটিপি ক্রয় এরশাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এরশাদের আমলে আন্তঃনগর ট্রেনব্যবস্থা চালু হয়। এছাড়া ডিজিটাল সিস্টেমসহ দেশে বিদেশে সরাসরি টেলিযোগাযোগে আধুনিকায়নের সূচনাও করেছেন তিনি। ৯ বছরের শাসনামল শেষে প্রবল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

আশির দশকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিম্নাঞ্চলীয় রাস্তা নির্মাণ করা হয়। চীনের সহায়তায় বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেন এরশাদ। এছাড়াও ছোটো-বড়ো ৫৮০টি সেতু নির্মাণ করেন তিনি। জাপানের সহায়তায় মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা চূড়ান্ত, খুলনা-মোংলা ও কুমিল্লা-চান্দিনা বাইপাস সড়ক এবং সিলেট থেকে ভৈরব হয়ে ঢাকা সড়ক নির্মাণ করেন এরশাদ। রেলওয়ের ৩০টি ইঞ্জিন, ১,২৫৫টি মালবাহী বগি সংগ্রহ করেন এবং ১০৬টি যাত্রীবাহী বগি সংগ্রহের উদ্যোগ নেন।

বিএনপির উন্নয়নচিত্র

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের পর নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথমে প্রধান সামরিক প্রশাসক এবং পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তার দল জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন-১৯৭৯ বলে ৯ এপ্রিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের শেষ অর্থবছরে (১৯৮০-৮১) জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ হাজার ১০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। জিয়াউর রহমানের আমলে রাস্তাঘাট নির্মাণ গুরুত্ব পায়। কিন্তু বড়ো বড়ো প্রকল্প নির্মাণের দিকে খুব একটা জিয়া সরকারকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়নি। এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে আবারও ক্ষমতায় আসে বিএনপি। তখনও যোগাযোগ খাতে ধারাবাহিক কাজকর্ম এগিয়ে নেওয়া ছাড়া বড়ো ধরনের তেমন কোনো সফলতা দেখা যায়নি।

২০০১-২০০৬ সাল : ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। তখনও দেশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে ধারাবাহিকতা দেখা যায়। দেশের সবকটি প্রধান হাইওয়ের উন্নয়ন, বড়ো বড়ো নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, চট্টগ্রামে নিউমুরিং টার্মিনাল নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়ন, ভৈরবের কাছে মেঘনা সেতু নির্মাণ ও মুন্সীগঞ্জে ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলি নদীর ওপর তৃতীয় সেতু নির্মাণকাজে অগ্রগতি, চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্টে নতুন দুটি টার্মিনাল বিল্ডিং নির্মাণ–এসবই বিগত বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছরে যোগাযোগ খাতে সাফল্য হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো–বিগত (শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১) সরকারের অনেক উন্নয়ন কাজ পরবর্তী সরকার ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়।

> বঙ্গবন্ধু সদ্যস্বাধীন দেশটি মাত্র সাড়ে তিন বছর পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবায়ন করেছিলেন অনেক অসাধ্য কর্মসূচি

উন্নয়নের এক যুগ

যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের স্বর্ণযুগ পার করছে বাংলাদেশ। গত প্রায় ১৩ বছর আগে এ স্বর্ণযুগের যাত্রা শুরু। আওয়ামী লীগ সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে একের পর এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এখন এর অনেকেই শেষ পর্যায়ে। স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে যোগাযোগ সেক্টরে সবচেয়ে মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান। এসব প্রকল্পের বেশকিছু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। মুক্তিযুদ্ধের পর এত দীর্ঘ সময় কোনো সরকারই টানা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর ১৯৯৬ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগাযোগ সেক্টরকে এগিয়ে নিতে বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটি পরিকল্পনার কথা জাতির কাছে তুলে ধরেছিলেন। স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যোগাযোগ বিপ্লবের। কিছু প্রত্যাশার সফল সমাপ্তি

হলেও সব পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। ক্ষমতা ছাড়ার পর যোগাযোগ সেক্টরের চলমান অনেক প্রকল্প রাজনৈতিক বিবেচনায় বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেসব প্রকল্প ছিল একেবারেই সমাপ্তির পথে, সেগুলো শেষ করে কৃতিত্ব নিয়েছিল বিএনপি সরকার।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ অর্জন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জিওবি অর্থায়নে ১৮৯টি, বৈদেশিক সহায়তায় ১৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তার ১২টি প্রকল্পসহ ২১৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময়ে ২৩টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৫৯টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে বহুল কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু। যার যাত্রা ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আনুষ্ঠানিক শুরু হয়েছিল। এছাড়া দেশের প্রথম কর্ণফুলি টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেলসহ বিআরটি–এই চারটি মেগা প্রকল্পের যাত্রা শুরু হবে আগামী বছরের মধ্যেই।

২৪ মেগা প্রকল্প

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে এক হাজার কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ব্যয় সংবলিত বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পের সংখ্যা ২৪টি, যার মধ্যে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬, এমআরটি (লাইন-১), এমআরটি (লাইন-৫): নর্দান রুট, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক, এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক, আশুগঞ্জ-ধরখার-আখাউড়া মহাসড়ক এবং সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক উভয় পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ। এছাড়া পায়রা সেতু নির্মাণ, ক্রস-বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণ, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২২ হাজার কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২২ হাজার ৪১৯ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০ সালে উন্নয়ন খাতে ১ হাজার ৫৩১ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতকরণসহ ১ হাজার ৪১৫ দশমিক ৫৩ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৫৮ দশমিক ৯৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৮৫টি সেতু ও ৭৫২টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিচালন খাতের আওতায় ২ হাজার ৩৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক সংস্কার করা হয়েছে এবং ২৭টি সেতু ও ১১৯টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

সরকার ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার লেন বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা ও চার লেনবিশিষ্ট যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক এবং নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক উল্লেখযোগ্য।

সব মিলিয়ে সওজের জাতীয় মহাসড়ক এখন ৩ হাজার ৯৮৯ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক নির্মাণ হয়েছে ৪ হাজার ৮৯৭ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক রয়েছে ২২ হাজার ৪১৯ কিলোমিটার। এর বাইরে ৩ হাজার ৫৪৮টি সেতু, ৮৫৬টি বেইলি ব্রিজ ও ১৪ হাজার ৮১৪টি কালভার্ট রয়েছে।

সার্ভিস লেনসহ মহাসড়ক

বর্তমানে ৪৪১ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয়পাশে পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ ও ১৭৫ কিলোমিটার মহাসড়ক সার্ভিস লেন ব্যতীত চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। সারা দেশের ১ হাজার ৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৫৯০ কিলোমিটার সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটিজ স্ট্যাডিসহ ডিটেইলড ডিজাইনের কাজ চলছে। একই সঙ্গে ১ হাজার ৫৭ কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নয়নের জন্য ডিটেইলড ডিজাইন এবং ৬৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পৃথক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদে ১ হাজার ২০৯টি সেতু ও ৫ হাজার ৫৮১টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু, নারায়ণগঞ্জে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু, সুনামগঞ্জে রানীগঞ্জ সেতু, কুড়িগ্রামে সোনাহাট সেতু নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্মিত ফ্লাইওভার/রেলওয়ে ওভারপাসের মধ্যে ভুলতা, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, মহিপাল ও মাওনা ফ্লাইওভার এবং লতিফপুর, ফতেহপুর ও মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস উল্লেখযোগ্য।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ২১টি সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ১৫টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৪টি, ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প ১টি এবং অন্যান্য প্রকল্প ১টি। এর মধ্যে ফরিদপুর (বদরপুর) সালথা-সোনাপুর-মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন, মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুগুলো স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন, ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১০ গুচ্ছ প্রকল্প

মেগা প্রকল্প ব্যতীত ১০টি গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ১০টি গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ (অল ওয়েদার সড়ক), পাঁচদোনা-ডাঙা-ঘোড়াশাল মহাসড়ককে উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নয়ন, গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, শরীয়তপুর (মনোহর বাজার)-ইব্রাহিমপুর ফেরিঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন, থানচি-রেমাক্রি-মোদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ, বগুড়া (জাহাঙ্গীরাবাদ)-নাটোর জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন, সিলেট বিমানবন্দর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নয়ন, ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, যশোর- বেনাপোল মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নয়ন, বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর জাতীয় মহাসড়কের বরিশাল থেকে ভোলা হয়ে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন। গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহণের উৎসমুখে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন, চারটি জাতীয় মহাসড়কের পাশে গাড়িচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।

একনজরে পদ্মা সেতু

২০০১ সালের ৪ জুলাই বহুল কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজনৈতিক কারণে সেতু নির্মাণের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। সর্বশেষ ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর

আবারও সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় আওয়ামী লীগ। প্রথমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের কথা ছিল। একপর্যায়ে সেতু নির্মাণে আর্থিক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয় সংস্থাটির পক্ষ থেকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় নির্মাণযজ্ঞ। ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ২ মিনিটে দেশে আরেকটি নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। এদিন পদ্মা সেতুতে সর্বশেষ স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে যুক্ত হয়েছে মাওয়া-জাজিরা দুই প্রান্ত।

সেতুর কাজ শেষ হলে দক্ষিণের ২৯ জেলার মানুষের যোগাযোগে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। সময় বাঁচবে অন্তত তিন ঘণ্টা। এখানেই শেষ নয়, এই সেতু একসময় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়। এতে সরাসরি উপকৃত হবে তিন কোটির বেশি মানুষ। দারিদ্র্য কমবে এক দশমিক নয় শতাংশ হারে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সেতুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ।

সেতুর সড়কপথের ৪০ ফুট নিচ দিয়ে ১৬০ কিলোমিটার গতিতে ছুটে যাবে ট্রেন। ১১০ কিলোমিটার গতিতে চলবে পণ্যবাহী ট্রেন। সে সময় দেখার অপেক্ষা সবার। এছাড়াও পদ্মা সেতুতে থাকছে গ্যাসলাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ ও ফাইবার অপটিক্যাল। বাগেরহাটের রামপাল ও পটুয়াখালীর পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আসা বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে।

পদ্মা সেতুর সঙ্গে দুই পারের মানুষের জীবনযাত্রাও একেবারে বদলে যাবে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বৃহৎ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেতুর দুই পাশে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই শহরের আদলে পরিকল্পিতভাবে নতুন শহর গড়ে তোলা হবে। এর সঙ্গে আবাসিক সুবিধার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি হবে শিল্প-কারখানা। যার মাধ্যমে প্রায় কোটি মানুষের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। বিনিয়োগের ১৯ ভাগ রিটার্ন আসবে প্রতিবছর।

বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুর তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে চীনের ডেনইয়াং কুনশান গ্র্যান্ড ব্রিজ। চীনের জিয়াংজু প্রদেশের সাংহাই ও নানজিং এলাকায় দীর্ঘতম সেতুটি অবস্থিত। চীনের ইয়াংজি নদীর ওপর ব্রিজটি স্থাপিত। সেতুর সঙ্গে রয়েছে রেললাইনও। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৬৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার। ২০১০ সালে সেতুটি উদ্‌বোধন করা হয়। সেতুটিতে খরচ হয় ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর বৃহত্তম সড়ক সেতুগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর অবস্থান ১১তম।

প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, বিশ্বের শক্তিশালী সেতুগুলো সাধারণত 'সি' আকৃতির হয়। কিন্তু নদীর অবস্থানের কারণে ওপর থেকে দেখলে পদ্মার নির্মাণ হয়েছে 'এস' আকৃতির। পদ্মার লাইফ টাইম ধরা হয়েছে শতবছর। এই সময়ে বড়ো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা না দিলে সেতুর বড়ো রকমের কোনো মেরামতের প্রয়োজন হবে না।

আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেতুতে যানবাহন চলাচলে চাপ বাড়বে। মূলত এই বিবেচনা থেকেই সেতুর পরিধি বড়ো করা হয়েছে। চার লেনের সড়কের মাঝখানে থাকবে রোড ডিভাইডার। ফলে যানবাহন আলাদা আলাদা লেনে চলবে। এতে দুর্ঘটনারও কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, বিশ্বের আমাজান নদীর পর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় নদী পদ্মা। প্রমত্তা এই নদীতে ৪১তলা গভীর পর্যন্ত পাইল করে পিলার বসানো হয়েছে। সেতুর মোট প্রস্থ ৭২ ফুট। ভায়াডাক্ট নির্মাণ হয়েছে তিন দশমিক ১৮ কিলোমিটার। মাওয়া-জাজিরা প্রান্ত মিলিয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ হয়েছে ১৪ কিলোমিটার। দুই পারে নদীশাসন হয়েছে ১২ কিলোমিটার। কাজ করেছেন চার হাজার মানুষ।

মূল পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। সেতুর নকশা করেছে আমেরিকান মাল্টিন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এইচসিওএম নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মূল সেতুর নির্মাণকাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (সিএমবিইসি)। নদীশাসনের কাজ করছে চীনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন। সেতু ও নদীশাসনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে। মাওয়া ও জাজিরায় পদ্মার উভয় তীরে সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ যৌথভাবে করছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আবদুল মোনেম লিমিটেড ও মালয়েশিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এইচসিওএম। সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এলাকার পরামর্শক হিসাবে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন। যোগাযোগ খাতে সর্ববৃহৎ এই স্থাপনা নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে, ৩০ হাজার ১৯৩ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। ২০২২ সালের জুনে পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনের কথা রয়েছে।

> সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, এখন গ্রামে গ্রামে পাকা সড়ক। সেই সঙ্গে হাওরাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে। দেশের সাতটি হাওর অধ্যুষিত জেলায় একের পর এক পাকা সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে

এক লাখ ১৭ হাজার কিলোমিটার সড়ক এলজিইডির

দেশের সবচেয়ে বড়ো সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক– এ তিন ক্যাটাগরিতে সংস্থাটির পাকা সড়কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৭ হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে যানবাহন চলাচল উপযোগী সড়ক এক লাখ ১৬ হাজার ৪১৯ কিলোমিটার। এলজিইডির আওতাধীন হালকা যান চলাচলের উপযোগী গ্রাম সড়ক (টাইপ 'বি', দৈর্ঘ্য দুই কিলোমিটারের নিচে) ৬৩ হাজার ২৪৪ দশমিক ৭

কিলোমিটার এক্সেস সড়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো, এখন গ্রামে গ্রামে পাকা সড়ক। সেই সঙ্গে হাওরাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে। দেশের সাতটি হাওর অধ্যুষিত জেলায় একের পর এক পাকা সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। ছয় মাস এসব সড়ক পানির নিচে থাকলেও বাকি ছয় মাস এসব সড়ক বিচ্ছিন্ন হাওরের মানুষের যোগাযোগে রীতিমতো বিপ্লব এনেছে।

রোড মাস্টার প্ল্যান

রোড মাস্টার প্ল্যান ২০০৯ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এর ধারাবাহিকতায় শীঘ্র ঢাকা-সিলেট এবং কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ, ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের উভয় পাশে সার্ভিসলেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ করা হবে। মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে নিরবচ্ছিন্ন করতে পটুয়াখালী জেলার পায়রা নদীর ওপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু, ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর কেওয়াটখালী সেতু, বাগেরহাটে পানগুছি নদীর ওপর এবং খুলনার ঝপঝপিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি গ্রহণ, ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্টকার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ, মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট, রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ এবং ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে National Road Safety Strategic Action Plan (NRSSAP) ২০১৭-২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী NRSSAP ২০২১-২৪-এর খসড়া প্রণয়ন করা হচ্ছে। 'মুজিববর্ষের শপথ, সড়ক করব নিরাপদ' প্রতিপাদ্য নিয়ে চলতি বছর ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্?যাপন করা হয়েছে।

বিআরটিএ-এর বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের ডেটাগুলো নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে মিরপুরে Vehicle Inspection Center (VIC) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

২০২০ সময় থেকে ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটর কার, জিপ ও মাইক্রোবাসের ফিটনেস দুই বছর অন্তর নবায়নের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধিত মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন যে কোনো বিআরটিএ সার্কেল অফিস থেকে করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

উন্নয়নের পথে বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) বর্তমানে সারা দেশে ১৩ হাজার ৫৮টি বাস ও ৫৭১টি সচল ট্রাকের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সেবা প্রদান করছে। বিআরটিসির ১৭টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০-এর নভেম্বর পর্যন্ত ৪ হাজার ৫৮১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া SEIP প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২ হাজার ৯০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পাঁচটি রুটে বিআরটিসির বাস চলাচল করছে। তাছাড়া ঢাকা-শিলিগুড়ি-গ্যাংটক-ঢাকা এবং ঢাকা-শিলিগুড়ি-দার্জিলিং-ঢাকা রুটে বাস পরিচালনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক রাজধানী ঢাকায় বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় উন্নত বাস সার্ভিস চালুর জন্য বাসরুটের সংখ্যা এবং কোম্পানির সংখ্যা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সিটিবাস টার্মিনাল এবং আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। বাসরুট রেশনালাইজেশনের লক্ষ্যে 'Preparation of Concept Design and Implementation Plan for Bus Reform' শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজির মূল প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে।

ডিটিসিএ কর্তৃক গণপরিবহণে যাতায়াত সুবিধার লক্ষ্যে Smart Card Rapid Pass-এর পরিধি বাড়ানোর জন্য 'TA Project for Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City and Adjacent Districts (Phase II)' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ট্রাফিক সিস্টেম স্বয়ংক্রিয় করার উদ্দেশ্যে Intelligent Transportation System (ITS) পাইলটিং করা হচ্ছে। ঢাকার প্রধান নগর অঞ্চলকে বাইপাস করে একটি রোড তৈরি করার উদ্দেশ্যে আউটার রিং রোডের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ছয়টি মেট্রোরেল নির্মাণ পরিকল্পনা

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) আওতায় অত্যাধুনিক গণপরিবহণ হিসাবে ৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে মোট ১২৮ দশমিক ৭৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১০৪টি স্টেশনবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করেছে।

আগামী বছরের জুনের মধ্যে এমআরটি-৬ প্রকল্পের ২১ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় অর্ধেক অংশ চালু হতে যাচ্ছে। উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে মেট্রোরেল চালু হলে ঢাকার যানজট পরিস্থিতি একেবারেই বদলে যেতে পারে। মেট্রোরেলে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণের কথা রয়েছে। এছাড়া ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯ দশমিক ৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুনবাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১ দশমিক ৩৬৯ কিলোমিটার উড়ালসহ ৩১ দশমিক ২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশনবিশিষ্ট MRTLine-1 নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design-এর কাজ চলমান আছে।

২০২৮ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Services-এর জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২০২০ সালের ১২ আগস্ট থেকে Basic Design-এর কাজ শুরু করেছে।

২০৩০ সালের মধ্যে উড়াল ও পাতাল মেট্রোরেলের সমন্বয়ে ১৭ দশমিক ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route-এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। একই সময়ের মধ্যে G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে গাবতলী থেকে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-2 নির্মাণের লক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Full Scale Study শুরু করেছে।

২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশ দিয়ে উড়াল মেট্রোরেল হিসাবে PPP পদ্ধতিতে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে। যোগাযোগ খাতে সরকারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ৯ বছরে নতুন সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নে ৪৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ব্যয় হয়েছে ১৩ হাজার ৭০ কোটি ৯৪

লাখ টাকা। আর ওই অর্থবছরেই রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৭০৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা।

২০৪১ সালে বদলে যাবে বাংলাদেশ

মূল কথা হলো, ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে আধুনিক, নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। গত ১০ বছরের হিসাবে দেখা যায়, জনগণের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে স্বস্তি আনতে ২৭৬ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। নতুন করে আরও ৩৪১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একের পর এক চার লেন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে বেশকিছু প্রকল্পের কাজও শেষ হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ।

রেলপথের উন্নয়ন

২০০৯ সালে প্রথম ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকার গুরুত্ব দেয় দীর্ঘদিনের অবহেলিত রেলপথে। ভারতের ঋণে আনা হয়েছে ইঞ্জিন, কোচ। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন রেলপথ। রেলপথ উন্নয়নে ২০১৬-২০৪৫ মেয়াদে ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। ৬৪ জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার বিশদ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রেলপথ সম্প্রসারণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েল গেজে রূপান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ রেলস্টেশন চালু করা, নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা এবং ট্রেনের কোচ সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯০০ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ ডাবল রেল ট্র্যাক নির্মাণ, ১ হাজার ৫৮১ কিলোমিটার নতুন রেল ট্র্যাক নির্মাণ, ১ হাজার ৫২৭ কিলোমিটার রেল ট্র্যাক পুনর্বাসন, ৩১টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ, ১০০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন এবং ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কুমিল্লা বা লাকসাম হয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাবল ট্র্যাক দ্রুতগতির রেললাইন নির্মাণ, ভাঙ্গা জংশন (ফরিদপুর) থেকে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ, নাভারন থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এবং সাতক্ষীরা থেকে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ এবং ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় হলো দেশের ৬৪ জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে চায় সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা-কক্সবাজার রেল লাইনের কাজ চলমান। পাশাপাশি দ্রুতগতির রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করতে দেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা-চট্টগ্রাম বুলেট ট্রেন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্কের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

নৌপরিবহণ

নদীমাতৃক দেশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথকে গুরুত্ব দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস ও নৌনিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি নৌপথের নাব্যতা

নদীমাতৃক দেশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথকে গুরুত্ব দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস ও নৌনিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌবন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার

বৃদ্ধি, নৌবন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার।

২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথের মধ্যে ২০ হাজার ৪০০ কিলোমিটার হারিয়ে গেছে। ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি নৌপথ খননের কাজ চলছে। সব মিলিয়ে ৫০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ উদ্ধার করে নৌ যোগাযোগব্যবস্থাকে সচল করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এর বাইরে এক হাজার ২৭০ কিলোমিটার উদ্ধার ও প্রায় তিন হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

নদীর তীরে ভূমি দখলমুক্ত রাখতে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ব্যাংক প্রটেকশনসহ ২০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ৫০ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও অন্যান্য নাব্যতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোর পণ্য হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে নতুন কনটেইনার টার্মিনাল, ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড, বে-টার্মিনাল, বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ ও জলযান সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

বিজয়ের ৫০ বছর গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিক

রীতা ভৌমিক

সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী লৈঙ্গিকবৈষম্যের শিকার। গণমাধ্যমেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। এখানেও নারী সাংবাদিক লৈঙ্গিকবৈষম্যের শিকার। বলা যায়, শহরে শুধু নয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় নারী সাংবাদিকদের ধীরগতিতে অগ্রগতি লক্ষ করা গেলেও ক্রাইম ও ক্রীড়া বিটে নারী সাংবাদিকের উপস্থিতি নেই বললেই চলে।

নারী সাংবাদিক সম্পাদিত পত্রিকা: ১৯৭১ থেকে ২০২১

ঢাকার তেজগাঁও থেকে অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম মহিলা মাসিক 'প্রতিধ্বনি' বের হয় ১৯৭২ সালে। এর সহ-সম্পাদিকা ছিলেন ফরিদা মেরী ও সাহারা খাতুন। খুলনা থেকে সমানাধিকার দাবির ভিত্তি নিয়ে মহিলা মাসিক 'বাঙলার মেয়ে' ১৯৭২ সালে বের করেন বেগম আশরাফুন্নেসা। এই বছরই ঢাকার হাতিরপুল থেকে মিস জাহানারা খানম আলমগীর নির্যাতিত নারীদের কণ্ঠ 'রণ রঙ্গিনী' বের করেন। পরে সৈয়দা আয়েশা বেগম এটি বের করেন। ঢাকার মিরপুর রোড থেকে বেগম রোকেয়া রহমান সম্পাদিত মহিলা পাক্ষিক 'তিলোত্তমা' প্রকাশ হয় ১৯৭২ সালে। ঢাকা থেকে বাংলাদেশের স্বাজাত্যাভিমানই আদর্শ ও পাথেয় মহিলা মাসিক 'সুচরিতা' ১৯৭৩ সালে বের হয়। এর সম্পাদক ছিলেন সৈয়দা শাহিদা বেগম রাণু, সহ-সম্পাদিকা মাজেদা আক্তার। ওই বছরই ময়মনসিংহ থেকে ফাতেমা জোহরা সম্পাদিত মহিলা মাসিক 'অনামিকা' বের হয়। শামসুন্নাহার রহমান পরশ সম্পাদিত চট্টগ্রাম থেকে মহিলা ত্রৈমাসিক 'জায়া' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ বছরই ঢাকা থেকে মিসেস হাসনা মামুন সম্পাদিত মহিলা মাসিক রম্য পত্রিকা 'মনিরা' বের হয়।

ঢাকা থেকে মাসুদা আহমেদ খান সম্পাদিত 'বিবাহ সমস্যা নিয়ে (যৌতুক প্রথা)' প্রকাশিত পত্রিকা বের হয় ১৯৮০ সালে। এ বছরই শামছুননাহার চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮০ সালে বের করেন 'মহিলা পত্রিকা'। ঢাকার ইকবাল রোড থেকে তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত পাক্ষিক 'অনন্যা' ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। নারীর অধিকার আদায়ের সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের 'মহিলা সমাচার' বের হয়। ঢাকার কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ থেকে ফরিদা ইয়াসমিন সম্পাদিত একুশ শতকের লাইফস্টাইল 'অন্যধারার কাগজ' বের হয় ১৯৯৯ সালে।

'বান্ধবী', 'ললনা', 'বেগম' জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতে এই পত্রিকাগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন না করে নারীবিষয়ক পত্রিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭২ সাল থেকে নারী সম্পাদক সম্পাদিত বাংলাদেশে নারীবিষয়ক বহু পত্রিকা বের হয়। কিন্তু কিছুদিন পর সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। পাক্ষিক 'অনন্যা' এখনো অব্যাহতভাবে নারীসমাজের বিকশিত প্রগতির ধারাকে তুলে ধরছে। 'বেগম'ও এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে।

ধীরগতিতে বাড়ছে নারী সাংবাদিকের অংশগ্রহণ

পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিকী পত্রিকা নারী সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত হলেও সেসময়ে দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক পদে নারী সম্পাদকের অস্তিত্ব ২০০৮ সালের আগে লক্ষ করা যায়নি। প্রথমে দৈনিক পত্রিকার ফিচার বিভাগে নারী পাতায় নারী সাংবাদিক নেওয়া হতো। এছাড়া অধিকাংশ নারী সাংবাদিকই ডেস্কে কাজ করতেন। দু-একজন নারী রিপোর্টার ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু বলেন, সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের সাময়িকীতে ১৯৭৩ সালে যোগদানের মাধ্যমে আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। এরপর ১৯৭৯ সালে 'দৈনিক সংবাদ'-এ সেন্ট্রাল ডেস্কে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করি। চাকরিতে যোগদানের আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমি নাইট শিফটে কাজ করতে পারব কি না? আমি সম্মতি প্রকাশ করেছিলাম। সেন্ট্রাল ডেস্কে আমরা পাঁচজন নারী সাংবাদিক ছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন মাসুমা খানম, নাসিমুন নাহার মিনি, আখতার জাহান মালিক, রওশন আরা জলি ও আমি। 'সংবাদে' পঞ্চাশের দশকে রিপোর্টার ছিলেন লায়লা সামাদ। পাশাপাশি তিনি নারী পাতার বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। সত্তরের দশকে রিপোর্টার ছিলেন বেবী মওদুদ। 'দৈনিক বাংলায়' ষাটের দশকে সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন হাসিনা আশরাফ। নারী পাতার বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন মাফরুহা চৌধুরী, ঊর্মি রহমান 'সংবাদ' থেকে 'দৈনিক বাংলায়' যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের পর সংবাদ সংস্থা 'এনা'য় রাশেদা আমিন, সুফিয়া ডেস্কে কাজ করতেন। 'দৈনিক জনতা'-এর নারী পাতার বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন সেতারা মুসা। সেসময় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা কম থাকলেও কাজের পরিবেশ ভালো ছিল। পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি। নাইট শিফটে কাজ করায় অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছি। গভীর রাতে বেবি-ট্যাক্সিতে যাতায়াতে নিরাপত্তা ছিল না। এসব সমস্যা পেরিয়ে আমরা কাজ করেছি। আগের তুলনায় এখন নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়া দরকার। কারণ, পুরুষ সাংবাদিকের তুলনায় যেরকম বাড়া দরকার ছিল, সেরকম বাড়ছে না।

নারী সাংবাদিকরা তাদের কাজের যোগ্যতা, দক্ষতা দেখিয়ে রিপোর্টিংসহ, সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভাগের বিভিন্ন বিভাগে একটু একটু করে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন।

স্বাধীনতার পর থেকে সাংবাদিকতায় ধীরে ধীরে নারীদের পদচারণা বাড়ছে। প্রথমে ডেস্কে কাজ করলেও পরবর্তী সময়ে রিপোর্টিংয়ে নারী সাংবাদিক আসতে থাকেন। তবে তা নির্দিষ্ট বিটে সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর টেলিভিশন বা ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের শুরু থেকেই মেয়েদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই রাজনীতি, অর্থনীতি, সচিবালয়, সংসদ, ক্রাইমসহ সব বিটেই তাদের পদচারণা শুরু হয়। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমানতালে চলতে থাকেন নারী সাংবাদিকরাও। তবে সমস্যা পিছুও ছাড়ে না। মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে নারী সাংবাদিক তার পুরোনো বিটটি ফিরে পান না।

প্রথম আলোর ফিচার সম্পাদক সুমনা শারমীন বলেন, একটা সময় প্রিন্ট মিডিয়ায় একজন নারী সাংবাদিক থাকতেন নারী বিটের জন্য। মেয়েরা এখন অর্থনীতি, কূটনীতিক, রাজনীতি, ক্রীড়া, শিক্ষা, সচিবালয়, জাতীয় সংসদ বিট, এমনকি নাইট শিফটেও কাজ করছেন। আমরা সাংবাদিক হিসাবে যে জায়গায় কাজ করছি, তা হলো মানের লড়াইয়ে টিকে থাকা। সাংবাদিকতায় একজন নারী সাংবাদিক তার যোগ্যতার দ্বারা নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে পারেন। এজন্য দরকার কাজে মান টিকিয়ে রাখা। এক্ষেত্রে বলা যায়, সাংবাদিকতা ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা কতখানি নিশ্চিত করছে; যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির মনমানসিকতা এবং নিজের দক্ষতা-যোগ্যতা যখন মিলে, তখনই তিনি টিকে থাকতে পারবেন এই পেশায়।

একাত্তর টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন টেলিভিশনের প্রথম নারী ক্রাইম রিপোর্টার। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে আমি টেলিভিশনে প্রথম নারী ক্রাইম রিপোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করি। সেসময় ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে নারী সাংবাদিক ছিলেন না। অন্য বিট থেকে ক্রাইম রিপোর্টার হিসাবে কয়েকজন নারী সাংবাদিক যোগদান করেছিলেন। এমন নারী সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল তিন থেকে চারজন। পত্রিকায় একজন নারী ক্রাইম রিপোর্টার ছিলেন। বিয়ে, সন্তান লালনপালন, কাজের ঝুঁকি প্রভৃতি কারণে তারা ঝরে গেছেন।

একুশে টেলিভিশনের নিজস্ব প্রতিবেদক হিসাবে ২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল রাজধানীতে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছিলাম। সেখানে তারা প্রশ্ন ছুড়েছিল পুরুষের সমাবেশে নারী সাংবাদিক কেন? এ নিয়ে সমাবেশকারীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। আমি এর প্রতিবাদ করলে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা আমার ওপর হামলা চালায়। আমাকে মারতে মারতে দিগন্ত টেলিভিশন কার্যালয়ের সামনে নিয়ে আসে। কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করান। কর্তব্যরত অবস্থায় আমি হেফাজত ইসলামের নেতাকর্মীদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম শুধু একজন নারী হওয়ার কারণে। এরকম আক্রমণ স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা বড়ো বাধা। যারা এই হামলা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল। এমনকি আমি সংবাদ সংগ্রহে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তখনকার একুশে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও এ ঘটনায় আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

তিনি আরও বলেন, এ তো গেল স্পটে কর্মরত অবস্থায় বিপদের সম্মুখীন হওয়া। একজন নারী সাংবাদিক হওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রেও

বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সে জায়গাটা বিশেষ কিছু না। কাজের ক্ষেত্রে সবাই বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো বৈষম্য বেতনবৈষম্য, এরপর পদোন্নতি না হওয়া। এই জায়গাটায় অনেক কাজ করার রয়েছে, যা এখনো হয়ে ওঠেনি। এর কারণ আমাদের গণমাধ্যমগুলো নারী সাংবাদিকদের এখনো সর্বোচ্চ স্থানে দেখতে অভ্যস্ত নয়। নারী-পুরুষ লৈঙ্গিকভিত্তিক বিশ্লেষণ না করে এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পেশাগত যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই জায়গা তৈরি করতে গণমাধ্যমে গণমানুষের একটি পরিবর্তনের বিষয় রয়েছে। সেই গণমানুষের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, মেধা যাচাইয়ের পদ্ধতি যাচাই না হওয়া পর্যন্ত, লৈঙ্গিকগত বৈষম্যের শিকার হলে সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থান না নিলে এ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেসঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। এটা এক-দুদিনের বিষয় নয়। আমাদেরকেও নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। যারা নীতিমালা তৈরি করেন, তত্ত্বাবধান করেন তাঁদের মানসিকতার মধ্যেও পরিবর্তন আনা দরকার। এ দুয়ের মিশ্রণ হলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিয়মিত টেলিভিশনের টকশোতে অংশ নেন। ২০১৩ সালে নারী ইস্যুগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম নারী অনলাইন নিউজ পোর্টাল Womeneye24.com বের করেন। সম্প্রতি একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। জানা গেছে, শীঘ্রই সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, দীর্ঘ ২২ বছরের লড়াই, সংগ্রাম, যোগ্যতার মাধ্যমে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানে পৌঁছানোর পথ এতটা মসৃণ ছিল না। প্রতিনিয়ত নিজের মেধা, ধৈর্য, সহনশীলতা, যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়েছে। এখনো দিচ্ছি। যখন যে পদে থেকেছি, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছি। এখনো করছি। কারণ, যে কোনো সাফল্য অর্জনের পেছনে দরকার একজন সাংবাদিকের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং কাজের প্রতি একাগ্রতা।

আঙ্গুর নাহার মন্টি টেলিভিশন নিউজ টোয়েন্টিফোরের যুগ্মবার্তা সম্পাদক হিসাবে কর্মরত। ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-ডিকাবের সাবেক সভাপতি। তিনি ২০০৫ সালে কূটনৈতিক বিটের রিপোর্টার হিসাবে কাজ শুরু করেন।

> আমাদের গণমাধ্যমগুলো নারী সাংবাদিকদের এখনো সর্বোচ্চ স্থানে দেখতে অভ্যস্ত নয়। নারী-পুরুষ লৈঙ্গিকভিত্তিক বিশ্লেষণ না করে এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পেশাগত যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

এরপরও গণমাধ্যমে বহু বাধা পেরিয়ে অনেক নারী সাংবাদিক সর্বোচ্চ আসনে গিয়েছেন। ঢাকায় কর্মরত নারী সাংবাদিক কাজের ঝুঁকি নিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন। মেধা ও সৃজনশীলতার ঘাটতি না থাকার পরও অনেকের পদোন্নতি হচ্ছে না। নারী সাংবাদিক এক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করে অনেক নারী সাংবাদিক রিপোর্টিংয়ে না গিয়ে ডেস্কে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

গণমাধ্যমে নেতৃত্বে নারী সাংবাদিক

জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম নারী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়ে ফরিদা ইয়াসমিন সাংবাদিকতার নেতৃত্বে ইতিহাস গড়েছেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এসব পদের মধ্যে সদস্য, যুগ্মসম্পাদক, দুবার সাধারণ সম্পাদক (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯) এবং সভাপতি। দৈনিক ইত্তেফাকের নিউজ ডেস্কে বার্তা বিভাগের শিফট ইনচার্জ

আঙ্গুর নাহার মন্টির মতে, এ সময় দিনকালের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাহমুদা চৌধুরী ছাড়া আর কোনো নারী সাংবাদিককে রিপোর্টার হিসাবে পাইনি। শুরু থেকেই আমি সবার সহযোগিতা পেয়েছি। সোর্স বিল্ডিং, সোর্স মেনটেইনসহ নানা তথ্য সংগ্রহে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে আমার পেশাদারি, দায়িত্বশীলতা ও সাংবাদিকতার নীতি মেনে রিপোর্ট করার চর্চা। নারী সাংবাদিক হিসাবে সবার মতোই আমারও চ্যালেঞ্জ ছিল, স্পষ্টবাদিতা ও ইনস্ট্যান্ট প্রতিবাদের কারণে তা কখনো বড়ো সমস্যা হয়নি। তবে কূটনৈতিক বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ডিকাবের নেতৃত্বে আসার পর সহকর্মীদের ভিন্ন রূপ দেখেছি। শুরুতে ভেবেছিল একে তো জুনিয়র, তার ওপর নারী, তেমন কিছুই করতে পারবে না। পরে দেখলেন 'ডাক শুনে কেউ না এলেও' আমার সব কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন করার যোগ্যতা আছে। ডিকাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নির্বাহী কমিটি ও সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত সব অনুষ্ঠান সফলতার সঙ্গে আয়োজন করেছি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইসিআরসির

সহযোগিতায় ২০১৬ সালে হলি আর্টিজান ট্র্যাজেডির পর সংকট সময়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়া কনফারেন্স করে সংগঠনের ইতিহাসে মাইলফলক কার্যক্রম যুক্ত করি। সেসময় আমার ভালো ও উন্নত কাজগুলোর পরও একটা মহলের রোষানলে পড়েছি। তারা কখনো আমাকে সরকারের লোক, কখনো এজেন্সির লোক আবার কখনো অমুক দূতাবাসের লোক বলে গুজব ছড়িয়েছেন। কূটনৈতিক অঙ্গনেও অনেকেরই নানা এজেন্ডার কারণে আমাকে চ্যালেঞ্জ মনে করেছেন। সততা ও সাহসের সঙ্গে তা মোকাবিলাও করেছি। ডিকাবে ৩৬ জনের মধ্যে নারী সদস্য সংখ্যা ৬। আমার লড়াই থেকে ওরা কতটা শিখবে জানি না, ওরা বরাবরই আমার পাশে ছিল ও আছে, এটাও অনেক গুরুত্ব বহন করে। আর ওদের জন্যই আমার লড়াইটা জারি থাকবে। কৃতজ্ঞতা এ লড়াইয়ে পাশে থাকা জেন্ডার সংবেদনশীল সহকর্মী ডিকাব সদস্যদের প্রতি।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ২৬ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী যুগ্মসম্পাদক হয়েছেন নাগরিক টেলিভিশনের প্রধান প্রতিবেদক শাহনাজ শারমিন। এ প্রসঙ্গে শাহনাজ শারমিন বলেন, যুগ্মসম্পাদক পদে নির্বাচন ও বিজয়ী হওয়া দুটিই আমার জন্য চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে সবার সহযোগিতায় এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণ করা সম্ভব হয়েছে। বাধা যেমন ছিল, তেমনই নারীদের পাশাপাশি পুরুষ সহকর্মীদের সহযোগিতা ছিল অভূতপূর্ব। এ পদে নারী সাংবাদিকদের আরও এগিয়ে আসার পথটি তৈরি করে দিতে পারাটাও ছিল আনন্দের। এখন নতুন কিছু করা আর সেই সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাটাও আমার আগামী এক বছরের জন্য বড়ো কাজ। কারণ প্রথম নারী যুগ্মসম্পাদক হওয়ায় সবারই দৃষ্টি থাকবে আমি কতটা করতে পারলাম। একেই আমি যুগ্মসম্পাদক, তার মধ্যে আবার নারী। তাই আমাকে দুটি পরীক্ষা দিতে হবে। তুলনাও চলবে আমার কাজের দক্ষতা নিয়ে প্রতিদিন। সেখানেই আমার বড়ো চ্যালেঞ্জ।

জাতীয় পত্রিকায় নারী পাতা

ইত্তেফাক ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক দৈনিক হওয়ার কিছুদিন পর 'মহিলা অঙ্গন' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। এর বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বেগম আখতারুন নাহার বেবী। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী পরিচালক মহীবুল আহসান জানান, বেগম আখতারুন নাহার বেবী 'মহিলা অঙ্গন'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় সম্পাদক। ১৯৯২ সালের ৭ এপ্রিল তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।

সেসময়ে মহিলা অঙ্গনে গল্প, কবিতা, রান্নাবান্না, সূচিকর্ম, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ হতো। ২০০০ সালের দিকে মহিলা অঙ্গনের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসে। এখানে রিপোর্টিং বেইজড নারী অধিকার, নারী উন্নয়ন, স্বাবলম্বী নারীবিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। আগের বিষয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়।

দৈনিক যুগান্তরের 'সুরঞ্জনা', প্রথম আলোর 'নারীমঞ্চ' পত্রিকায় দেশ-বিদেশের নারীদের কৃতিত্ব, অধিকার, উন্নয়ন, বৈষম্য নিরসন, মূল কথা জেন্ডার বেইজড রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাজেদা বেগমের মতে, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় রাশেদা আমিন প্রথম নারী সাংবাদিক। তিনি ইংরেজি সার্ভিসে সহ-সম্পাদক পদে নাইট শিফটে ১৯৮৫ সালের ১ নভেম্বর যোগদান করেন। পদোন্নতি পেয়ে বার্তা সম্পাদক হন। ২০০৯ সালের ১৫ জুন তিনি অবসর নেন। এরপর বেগম মমতাজ বিলকিস বানু ইংরেজি সার্ভিসে সহ-সম্পাদক পদে ১৯৯১ সালের ১২ নভেম্বর যোগদান করেন। তিনিও পদোন্নতি পেয়ে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন। ২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি চাকরি থেকে অবসর নেন। বেবী মওদুদ বাংলা সার্ভিসের প্রধান বার্তা সম্পাদক হিসাবে ২০০০ সালের ৩ জানুয়ারিতে যোগদান করেন। তাকে দিয়েই বাংলা সার্ভিস শুরু হয়। তিনি দুবছর এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিচিত্রার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকও ছিলেন।

গণমাধ্যমে নারী-পুরুষ সাংবাদিকের উপস্থিতির বৈষম্য

গণমাধ্যমে সম্পাদক, যুগ্মসম্পাদক, উপসম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, ফিচার এডিটর, জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক, সহ-এডিটর, বিশেষ সংবাদদাতা, জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, প্রতিবেদক প্রভৃতি পদে নারী-পুরুষের উপস্থিতির অসম অনুপাত চিহ্নিত করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারী সাংবাদিকের উপস্থিতি পুরুষ সাংবাদিকের তুলনায় অনেক কম।

সার্ক দেশের সাংবাদিকদের নিয়ে একটি সংগঠন (সামা) রয়েছে। সেখানে নারী সাংবাদিকের সদস্যসংখ্যা কত বা নারী সাংবাদিকের অংশগ্রহণ রয়েছে কি না, এ নিয়েও সঠিক কোনো তথ্য নেই।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক পদে নারীর সংখ্যা হাতেগোনা। দৈনিক যুগান্তরে সম্পাদক হিসাবে সালমা ইসলাম ২০০৮ সালের ৩০ মার্চ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি তিনি সম্পাদক হন। জাতীয় সংসদের এমপি নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। দৈনিক ইত্তেফাকে তাসমিমা হোসেন ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৮ সালের জুলাইয়ে তিনি সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে চারজন নারী রিপোর্টার রয়েছেন। তারা নারী ও শিশু, প্রাইমারি এডুকেশন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিটের রিপোর্টিং করেন। সেন্ট্রাল ডেস্কে বাংলা সার্ভিসে একজন এবং ইংরেজি সার্ভিসে চারজন, মফস্সল ডেস্কে বাংলা সার্ভিসে একজন এবং ইংরেজি সার্ভিসে একজন, আন্তর্জাতিক ডেস্কে একজন এবং একজন নারী সাংবাদিক ওয়েবসাইট দেখেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একমাত্র বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় একজন নারী ক্রীড়া প্রতিবেদক রয়েছেন।

দৈনিক যুগান্তরে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা চারজন। সেন্ট্রাল ডেস্কে একজন, মফস্সল ডেস্কে একজন, ফিচার বিভাগে দুইজন। তাদের মধ্যে একজন নারী ও শিশু বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক, লাইফ স্টাইল বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদকের সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। অনলাইনে দুইজন নারী সাংবাদিক রয়েছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা আটজন। রিপোর্টিংয়ে দুইজন, সেন্ট্রাল ডেস্কে তিনজন, মফস্সল ডেস্কে দুইজন। দৈনিক প্রথম আলোয় সম্পাদকীয়তে একজন, বার্তা ব্যবস্থাপনা ও বার্তা বিভাগে চারজন, পরামর্শ সংবাদ একজন, মফস্সল ডেস্কে একজন, রিপোর্টিংয়ে তিনজন, ফিচার এডিটরসহ ফিচার বিভাগে পাঁচজন, ফটোসাংবাদিক একজন এবং ডিজিটালে পাঁচজন নারী সাংবাদিক রয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. পূর্ববাঙলার সাময়িক পত্র
(১৯৪৭-১৯৭১): ইসরাইল খান সংকলিত ও সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩-৪

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

বিজয়ের ৫০ বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মোতাহার হোসেন

স্বাধীনতার সময় ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বিদ্যুৎ খাতের ভিত্তি রচনা করেন, একই সঙ্গে ঘাতকের নির্মমতায় নিহত হওয়ার ঠিক আগে আগে ব্রিটিশ গ্যাস কোম্পানির কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডের পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেন, যা দেশের জ্বালানির মূল চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এরপর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আবার বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ খাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। ফলে গত এক যুগে বিদ্যুৎ খাতের যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। ২০০৯ সালে ৪৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। এখন দেশে ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। চলিত মুজিববর্ষ ডিসেম্বরের মধ্যে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। এখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রতিটি ঘরে শতভাগ বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে ১১ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অবিশ্বাস্য ও স্বপ্ন মনে হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। বিজয়ের মাস এই ডিসেম্বরে মুজিববর্ষের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসছে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ফলেই মাত্র ১২ বছরে বিদ্যুৎ খাতে বড়ো বিপ্লব ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবিশ্বাস্য উন্নয়নের রূপকার এবং স্বপ্নদ্রষ্টাই হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশই আসে বেসরকারি খাত থেকে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় লোডশেডিং শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। নির্ধারিত সময়ের আগে এই শতভাগ বিদ্যুতের লক্ষ্য পূরণে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতাও ছিল। এর মধ্যে প্রত্যন্ত চরাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন নেওয়া একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। আবার মানুষ নিজের গ্রাম, আদিনিবাস ছেড়ে 'মাঠে-প্রান্তরে' কিংবা নতুন সড়কের পাশে বাড়িঘর তৈরি করছে। ফলে বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদার জোগান দেওয়ার পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপনসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিদ্যুৎ বিভাগকে এগোতে হয়েছে এবং সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখেছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্য ছিল ২৭টি। বর্তমানে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১৩৭টি। মাত্র ১২ বছরেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ১১৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। ১২ বছর আগে দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহক ছিল ১ কোটি ৮ লাখ। বর্তমানে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। সঞ্চালন লাইন ছিল ৮ হাজার সার্কিট কিলোমিটার, সেটা এখন প্রায় ১৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটার। গ্রিড সাবস্টেশন ছিল ১৫ হাজার ৮৭০ এমভিএ, তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার এমভিএ। ২০০৯ সালে বিতরণ লাইন ছিল ২ লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬ লাখ কিলোমিটারের বেশি। ১২ বছর আগে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কিলোওয়াট ঘণ্টায়। এখন বিতরণ লস ৯.৩৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, জ্বালানি সংকটের কারণে ২০০৯ সালের আগে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা দেখা দেয়। পরিস্থিতির উত্তরণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার মিশ্র ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যাসের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়। তেল ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মাণের পাশাপাশি কয়লা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং সৌর, বায়ু, বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্যোগ নেয়। ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। দ্রুততম সময়ে চাহিদা ও উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বড়ো আকারের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীও এগিয়ে আসছে। সরকারের ধারাবাহিকতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকায় দেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে এলএনজি আমদানি হচ্ছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুৎ খাত ছিল চরম অস্থিতিশীল। ওই সময় চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খুবই কম থাকায় দিনরাত লোডশেডিং লেগেই থাকত। এসব কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ায় এ খাতে স্বস্তি ফিরে আসে। এরপর সরকার মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোযোগ দেয়। বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে মিশ্র জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তেল-গ্যাসের পাশাপাশি কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শুরু করে।

বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে লোডশেডিং হওয়ার সুযোগ নেই। মূলত লোডশেডিং হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকলে একদিকে সংযোগ দিয়ে অন্যদিকে সংযোগ বন্ধ রাখা। উৎপাদন বেশি থাকায় সে অবস্থা আর নেই। তারপরও মাঝেমধ্যে লোডশেডিং হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, 'বর্তমানে দুটি বিষয়ের জন্য লোডশেডিং দেখা দেয়। একটি হলো, এখন সারা দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নে প্রচুর কাজ হচ্ছে, উন্নয়ন কাজের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করতে হয়। সে কারণে কোনো একটি লাইনে কাজ হলে সেটাকে বন্ধ রাখলে ওই এলাকায় তখন বিদ্যুৎ থাকে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, উৎপাদন ও গ্রাহক বাড়ছে; কিন্তু ট্রান্সফিউশন ডিস্ট্রিবিউশন শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি। সে কারণে কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে কাজ করছি। অবশ্য এখন এ সমস্যা নেই।' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বড়ো একটি প্রসার হয়েছে। বর্তমানে ৬০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম দিয়ে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। বায়ু বিদ্যুতের জন্য উইং ম্যাপিং হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই বছরের মধ্যেই মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে নেওয়া হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো। ফলে কমবে কার্বন নিঃসরণ এবং সরকারি ভর্তুকি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এবং বিনিয়োগকারীদের সরকার বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা দিচ্ছে বলেও জানান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক।

দেশে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ঢাকায়। বিংশ শতকের প্রথম বছর। আর এর আর্থিক সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ। ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথম ঢাকার রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি জ্বলে ওঠে। এর আগে ১৯০১ সালের জুলাইয়ে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়, সব রাস্তায় ও এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে তার নামে। পৌরসভার অধীনে বিদ্যুৎব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'দ্য ঢাকা ইলেকট্রিক ট্রাস্টি' নামে পরিষদ গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, পাকিস্তান সরকার দেড় বিলিয়ন ডলারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ১ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। কিন্তু তখন দেশে মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাশিয়ার সহায়তা নিয়ে দেশে নতুন করে বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশ পিছিয়ে যায়। তখন দেশে বিদ্যুতের সিস্টেম লস বেশি থাকায় দাতারা দেশের বিদ্যুৎ খাতে অর্থ দিতে চায়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আইপিপি নীতি গ্রহণ করা হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বার্জ মাউন্টটেড বিদ্যুৎ নিয়ে আসেন। এ সময়ে সরকার ক্যাপটিভ নীতি করে শিল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এরপর ২০০৯ সালে আবার বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন থেকে প্রয়োজনীয় নীতির পরিবর্তন করে সরকার বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার করে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আজ বিদ্যুৎ খাত এবং দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর এখন সাশ্রয়ী এবং মানসম্মত সরবরাহ বড়ো চ্যালেঞ্জ। সারা বিশ্বেই পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যুৎ সেক্টরেও পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। প্রথম দফায় ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার ভঙ্গুর বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠন চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল। তখন সরকার বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এরপর ২০০০ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎ খাতকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। ফলে সবদিক থেকে দেশ ৫০ বছর পিছিয়ে যায়। তখন

লোডশেডিংয়ের কারণে রাস্তায় মিছিল হয়েছে। ২০০৯ সালের শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতাহারে ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তখন আর্থিক সংকট ছিল। কেউ বিনিয়োগ করতে চায়নি। কিন্তু এরপরও শেখ হাসিনা সরকারের সাহসী উদ্যোগে দুই থেকে তিন বছরে দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তখন সরকারের নীতিই বিদ্যুৎ খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে। একবিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের গতি অনেকটাই হ্রাস পায়। সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও দাতা সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের অভাবে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয় মাত্র ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এ সময় প্রতিবছর সারা দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ৪০০ থেকে ৫০০ মেগাওয়াট। ২০০৫ সালের অক্টোবর নাগাদ সারা দেশের লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৫০০ থেকে ৯০০ মেগাওয়াট। লোডশেডিংয়ের পরিমাণ ২০০৬ সালের মে নাগাদ ১,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করে এবং এ সময় সান্ধ্যকালীন বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৪ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। এই লোডশেডিংয়ের পরিমাণ পরবর্তী বছর নাগাদ ১ হাজার ৬২৪ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। এ সময় বিদ্যুতের দাবিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো আন্দোলন ঘটেছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হন। একই সময় রাজধানীর শনিরআখড়ায় হাজার হাজার এলাকাবাসী বিদ্যুৎ ও পানির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। শেখ হাসিনার সরকার ভবিষ্যৎ চাহিদা মাথায় রেখে পায়রা, মাতারবাড়ী, রূপপুর, রামপালে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি খাতে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং টার্মিনাল, ঢাকা-চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর এবং বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে তেল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুতের এরই অর্জন মূলত জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ এবং বিজয়ের ৫০ বর্ষে জাতিকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহারও বটে। প্রত্যাশা–প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিদ্যমান উন্নয়ন, অর্জনকে টেকসই করা হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নেও বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা জরুরি।

লেখক: সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

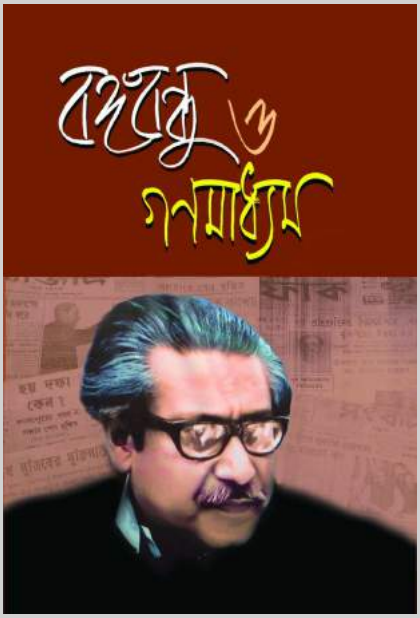

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সুবর্ণজয়ন্তীতে অনন্য উচ্চতায় টেলিভিশন সাংবাদিকতা

মিনহাজ উদ্দীন

বিশ্বে সম্প্রচার সাংবাদিকতার জনক বলা হয় এডওয়ার্ড আর মুরোকে। যার পুরো নাম এডওয়ার্ড এগবার্ড রসকো মুরো (Edward Egbert Roscoe Murrow)। তিনি মার্কিন গণমাধ্যম সিবিএস (Columbia Broadcasting System-CBS)-এর সম্প্রচার সাংবাদিক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু ১৯৯৭ সালে এটিএন বাংলার হাত ধরে। তবে সম্প্রচার সাংবাদিকতার নতুন দিগন্তের সূচনা হয় ২০০০ সালে একুশে টেলিভিশন সম্প্রচারে আসার মধ্য দিয়ে। ওই সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সরকারই এ চ্যানেলটির অনুমোদন দিয়েছিল। একুশে টেলিভিশন সম্প্রচার সাংবাদিকতায় বিপ্লবের সূচনা করে। ভিন্নধারার সাংবাদিকতা, নান্দনিক উপস্থাপনা, বিভিন্ন আধেয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে সাংবাদিকতায় এক নতুন দিনের সূচনা হয়। যার ওপর ভিত্তি করে আজ বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতা দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতায় এই বিপ্লবের প্রাণপুরুষ ছিলেন সায়মন ড্রিং, যার পুরো নাম সায়মন জন ড্রিং (Simon John Dring)। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে এই সাংবাদিককে বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতার জনক বলা যায়। টেলিগ্রাফ, বিবিসি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে কাজ করা সায়মন জন ড্রিং ২০২১ সালের ১৬ জুলাই রোমানিয়ায় মারা যান। সায়মনের স্বপ্নের প্রকল্প একুশে টেলিভিশনের অনুমোদন ও নানা রকম নীতি-সহায়তা দেয় শেখ হাসিনার সরকার। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে নতুন সরকার গঠনের পরও সেই সহায়ক নীতি অব্যাহত রাখেন শেখ হাসিনা। যার প্রেক্ষাপটে আজ বাংলাদেশে বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ টিভি, বিটিভি চট্টগ্রাম বাদে ৩১টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচারে রয়েছে। যার মধ্যে ৮টি টিভি

(ইনডিপেনডেন্ট, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, সময়, নিউজ টোয়েন্টিফোর, একাত্তর টিভি, এটিএন নিউজ, যমুনা, ডিবিসি নিউজ) সম্পূর্ণ সংবাদভিত্তিক টিভি চ্যানেল। সম্প্রচারের অপেক্ষায় আছে আরও বেশ কয়েকটি সংবাদভিত্তিক ও বিশেষায়িত টিভি চ্যানেল।

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর একুশে টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। এরপর সায়মনের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করে তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। অনেকটা নিভৃতে, লজ্জাজনকভাবে বিদায় নেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু সায়মন জন ড্রিং। তবে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা তাঁকে আবার সম্মানিত করেন। ২০০৮ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে ২০১২ সালে বাংলাদেশের বন্ধু হিসাবে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় সায়মন জন ড্রিংকে। এরপর সায়মন বাংলাদেশে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর ও যমুনা টিভিতে পরামর্শক হিসাবে কাজ করেন। ২০১৩ সালে এই নিবন্ধের লেখক যমুনা টিভিতে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তখন সায়মন এই লেখককে জানান, *'বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছে ২০০০ সালে একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে। যার জন্ম ও চূড়ান্ত বিকাশ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই এই খাতকে উন্মুক্ত করেছিলেন। দিয়েছিলেন সব ধরনের নীতি সহায়তা।'* (সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং, ২০১৩)

বর্তমানে কোথাও কোনো ঘটনা ঘটছে, হোক সেটা অগ্নিকাণ্ড, হোক কোনো মামলার রায়, কোনো সভা বা সেমিনার, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, খেলাধুলা বা অন্যকিছু–দর্শক চাইলেই সেই ঘটনা দেখতে পারছেন টিভি পর্দায়। বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতা বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিকতা এখন এমন পর্যায়ে চলে এসেছে, যে কোনো সংবাদমূল্যসম্পন্ন ঘটনা এখন দ্রুততার সঙ্গে চলে আসছে টিভি পর্দায়। কোন চ্যানেল কত দ্রুত ঘটনাটির সম্প্রচার শুরু করবে, তা নিয়ে এখন রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলছে। আর দর্শকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রচারে আসছে নতুন নতুন চ্যানেল। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সম্প্রচারে থাকা বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সংখ্যা ৩১টি। এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি টেলিভিশন সম্প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে। অতি দ্রুত সম্প্রচারে আসছে সিটি গ্রুপের টেলিভিশন চ্যানেল স্পাইস টিভি। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টিভি চ্যানেলগুলো হলো বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টিভি ও বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম।

বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার তারিখের (Date of On Air) ক্রমানুসারে সম্প্রচারকরণ

ক্রমিক	চ্যানেলের নাম	সম্প্রচারের তারিখ
০১.	এটিএন বাংলা	১৫-০৭-১৯৯৭
০২.	চ্যানেল আই	০১-১০-১৯৯৯
০৩.	ইটিভি	১৪-০৪-২০০০
০৪.	এনটিভি	০৩-০৭-২০০৩
০৫.	আরটিভি	২৬-১২-২০০৫
০৬.	বৈশাখী টিভি	২৭-১২-২০০৫
০৭.	বাংলাভিশন টিভি	৩১-০৩-২০০৬
০৮.	দেশ টিভি	২৬-০৩-২০০৯
০৯.	মাই টিভি	১৫-০৪-২০১০
১০.	এটিএন নিউজ	০৭-০৬-২০১০
১১.	মোহনা টিভি	১১-১১-২০১০
১২.	বিজয় টিভি	২০-১২-২০১০
১৩.	সময় টিভি	১৭-০৪-২০১১
১৪.	ইনডিপেনডেন্ট টিভি	২৭-০৭-২০১১
১৫.	মাছরাঙা টিভি	৩০-০৭-২০১১
১৬.	চ্যানেল 9	৩০-০১-২০১২
১৭.	চ্যানেল 24	২৪-০৫-২০১২
১৮.	গাজী টিভি	১২-০৬-২০১২
১৯.	চ্যানেল ৭১	২১-০৬-২০১২
২০.	এশিয়ান টিভি	১৮-০১-২০১৩
২১.	এসএ টিভি	১৯-০১-২০১৩
২২.	গানবাংলা টিভি	১৬-১২-২০১৩
২৩.	যমুনা টিভি	০৫-০৪-২০১৪
২৪.	দীপ্ত টিভি	১২-১২-২০১৫
২৫.	ডিবিসি নিউজ	২১-০৯-২০১৬
২৬.	নিউজ 24	২৮-০৭-২০১৬
২৭.	বাংলা টিভি	১৯-০৫-২০১৭
২৮.	দুরন্ত টিভি	১৫-১০-২০১৭
২৯.	নাগরিক টিভি	০১-০৩-২০১৮
৩০.	আনন্দ টিভি	০৩-১১-২০১৮
৩১.	নেক্সাস টিভি	৩১-০৭-২০২১
তথ্যসূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ৯ মে ২০১৯		

বাংলাদেশের টেলিভিশন তথা টেলিভিশন সাংবাদিকতায় অনন্য এক সংযোজন বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট। ২০১৮ সালের ১১ মে এই স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বেশির ভাগ টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যা টিভি সম্প্রচারকে আরও সহজ ও সহজলভ্য করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, মহাকাশে এই স্যাটেলাইট পাঠানোর দুঃসাহসী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যে প্রক্রিয়ায় বিশেষ অবদান রাখেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

২০০০ সালে একুশে টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতা ও স্যাটেলাইট টিভি জগতে স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তা ২০২১ সালে এসে চূড়ান্ত বাস্তব। বলা যায়, এ খাতের বিকাশে তিনি শতভাগ সফল। এখন সময় শুধু সামনে এগিয়ে চলার, প্রগতি আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদর্শিত পথে।

তথ্যসূত্র

১. মাধ্যম সাক্ষরতা সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ (২০১৯), রাহাত মিনহাজ, তাহমিনা হক, ঢাকা: পলল
২. https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_R._Murrow
৩. http://www.dfp.gov.bd
৪. https://bangla.bdnews24.com/media_bn/article1160980.bdnews
৫. https://sarabangla.net/post/sb-600467
৬. সাক্ষাৎকার, সায়মন জন ড্রিং, ২০১৩
৭. https://ssd.portal.gov.bd

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মেগা প্রকল্প নিয়ে নতুন উচ্চতায় বাংলাদেশ

পপি দেবী থাপা

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা ছুড়ে ফেলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গড়ে তুলছেন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর জীবন। শুধু কি তাই, একসময় যা ছিল নিছক কল্পনা–সেই পদ্মা সেতু কিংবা মেট্রোরেলের মতো প্রকল্পগুলো আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। এমন কিছু মেগা প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশ নতুন করে জানান দিচ্ছে তার সক্ষমতা।

পদ্মা সেতু

নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভবের সংশয়কে ছুড়ে ফেলে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ এক বাস্তবতা। ১৯৯৮ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই নিয়ে যে অপেক্ষার শুরু, দুই যুগের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে তা এখন দৃশ্যমান–যা আমাদের জাতীয় সক্ষমতার প্রকাশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের সোনালি ফসল এই পদ্মা সেতু, যা পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প নামে পরিচিত। টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বড়ো না হলেও গর্ব আর জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় এ প্রকল্পটি অন্যসব মেগা প্রকল্প থেকে এগিয়ে, যা উন্মুক্ত করছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯টি জেলার সঙ্গে সারা দেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পথ। এ সেতুর জন্য ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে ছয় লেনের মহাসড়ক। মহাসড়কটির চারটি লেন পুরোপুরি 'এক্সেস কন্ট্রোল', যেটিকে অভিহিত করা হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে হিসাবে। যোগাযোগব্যবস্থার এ ব্যাপক উন্নয়ন সেতু চালুর পর দেশের জিডিপি ২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক লাইফলাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করা ছাড়াও পুরো অর্থনীতিকে আক্ষরিক অর্থে একসূত্রে গাঁথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে এই সেতু। এটি ঢাকা থেকে মাওয়া-জাজিরা-ভাঙ্গা-পায়রা-কুয়াকাটা-যশোর-খুলনা-মোংলা পর্যন্ত সুবিস্তৃত ইকোনমিক করিডর হিসাবে দেশের অর্থনীতির দ্বিতীয় সর্বোত্তম লাইফলাইন হয়ে উঠবে। পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতিতে যেমন প্রভাব ফেলবে, তেমন সহজ হবে চলাচলও। চালু হলে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। মোংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানী এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তী আট বছর এই প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি হয়নি ক্ষমতার পালাবদলের কারণে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জানুয়ারিতে সেতু প্রকল্পের অনুমোদন হলেও মূল সেতুর কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের নভেম্বরে। মধ্যবর্তী সময়ে পাড়ি দিতে হয়েছে বন্ধুর পথ। সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে ২০১৩ সালের ৪ মে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে প্রথম স্প্যান বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় সেতুর অবকাঠামো। আর ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ স্বপ্নের পদ্মা সেতু পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যমান। ২০২২ সালের জুনের মধ্যে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মেট্রোরেল

ঢাকা মহানগরী আর পাশের এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে ছয়টি মেট্রোরেলের সমন্বয়ে প্রায় ১২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে ঢাকার প্রথম মেট্রোরেল লাইন এমআরটি-৬। ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তথা মেট্রোরেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন লাভ করে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসাবে জাইকা দেবে ১৬ হাজার ৫৯৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। লাইনটি ২০২২ ডিসেম্বরে চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এমআরটি-৬-এর চূড়ান্ত রুট অ্যালাইনমেন্ট হলো উত্তরা তৃতীয় ধাপ-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে (চন্দ্রিমা উদ্যান-সংসদ ভবন) খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-সোনারগাঁও হোটেল-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এ রুটের ১৬টি স্টেশন হচ্ছে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কাওরান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর। ট্রেন চালানোর জন্য ঘণ্টায় দরকার হবে ১৩.৪৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যা নেওয়া হবে জাতীয় গ্রিড থেকে। এর জন্য উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও ও বাংলা একাডেমি এলাকায় পাঁচটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থাকবে।

২০১৬ সালের ২৬ জুন এমআরটি-৬ প্রকল্পের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমআরটি-৬-এর স্টেশন ও উড়ালপথ নির্মাণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২০১৭ সালের ২ আগস্ট। লাইনটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। লাইনটি চালু হলে দৈনিক ৫ লাখ যাত্রী মেট্রোরেল ব্যবহার করে চলাচল করতে পারবেন।

২০১৯ সালের ১৫ অক্টোবর এমআরটি-১ এবং এমআরটি-৫ নামক লাইন দুটির নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এমআরটি-১ প্রকল্পের আওতায় বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর ও নতুনবাজার থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত মোট ৩১.২৪ কিলোমিটার পথে মেট্রোরেল নির্মিত হবে। এ প্রকল্পের মোট খরচ ধরা হয়েছে ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। এমআরটি-১ প্রকল্পে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১৬ দশমিক ২১ কিলোমিটার হবে পাতাল পথে এবং কুড়িল থেকে পূর্বাচল ডিপো পর্যন্ত ১১ দশমিক ৩৬ কিলোমিটার হবে উড়ালপথে। নতুনবাজার থেকে কুড়িল পর্যন্ত ৩ দশমিক ৬৫ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রানজিশন লাইনসহ ৩১ দশমিক ২৪ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ করা হবে। এই মেট্রোরেলের ১২টি স্টেশন থাকবে মাটির নিচে এবং ৭টি থাকবে উড়াল সেতুর ওপর।

২০২৬ সালে এমআরটি লাইন-১ অর্থাৎ দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল চালু হলে দৈনিক আরও আট লাখ যাত্রী মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবেন। ফলে অল্প সময়ে অধিকসংখ্যক যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। ছোটো ছোটো যানবাহনের ব্যবহার ব্যাপক হ্রাস পাবে। বহুলাংশে কমে যাবে জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানির ব্যবহার। ঢাকা মহানগরীর যাতায়াতব্যবস্থায় যোগ হবে ভিন্নমাত্রা ও গতি। যানজট বহুলাংশে হ্রাস পাবে। সাশ্রয় হবে মহানগরবাসীর কর্মঘণ্টাও।

এমআরটি-৫ নির্মাণ প্রকল্পে নির্মাণ করা হবে হেমায়েতপুর থেকে ভাটারা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার লাইন। এই প্রকল্পের ৪১ হাজার ২৩৮ কোটি টাকার মধ্যে ২৯ হাজার ১১৭ কোটি টাকা দেবে জাপান আর বাকি ১২ হাজার ১২১ কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ সরকার। প্রকল্পের মোট ২০ কিলোমিটারের মধ্যে সাড়ে ১৩ কিলোমিটার হবে পাতালপথে আর বাকি সাড়ে ৬ কিলোমিটার হবে উড়ালপথে। এ রুটে মোট ১৪টি স্টেশন হবে, যার মধ্যে ৯টি হবে পাতাল আর ৫টি হবে উড়ালপথে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে রাশিয়ার সহযোগিতায়। দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এ প্রকল্পের নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এর মধ্যে রাশিয়া দিচ্ছে ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এটি থেকে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। পুরোদমে উৎপাদন শুরু হলে কর্মসংস্থান হবে ২৪ থেকে ২৫ হাজার মানুষের।

তবে এর শুরুর ইতিহাস বেশ পেছনের। প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৬১ সালে। ১৯৬২-১৯৬৮ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার পদ্মা নদী তীরবর্তী রূপপুরকে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করা হয়। একাধিক সমীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যথার্থতা যাচাই করে প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয় ২৬০ এবং আবাসিক এলাকার জন্য ৩২ একর জমি। আংশিক সম্পন্ন করা হয় ভূমি উন্নয়ন,

অফিস, রেস্ট হাউস, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ও কিছু আবাসিক ইউনিটের নির্মাণকাজ। ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ১৯৬৯-১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বাতিল করে দেয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২-১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭-১৯৮৬ সালে মেসার্স সোফরাটম কর্তৃক পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়। একনেক কর্তৃক পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (১২৫ মেগাওয়াট) নির্মাণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প অনুমোদন করা হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৮৭-১৯৮৮ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের দুটি কোম্পানি কর্তৃক দ্বিতীয়বার ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি যৌক্তিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্টাডিতে ৩০০-৫০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৯৭-২০০০ সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া কর্তৃক ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ কিছু প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার পাওয়ার অ্যাকশন প্ল্যান-২০০০।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়। ২০০৯ সালে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পাদন' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রাথমিক কার্যাবলি ও পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০০৯ সালের ১৩ মে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি করপোরেশনের (রোসাটোম) মধ্যে 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ২০১০ সালের ২১ মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে 'পারমাণবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ক Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়।

২০১০ সালের ১০ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক মি. ইউকিআ আমানো বাংলাদেশ সফর করেন এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে আইএইএ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

২০১১ সালের ২ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১২ সালের ১৯ জুন Bangladesh Atomic Energy Regulatory Act-২০১২ পাশ করা হয়।

২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশান ফেডারেশন সফরকালে (১৫ জানুয়ারি ২০১৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Preperatory stage of construction কার্যাদি সম্পাদনের জন্য State Export Credit চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি (IGA) এবং State Export Credit Agreement-এর ভিত্তিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

২০১৩ সালের ২ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায় কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Operating Organization প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধান সংবলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন-২০১৫ জারি করা হয়। ২০১৫ সালের ১৮ আগস্ট রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited (NPCBL) গঠন করা হয়। আর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্যায়ের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction স্বাক্ষরিত হয় ২৫ ডিসেম্বর।

"এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পথে পা দিয়েছে এবং দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্লাবে পদার্পণ করেছে। আশা করা যায়, ২০২৩ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে"

২০১৬ সালের ২১ জুন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Site Licence প্রদান করা হয়।

২০১৭ সালের ৪ নভেম্বর একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুকূলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Design and Construction License প্রদান করা হয়। ২০১৭ সালের ৩০ নভেম্বর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১নং ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্‌বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পথে পা দিয়েছে এবং দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্লাবে পদার্পণ করেছে। আশা করা যায়, ২০২৩ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হবে।

কর্ণফুলী টানেল

পতেঙ্গা ও আনোয়ারায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে চলছে দেশের প্রথম দুই টিউববিশিষ্ট বহু লেনের সড়ক নির্মাণের কাজ, যা নির্মাণ করা হচ্ছে

'শিল্ড ড্রাইভেন মেথড' পদ্ধতিতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের এ টানেল সংযুক্ত করবে চট্টগ্রাম নগরীর পতেঙ্গা ও দক্ষিণের আনোয়ারা প্রান্তকে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও চীনের সরকারি পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা স্মারক। ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি টানেলের বোরিং কাজের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কাজের বর্তমান গতি ধরে রাখতে পারলে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে স্বপ্নের টানেলের নির্মাণকাজ। সেই সঙ্গে বদলে যাবে চট্টগ্রামের চিত্র। ৩.৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এ টানেল ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে গড়ে তুলবে আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা, যা এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে বহুমুখী যোগাযোগব্যবস্থা। ফলে যোগাযোগব্যবস্থার হবে ব্যাপক উন্নয়ন। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, প্রথম বছরেই প্রায় ৫০ লাখ গাড়ি যাতায়াত করবে। আমূল পরিবর্তন আসবে অর্থনৈতিক আঙিনায়। বাড়বে জিডিপির পরিমাণ। বিস্তৃত হবে চট্টগ্রাম। চাপ কমবে নগরের ওপর। কমবে শহরকেন্দ্রিক নির্ভরতা। বৃদ্ধি পাবে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা। গতি পাবে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দরের নির্মাণকাজ। চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন। ১০ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ প্রকল্প সার্বিকভাবে যোগাযোগব্যবস্থার সহজীকরণ, আধুনিকায়ন, শিল্পকারখানার বিকাশসাধন এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট

সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ সমুদ্র উপকূলীয় কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা মহেশখালী-মাতারবাড়ীজুড়ে ব্যাপক উন্নয়নযজ্ঞ। জাপান সরকারের অর্থায়নে গড়ে উঠছে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা। ১২ শ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০২৪ সালে উৎপাদনে চলে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে দ্বীপ অঞ্চলের রাস্তাঘাট, মানুষের জীবনধারা। পুরো মহেশখালীতেই লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ

দেশ তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের স্বার্থে ১ হাজার ৫৬৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ে বর্তমানে কক্সবাজার বিমানবন্দরের ৯ হাজার ফুট দীর্ঘ রানওয়ে বাড়িয়ে ১০ হাজার ৭০০ ফুটে উন্নীত করার কাজ চলছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৩০০ ফুট থাকবে সমুদ্রের মধ্যে। কক্সবাজার বিমানবন্দরের মহেশখালী চ্যানেলের দিকে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে এ রানওয়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ বোয়িং-৭৭৭-৩০০ ইআর, ৭৪৭-৪০০ ও এয়ারবাসের মতো উড়োজাহাজ সহজেই ওঠানামা করতে পারবে।

পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ

পদ্মা বহুমুখী সেতুতে স্থাপন করা হচ্ছে রেল সংযোগ। দোতলা এ সেতুর নিচ দিয়ে চলবে ট্রেন। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প। ২০১৬ সালে অনুমোদিত পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি ২০২৪ সালের জুনে কাজ শেষ হওয়ার কথা। ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। গড়ে তোলা হচ্ছে ২৩ কিলোমিটার এলিভেটেড ভায়াডাক্টে পাথরবিহীন রেললাইন। এলিভেটেড ভায়াডাক্টের ওপর দুটি প্ল্যাটফরম, একটি মেইন লাইন ও দুটি লুপ লাইনসহ রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ এবং তাতে লিফট স্থাপন করা হবে। প্রায় ১১ মিটার উঁচু রেললাইনের নিচ দিয়ে সড়কের জন্য আন্ডারপাস নির্মাণের মাধ্যমে উভয় পথে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ ট্রেন এবং গাড়ি চলাচল নিশ্চিত করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেলসেতু

১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হয়েছিল। সড়কপথের পাশাপাশি সেতুটিতে রয়েছে একটি রেলপথও। স্বাধীনতার পর রেলওয়ের উন্নয়নে এটি ছিল প্রথম মাইলফলক। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে নির্বিঘ্নে আরও বেশিসংখ্যক ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সেতুর ৩০০ মিটার উজানে আলাদা রেল সেতু নির্মাণ করছে সরকার। সেতুটি নির্মাণ হলে রেলের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনগুলোকে ক্রসিংজনিত কারণে অপেক্ষা করতে হবে না। বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে বর্তমানে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৩৮টি ট্রেন পারাপার হতে পারে। চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সেতুর ওপর দিয়ে ঘণ্টায় মাত্র ১৫ কিলোমিটার গতিতে ট্রেনগুলো চলে। এ কারণে বিদ্যমান ৩৮টি ট্রেন পারাপার করতে গিয়েই অনেক সময় নষ্ট হয়। ঢাকা থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেন যাত্রীদের দুর্ভোগের বড়ো কারণ এটি। নতুন সেতুটি চালু হলে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৮৮টি ট্রেন চলাচল করতে পারবে। ট্রেনগুলো চলতে পারবে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতি নিয়ে। এ কারণে ঢাকার সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ট্রেনে যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে আসবে। বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর দিয়ে বর্তমানে কোনো পণ্যবাহী ট্রেন পারাপার হয় না। নতুন সেতুটি এই সীমাবদ্ধতাও দূর করবে।

রামপাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র

রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত একটি প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র। ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (BPDB) ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীরঘেঁষা এই প্রকল্পে ১৮৩৪ একর জমির সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০১০ সালের আগস্টে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় তাপবিদ্যুৎ করপোরেশনের (এনটিপিসি) মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এনটিপিসির সঙ্গে একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব শক্তি সংস্থা (বিআইএফপিসি) নামে পরিচিত। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে, যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একটি অনন্য উদ্যোগ। ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ডিসেম্বরে দুই ইউনিটের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটিতে উৎপাদন শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশা করছেন।

দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম ডুয়েল গেজ ট্র্যাক

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের সঙ্গে সহজ ও সুগম যোগাযোগ স্থাপন এবং মিয়ানমারের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প শুরু হয় ২০১০ সালের জুলাইয়ে। ২০১১ সালের ৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারের ঝিলংজা চৌধুরীপাড়ায় দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু-ঘুমধুম সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত স্থির করা হয়। প্রকল্পটি ফার্স্ট ট্র্যাকের আন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল। ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটির রেলপথ সৃষ্টিতে মাটি ভরাট শেষ করে এখন চলছে লাইন স্থাপনের কাজ। ফলে দোহাজারী-কক্সবাজার ১০০ কিলোমিটার রেলপথের বাস্তবায়ন কাজ এখন দৃশ্যমান। এই প্রকল্পে যাত্রী ওঠানামার জন্য নির্মাণ করা হবে ৯টি স্টেশন।

চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে রামু পর্যন্ত ৮৮ কিলোমিটার, রামু থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও কক্সবাজারের চকরিয়া, ডুলাহাজারা, ঈদগাঁও, রামু, সদর ও উখিয়া এবং নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম স্টেশন থাকবে। ঘুমধুম পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটারের কাজ দ্বিতীয় দফায় করা হবে।

এই রেললাইন চালু হলে এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে। কক্সবাজার এবং সেখানে নির্মাণাধীন গভীর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম হবে। ৬ লাখ মানুষ স্বল্পসময়ে কক্সবাজারে যাওয়া-আসা করতে পারবে। পর্যটননগরীতে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আগমন কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। নগরীর পণ্য যাবে দেশ-বিদেশে। এতে সরকারের রাজস্ব আয় আরও বাড়বে। ২০২২ সালের মধ্যেই দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে নতুন এই রেলপথ।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। মাঝে যুক্ত হচ্ছে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-কমলাপুর-সায়েদাবাদ-যাত্রাবাড়ী। উড়ালসড়কটি নির্মাণে খরচ হচ্ছে প্রায় ৮ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। ১৯ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের নকশায় সংস্থান রাখা আছে ৩১টি র‍্যাম্পের, যেগুলোর দৈর্ঘ্য আরও ২৭ কিলোমিটার। সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। সরকারের সংশোধিত কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনার (আরএসটিপি) তথ্যানুযায়ী, বাস্তবায়নের পর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮০ হাজার যানবাহন চলাচল করতে পারবে। এক্সপ্রেসওয়েজুড়ে থাকবে ১১টি টোলপ্লাজা, এর মধ্যে পাঁচটি হবে এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে। সংশোধিত সময়সীমা অনুযায়ী ২০২৩ সালের জুনে চালু হওয়ার কথা রয়েছে। সার্বিকভাবে যোগাযোগব্যবস্থা সহজীকরণ, আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে এ প্রকল্প।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালসড়ক (এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে) নির্মাণ করছে সরকার। উড়ালসড়কটি নির্মাণে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ হাজার ৯০১ কোটি টাকা। বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন থেকে শুরু হয়ে আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পর্যন্ত অংশে নির্মাণ করা হবে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। মূল উড়ালসড়কটির দৈর্ঘ্য ২৪ কিলোমিটার। বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে উড়ালসড়কে ওঠানামার জন্য তৈরি করা হবে ১৬টি র‍্যাম্প বা সংযোগ সড়ক। এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে তৈরি করবে আন্তঃদেশীয় সড়ক যোগাযোগের সুযোগ। বিমানবন্দর এলাকায় ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংযুক্ত হবে নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে। ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার উপকণ্ঠে ধউরে প্রকল্পের 'স্ট্যাটিকলোড টেস্ট'-এর পাইলট পাইলিং উদ্‌বোধন করা হয়।

এসব প্রকল্পের পাশাপাশি চলমান রয়েছে আরও কিছু মেগা প্রকল্পের কাজ। অনেক স্বপ্নই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে

এসব প্রকল্পের পাশাপাশি চলমান রয়েছে আরও কিছু মেগা প্রকল্পের কাজ। অনেক স্বপ্নই এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এমন আরও মেগা প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটাই হোক আমাদের শপথ। আমরাই গড়ব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

লেখক: গবেষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

দ্বার খোলার অপেক্ষায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু

দুলাল আচার্য

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সেরা উপহার হতে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। দেশি ও আন্তর্জাতিক নানা চক্রান্ত পেছনে ফেলে দেশীয় অর্থায়নে নির্মিত হলো দেশের যোগাযোগ খাতে সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প পদ্মা সেতু। নতুন বছরের (২০২২) জুনেই সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা। পর্যায়ক্রমে খুলবে সেতুর রেলপথও। প্রকল্পটি পুরোপুরি চালু হওয়ামাত্রই দক্ষিণ এশিয়াসহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে বাংলাদেশ। বাড়বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। প্রকল্প কেন্দ্র করে নির্মাণ হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল ও পর্যটনকেন্দ্র। ঘুচবে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বেকারত্বও। প্রত্যক্ষভাবে দেশের ২৯টি জেলা যোগাযোগ সুবিধা পেলেও কার্যত গোটা দেশেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সব মিলিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সৃষ্টি করল আরও এক বিস্ময়।

বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু নির্মাণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের চলাচলের পথ সুগম হবে। সময় বাঁচবে কমপক্ষে তিন ঘণ্টার বেশি। দূরত্ব কমবে ৭০ থেকে ১০০ কিলোমিটার পথের। সরাসরি উপকৃত হবে তিন কোটির বেশি মানুষ। দারিদ্র্য কমবে এক দশমিক নয় শতাংশ হারে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। বলা যায়, গত ৫০ বছরে দেশের সড়ক যোগাযোগে যত উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে, শেষ ১৩ বছরে এগিয়েছে সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে যোগাযোগ সেক্টরে নজরকাড়া মেগা প্রকল্প হয়েছে এই সময়ে। এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ চলমান। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে বদলে যাবে গোটা দেশের চিত্র। এক অন্যরকম বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে সামনের দিনগুলো।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তখন থেকেই দেশের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু

নির্মাণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এর মধ্যে কেটেছে ২০ বছরের বেশি সময়। অর্থাৎ ২০ বছর পর সেতু নির্মাণের স্বপ্ন সফল হওয়া এখন অপেক্ষামাত্র। পদ্মা সেতুতে সর্বশেষ স্প্যান বসানো হয়েছে অনেক আগেই। যুক্ত হয়েছে মাওয়া-জাজিরা দুই প্রান্ত। দৃশ্যমান হয়েছে ছয় দশমিক ১৫ কিলোমিটারের সেতুটি। এখন চলছে সেতুর সড়কের কাজ। সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে মানুষের স্বপ্ন, অবসান হতে যাচ্ছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার। পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের দিনটি ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অগ্রগতি প্রায় ৯৬ ভাগ

নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে এখন শেষের পথে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ। ২০২২ সালের জুনে সেতুতে যান চলাচলের লক্ষ্যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও এগিয়ে চলছে কাজ। নভেম্বর পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের সার্বিক কাজ এগিয়েছে ৮৯ শতাংশ। আর মূল সেতুর কাজের অগ্রগতি ৯৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ মূল সেতুর কাজের আর বাকি মাত্র ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

সেতুর প্রকৌশল বিভাগের এক সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের সর্বমোট বাজেট ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। যার মধ্যে গত নভেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬ হাজার ৪৭৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বা মোট বাজেটের ৮৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। মূল সেতুর কাজের চুক্তিমূল্য প্রায় ১২ হাজার ৪৯৪ কোটি টাকা। যার মধ্যে চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১ হাজার ৫১২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।

এদিকে সেতু প্রকল্পের আওতায় নদীশাসনের কাজের অগ্রগতি হয়েছে সাড়ে ৮৬ শতাংশ। নদীশাসন কাজের চুক্তিমূল্য ৮ হাজার ৯৭২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭ হাজার ৩১ কোটি ৭১ লাখ টাকা। মূল সেতুর মধ্যে দুই হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্ল্যাব, ২ হাজার ৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাব ও ৫ হাজার ৮৩৪টি শেয়ার পকেট বসানো হয়েছে। ১২ হাজার ৩৯০টি প্যারপেট ওয়ালের মধ্যে ১২ হাজার ২৫৪টি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

আর মাওয়া ও জাজিরার ভায়াডাক্টে ৪৩৮টি সুপারটি গার্ডারের মধ্যে ৪৩৮টি ওবং ৮৪টি রেলওয়ে আই গার্ডারের মধ্যে ৮৪টিই স্থাপন করা হয়েছে। মূল সেতুর মোট ৪১টি ট্রাস রয়েছে, যার সবই ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ছয় হাজার ১৫০ মিটার বা ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার।

সেতুর সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়ার কাজ ইতোমধ্যেই শতভাগ শেষ হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৪৯৯ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ খাতে বরাদ্দ ৪ হাজার ৩৪২ কোটি ২৬ লাখ টাকা। অন্যান্য (পরামর্শক, সেনানিরাপত্তা, ভ্যাট ও আয়কর, যানবাহন, বেতনভাতাদি এবং অন্যান্য) খাতে বরাদ্দ ২ হাজার ৮৮৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। সেতুর অবশিষ্ট কাজের মধ্যে ওয়াটার প্রুফিং মেমব্রিনের ১৩ ভাগ, কার্পেটিং ২ দশমিক ০৫ ভাগ, মুভমেন্ট জয়েন্ট ৫৯ ভাগ, ল্যাম্পপোস্ট ৯ দশমিক ১৯ ভাগ এগিয়েছে। এছাড়া গ্যাস পাইপলাইন ৪৯ দশমিক ৩৫ ভাগ এবং ৪০০ কেভিএ বিদ্যুৎ লাইনের কাজ ৬২ ভাগ এগিয়েছে।

সেতুর স্টিলের স্প্যানের ওপর দিয়ে চলবে যানবাহন। এই পথ তৈরির জন্য কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর কাজ চলছে। সম্পন্ন হয়ে গেলে পিচ ঢালাই করা হবে। পুরো কাজ শেষ হলে যানবাহন চলাচলের পথটি হবে ২২ মিটার চওড়া, চার লেনের। মাঝখানে থাকবে বিভাজক। স্প্যানের ভেতর দিয়ে চলবে ট্রেন। সেতুতে একটি রেললাইনই থাকবে। তবে এর ওপর দিয়ে মিটারগেজ ও ব্রডগেজ দুই ধরনের ট্রেন চলাচলেরই ব্যবস্থা থাকবে। ভায়াডাক্টে এসে যানবাহন ও ট্রেনের পথ আলাদা হয়ে মাটিতে মিশেছে।

দুই পারে গড়ে ওঠবে উন্নত শহর

পদ্মা সেতুর সঙ্গে দুই পারের মানুষের জীবনযাত্রাও একেবারে বদলে যাবে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে বৃহৎ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেতু সংশ্লিষ্টদের অভিমত, সেতুর দুই পাশে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই শহরের আদলে পরিকল্পিতভাবে নতুন শহর গড়ে তোলা হবে। এর সঙ্গে আবাসিক সুবিধার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি হবে শিল্পকারখানা। যার মাধ্যমে প্রায় কোটি মানুষের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। বিনিয়োগের ১৯ ভাগ রিটার্ন আসবে প্রতিবছর।

দেশে দীর্ঘ, বিশ্বে ১১তম

বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুর তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে চীনের ডেনইয়াং কুনশান গ্র্যান্ড ব্রিজ। চীনের জিয়াংজু প্রদেশের সাংহাই ও নানজিং এলাকায় দীর্ঘতম সেতুটি অবস্থিত। চীনের ইয়াংজি নদীর ওপর ব্রিজটি স্থাপিত। সেতুর সঙ্গে রয়েছে রেললাইনও। সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৬৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার। ২০১০ সালে সেতুটি উদ্‌বোধন করা হয়। সেতুটিতে খরচ হয় ৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর বৃহত্তম সড়ক সেতুগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর অবস্থান ১১তম। তবে নদীর ওপর নির্মিত সব সেতুর মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে পদ্মা সেতুর অবস্থান প্রথম।

সেতুর ফাউন্ডেশনের গভীরতার দিক থেকেও এর অবস্থান প্রথম। প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন, বিশ্বের শক্তিশালী সেতুগুলো সাধারণত 'সি' আকৃতির হয়। কিন্তু নদীর অবস্থানের কারণে ওপর থেকে দেখলে পদ্মা সেতু নির্মাণ হয়েছে 'এস' আকৃতির। পদ্মার লাইফ টাইম ধরা হয়েছে শতবছর। এই সময়ে বড়ো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা না দিলে সেতুর বড়ো রকমের কোনো মেরামতের প্রয়োজন হবে না। নতুন করে রং করা, প্রয়োজনে নাট-বোলটু টাইট দেওয়া, ঝালাই কাজ প্রয়োজন হতে পারে।

রয়েছে চার লেনের সড়ক

পদ্মা সেতুর ওপর নির্মিত সড়ক হচ্ছে চার লেনের। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বড়ো পরিসরে সড়ক করা হয়েছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেতুতে যানবাহন চলাচলে চাপ বাড়বে। মূলত এই বিবেচনা থেকেই সেতুর পরিধি বড়ো করা হয়েছে। চার লেনের সড়কের মাঝখানে থাকবে রোড ডিভাইডার। ফলে যানবাহন আলাদা আলাদা লেনে চলবে। এতে দুর্ঘটনা কমবে।

বিশ্বের আমাজান নদীর পর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় নদী পদ্মা। প্রমত্তা এই নদীতে ৪১তলা গভীর পর্যন্ত পাইল করে পিলার বসানো হয়েছে। সেতুর মোট প্রস্থ ৭২ ফুট। মাওয়া-জাজিরা প্রান্ত মিলিয়ে সংযোগ সড়ক নির্মাণ হয়েছে ১৪ কিলোমিটার। দুই পারে নদীশাসন হয়েছে ১২ কিলোমিটার। কাজ করেছে চার হাজার মানুষ। মোট ৪২ পিলারের মধ্যে প্রতি পিলারের জন্য পাইলিং হয়েছে ছয়টি। মাটি জটিলতার কারণে ২২টি পিলারের পাইলিং হয়েছে ৭টি করে। মোট পাইলিং হয়েছে ২৮৬টি। পানির স্তর থেকে সেতুর উচ্চতা ৬০ ফুট। সেতুর ভায়াডাক্ট পিলার ৮১টি।

সেতুর নকশায় যারা

মূল পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। সেতুর নকশা করেছে আমেরিকান মাল্টিন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এইচসিওএম নামের একটি প্রতিষ্ঠান। মূল সেতুর নির্মাণকাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (সিএমবিইসি)। নদীশাসনের কাজ করছে চীনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো

করপোরেশন। সেতু ও নদীশাসনের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে।

মাওয়া ও জাজিরায় পদ্মার উভয় তীরে সংযোগ সড়কের নির্মাণকাজ যৌথভাবে করছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান আবদুল মোনেম লিমিটেড ও মালয়েশিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এইচসিওএম। সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এলাকার পরামর্শক হিসাবে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কার্স অর্গানাইজেশন। মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে যানবাহন সেতুতে ওঠার জন্য এবং সেতু থেকে নামার জন্য দুইদিকে ভাগ করা হয়েছে সংযোগ সড়ক। এটি মূলত ভায়াডাক্ট বা ডাঙায় সেতুর অংশ। দুই প্রান্ত মিলিয়ে সেতুর এই অংশের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ১৫ কিলোমিটার। মাঝখান দিয়ে চলে যাবে ট্রেনলাইন। জাজিরা প্রান্তে আছে টোলপ্লাজা।

নানা বাধাবিপত্তি

বহুল আলোচিত পদ্মা সেতু প্রকল্পের যাত্রা শুরু কার্যত ২০০৭ সালে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওই বছরের ২৮ আগস্ট ১০ হাজার ১৬১ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছিল। পরে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে রেলপথ সংযুক্ত করে ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি প্রথম দফায় সেতুর ব্যয় সংশোধন করে। কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়েছিল ২০১৩ সাল। প্রকল্পের অর্থঋণ হিসাবে জোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাঁচটি সংস্থা।

এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ১২০ কোটি ডলার দেওয়ার কথা ছিল। আর জাইকার দেওয়ার কথা ছিল ৪১ দশমিক ৫ কোটি ডলার। কিন্তু বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে ২০১২ সালের ২৯ জুন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয়।

বিশ্বব্যাংক আর্থিক সহযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ২০১২ সালের ১০ জুলাই জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, পদ্মা সেতু নির্মাণে তাঁর সরকার আর কোনো দেশ বা সংস্থার কাছে স্বেচ্ছায় সহায়তা চাইবে না। কেউ স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে ভালো। এরপরই দেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ এগোতে থাকে। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শরীয়তপুরের জাজিরাপ্রান্তে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতুর নির্মাণকাজ উদ্‌বোধন করেন।

এর আগে ১৯৯৯ সালে একটি প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতুর পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য সেতু বিভাগ থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অর্থায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাপান দূতাবাসে চিঠি দেওয়া হয়। জাপান সরকার ইআরডির প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ২০০১ সালের ৪ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর করে। সমীক্ষায় ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৫৩ কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ের মাওয়ায় পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৩-০৫ সালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া পয়েন্টে এবং শরীয়তপুর জেলার জাজিরা পয়েন্টে সেতুর স্থান নির্বাচন করে। ২০০৫ সালে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হলে প্রকল্পটি কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিকে থেকে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

রাখবে জিডিপিতে অবদান

নির্মাণ শেষে পদ্মা সেতু জিডিপিতে ১ দশমিক ২৬ শতাংশ অবদান রাখবে। বলা হয়, আগামীর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নিতে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে। এডিবি'র মূল্যায়ন বলছে, বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে দুই ভাগ।

> নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির অভিযোগে এই সেতুর ভবিষ্যৎ যখন প্রশ্নবিদ্ধ, তখন বাঙালি একাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বপ্ন পূরণের অদম্য স্পৃহা নিয়ে। তারই সুফল আজ স্বপ্নছোঁয়া পদ্মা সেতু

দ্বার খুলবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের

পদ্মা সেতু হওয়ায় শুধু দক্ষিণাঞ্চলের ২১টিসহ ২৯ জেলার মানুষই উপকৃত হবে না, জাতীয়ভাবে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। গোটা দেশের যোগাযোগ খাতে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। রেল ও সড়কপথ মিলিয়ে দ্বিতল এই সেতুটি দক্ষিণাঞ্চলের সব জেলা-উপজেলার সঙ্গে সড়ক ও রেল যোগাযোগকে আরও সমৃদ্ধ করবে। যুক্ত হবে এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, আরেকটু বড়ো পরিসরে যদি বলা হয়, তাহলে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সড়ক যোগাযোগের অন্যতম অনুষঙ্গ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ বেশি উপকৃত হলেও বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক ও রেল যোগাযোগে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

কত হবে টোল

টোল দিয়ে চলতে হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে। সাধারণত যেসব নদীতে ফেরি চলাচল করে, সেখানে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস রয়েছে যে– ফেরি পারাপারের সময় যানবাহনগুলোকে যে পরিমাণ টোল দিতে হয়, সেতু পারাপারের ক্ষেত্রেও সেটাই টোল নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণত বিদেশি অর্থায়নে কোনো সেতু নির্মিত হলে কত টাকা টোল হবে, সেটা নির্ধারণে দাতাদের পরামর্শ বা শর্ত থাকে। কিন্তু দেশীয় অর্থায়নে নির্মিত সেতুর টোল কত হবে, সেরকম কোনো

নিয়মনীতি নেই। আপাতত সরকারের সেতু বিভাগ পদ্মা সেতুর জন্য যে টোল হারের প্রস্তাব করেছে, সেটি ফেরি টোলের চেয়ে দেড়গুণের বেশি।

সেতু চালু হওয়ার পর পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য মোটরসাইকেলের জন্য ১০৫ টাকা, কার-জিপের জন্য ৭৫০ টাকা, ছোটো বাসের জন্য ২ হাজার ২৫ টাকা, বড়ো বাসের জন্য ২ হাজার ৩৭০ টাকা, ৫ টনের ট্রাকের জন্য ১ হাজার ৬২০ টাকা, ৮ টনের বড়ো ট্রাকের জন্য ২ হাজার ৭৭৫ টাকা, মাইক্রোবাসের জন্য ১ হাজার ২৯০ টাকা টোল প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতি ১৫ বছর টোলের হার ১০ শতাংশ বাড়ানো হবে। তবে এখনো এই প্রস্তাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি সরকার।

বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী সেতু নির্মাণে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ। সেই পরিশোধ বিবেচনায় নিয়েই টোলের এই হার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নয় মাত্রার ভূমিকম্পেও ক্ষতি হবে না

সেতুতে 'ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিংয়ের' সক্ষমতা হচ্ছে ১০ হাজার টন। এখন পর্যন্ত কোনো সেতুতে এমন সক্ষমতার বিয়ারিং লাগানো হয়নি। রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে টিকে থাকার মতো করে পদ্মা সেতু নির্মাণ হচ্ছে। সেতুর নদীতে থাকা ৪০টি পিলারের নিচের পাইল ইস্পাতের। আর ডাঙার দুটি পিলারের পাইল কংক্রিটের। নদীতে যেসব পাইল বসানো হয়েছে, সেগুলো তিন মিটার ব্যাসার্ধের ইস্পাতের বড়ো বড়ো পাইপ, যার ভেতরটা ফাঁপা। ২২টি পিলারের নিচে ইস্পাতের এমন ৬টি করে পাইল বসানো হয়েছে। বাকি ২২টিতে বসানো হয়েছে ৭টি করে পাইল। আর ডাঙার দুটি পিলারের নিচের পাইল আছে ৩২টি, যা গর্তের মধ্যে রড-কংক্রিটের ঢালাইয়ের মাধ্যমে হয়েছে।

নদীর পানি থেকে প্রায় ১৮ মিটার উঁচু পদ্মা সেতুর তলা। পানির উচ্চতা যতই বাড়ুক না কেন, এর নিচ দিয়ে পাঁচতলার সমান উচ্চতার যে কোনো নৌযান সহজেই চলাচল করতে পারবে। সেতুটির মূল কাঠামোর উচ্চতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় সমান। এর মূল কারণ, সেতুর ভেতর দিয়ে রেললাইন আছে। সড়ক ও রেললাইন একসঙ্গে থাকলে সেতু সাধারণত সমান হয়। না হলে ট্রেন চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বপ্নপূরণের পথে বাংলাদেশ। নতুন এক মাইলফলকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন শুধু চূড়ান্ত লক্ষ্য ছোঁয়ার অপেক্ষায় বাঙালি। বীর বাঙালি আবারও প্রমাণ করল অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে লক্ষ্যপানে। সংকট-ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বীরের জাতি এগিয়ে চলে সামনের দিকে। সেই এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে এ সময় বাঙালিদের অন্যতম অনুষঙ্গ স্বপ্ন ও মর্যাদার পদ্মা সেতু। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতির অভিযোগে এই সেতুর ভবিষ্যৎ যখন প্রশ্নবিদ্ধ, তখন বাঙালি একাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বপ্ন পূরণের অদম্য স্পৃহা নিয়ে। তারই সুফল আজ স্বপ্নছোঁয়া পদ্মা সেতু। যে স্বপ্ন দ্বার খোলার অপেক্ষায়।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

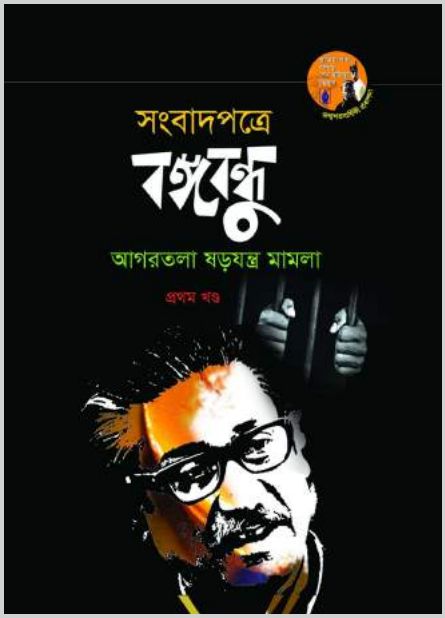

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ সাময়িকীপত্র

জাফর ওয়াজেদ

ফিরে যদি তাকাই পেছনে, পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ পানে, তবে দেখতে পাই–মৃত্যু, নৃশংসতা, নির্বিচারে গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ছেড়ে স্বজন হারিয়ে কোটি মানুষের দেশত্যাগ, শরণার্থীশিবিরে আশ্রয়। দেখতে পাই–বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বলতম অর্জন-পর্ব 'মুক্তিযুদ্ধ'। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধরত ছাত্র, যুবা, কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসারসহ নানা পেশার মানুষকে। সাহসে, অঙ্গীকারে, বীরত্বে, আত্মদানে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য বানিয়ে সম্মুখসমরে শত্রুহননে মত্ত হওয়ার এমন দিন বাঙালির ইতিহাসে আর কখনোই আসেনি। এটা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি জাতির ধারাবাহিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্মিলিত ফসল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল বাঙালির জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মানুসন্ধানের লড়াই। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর আত্মপরিচয় তুলে ধরার ভিত্তি বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ। শিশুঘাতী, নারীঘাতী, বর্বরতম প্রতিরোধে এমন সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস, নিজের বুকের রক্তে এমন করে আগে কখনো লেখেনি জাতি বাঙালি।

পঞ্চাশ বছর আগে আরও দেখতে পাই, অহিংস গণ-অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার রক্ত পতাকা-উত্তোলন। বিশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিতে এমন ঘটনা অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় যেমন, তেমনই অভূতপূর্বও। এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। 'মুক্তিযুদ্ধ'–এই প্রপঞ্চটির মধ্যে এই ভূখণ্ডের মানুষের অনেক বোধ, সংগ্রাম, অর্জন, মৃত্যু, হাহাকার, অশ্রু, আর্তি এবং স্বপ্ন ভিড় করে আছে। মুক্তিযুদ্ধ মূলত একটি প্রত্যয়। ছিল যা বাঙালির জাতীয় জীবনের মোহনাকাল, বাঙালির মানুষ হয়ে

ওঠার কাল। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে দেখা গেছে, বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সহমর্মী, সহকর্মী, সমব্যথী, সমচেতনার, সদাজাগ্রত থাকার সময়কাল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের শুধু অসাধারণ ঘটনাই নয়, স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধে বাঙালি জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। সাধারণ বাঙালি সশস্ত্রভাবে পাকিস্তানি হানাদার ও দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধে মত্ত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জনগণের যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ। স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সেসময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পক্ষে। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, নার্স, প্রকৌশলী, সরকারি চাকরিজীবী, কলকারখানার শ্রমিক, ঘাটের মাঝি, মাঠের কৃষকসহ নাম না-জানা বাঙালি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে দখলদার হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। অনেকে ধরা পড়েন, তারা আর ফিরে আসেননি। জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। গণকবর আর বধ্যভূমিতে আকীর্ণ বাংলাদেশ।

জয়বাংলা

গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলা দেশের

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। সব যুদ্ধেরই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরোধিতা করাটাই স্বাভাবিক। আর এই বিরোধিতা যে কেবল ভূমিতে, আকাশে, জলপথে মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াই, তা-ই শুধু নয়। বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণামে যে সংঘর্ষ তাতে যেমন সামরিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যোগাযোগীয় কৌশলও ব্যবহৃত হয়। পুরাকাল থেকেই যোগাযোগ তথা গণমাধ্যম তাই যুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অনস্বীকার্য যে, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রজন্মের চূড়ান্ত ঘটনা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও দালালরা পরাজিত হয়। হানাদাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মাত্র নয় মাসের এই যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগী দালাল ও চরেরা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করে। ধর্ষিত হন তিন লাখ নারী। গণমাধ্যম এসব খবর পরিবেশন করেছে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ ও সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময়ই সাংঘর্ষিক। যে কোনো যুদ্ধে, প্রাচীন হোক অথবা বর্তমানকালের হোক, যোগাযোগমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বার্থ ভিন্নতার বিষয়টি বড়ো বাস্তবতা। সংবাদমাধ্যমের মূল কাজ সত্য প্রকাশ করা। ঘটনার অনুপুঙ্খ তথ্য পাঠযোগ্যভাবে সংবাদ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধে প্রধানত দুটি পক্ষ থাকে। সংবাদমাধ্যমের আদর্শিক অঙ্গীকারের জন্য দুটি পক্ষ সম্পর্কে, যুদ্ধ যুদ্ধ ঘটনার দৈনন্দিন ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দায়বদ্ধতার অংশ। এমনকি জাতিগত, রাষ্ট্রগত কিংবা রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত কারণে যে পক্ষকে একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, সেক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যুদ্ধকালে এ ব্যাপারটি ঘটে না। বরং সংবাদমাধ্যম হয়ে ওঠে সাবেক যুদ্ধভূমি। শুধু তা-ই নয়, কৌশলগত প্রয়োজনেই যুদ্ধমান সামরিক বাহিনী কিংবা সরকার সংবাদমাধ্যমকে সব তথ্য দেয় না। তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণে বাধা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমরনায়ক ডুইট আইফেন হাওয়ার গণমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর ভূমিকার এমন বৈপরীত্যের কথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সামরিক অভিযানের প্রথম কথা হলো গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য শত্রুকে দেওয়া যাবে না। সংবাদপত্র এবং সব প্রচারমাধ্যমের অপরিহার্য কাজ ব্যাপক বিস্তৃত প্রচার।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, জন্মকাল থেকেই সংবাদমাধ্যম যুদ্ধ-ঘটনার রিপোর্টিং করে আসছে। গত দুই-তিন শতকে যুদ্ধ রিপোর্টিংয়ের গতি এবং বোধগম্যতার ক্ষেত্রে নানা রকমের পরিবর্তন এসেছে। 'ওয়াটার লু'-এর যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রের খবর সাংবাদিককে সশরীরে সংবাদপত্র অফিসে বয়ে আনতে হতো। ক্রিসিয়া এবং গেটিসবার্গ যুদ্ধের সময় টেলিগ্রাফের আবিষ্কার ঘটে গেছে। আর সংবাদপত্র অফিসে যুদ্ধ-সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময় খবরের সহায়ক হিসাবে যুদ্ধের ছবি ব্যবহার শুরু হয়।

আরও অনেক পেছনে তাকাই যদি, দেখতে পাই–উনিশ শতকের শেষার্ধে ১৮৯০ সালে আমেরিকায় হলুদ সাংবাদিকতার জের হিসাবে স্প্যানিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য কিউবা আক্রমণ করে বসে।

সংবাদপত্রই ধ্বংস মৃত্যুর বিপরীতে যুদ্ধের একটা গৌরবোজ্জ্বল চেহারা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে এবং যুদ্ধ যে বেশ একটা রোমান্টিক ব্যাপার, তা-ও ফুটিয়ে তোলা হয়। যুদ্ধ যে একটা পুণ্যের কাজ, গৌরবের কাজ, নশ্বর পৃথিবীতে অপরিমেয় বীরত্ব বিবরণ তৈরি করার সুযোগ পৃথিবীর প্রায় সব মহাকাব্যেই একথা বলা হয়েছে। প্রধানত যুদ্ধস্পৃহা জাগিয়ে তোলার জন্য, যুদ্ধপতিদের সুখ দিয়ে কিংবা সম্মুখসমরে স্পর্ধা বাক্যবিনিময়কালে যুদ্ধের এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড ও ওডেসিতে চোখে পড়ে। কিন্তু সংবাদপত্র অথবা গণমাধ্যমের যুদ্ধ উসকানির পেছনে এসবের সঙ্গে আরও যে একটি ভয়ংকর বিষয় কাজ করে তা হলো মুনাফালিপ্সা। এবং এই কাজটি দখলদার বাহিনী বা তার প্রতিপক্ষ বাহিনীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ফিরে যদি দেখি, দেখব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ অফিসে পৌঁছাতে হতো। অবশ্য এ সময়কালে কেবল সংযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছে। খবরের পাশাপাশি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা ক্যামেরায় ধারণ করে 'নিউজরিল' আকারে থিয়েটারে বা প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হতো। দেখা গেছে, এই সময়কালেই অধিক মুনাফার আশায় যুদ্ধের ঘটনাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণধর্মী এবং প্রোপাগান্ডামূলক চলচ্চিত্র তৈরি হয়।

যুদ্ধ 'কাভার' করার ক্ষেত্রে 'রিয়েল টাইম লাইভ রিপোর্টিং' বলতে যা বোঝায়, তার শুরু কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতারের মাধ্যমে। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। এভাবেই যুদ্ধে বাস্তবতা, দৃশ্য-শব্দ, মৃত্যু,

ধ্বংস, আহাজারি মানুষের বসার ঘরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র ও বিদেশি টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কল্যাণে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত এদেশে মোট তেইশটি (২৩) দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ছিল বেতার এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনও। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় চব্বিশ (২৪) বছর, অল্পকিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সংবাদমাধ্যম বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। কিন্তু পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পর এসব পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কয়েকটি পত্রিকা অফিস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতার-টিভিসহ পুরো যোগাযোগব্যবস্থারই নিয়ন্ত্রণ নেয় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী। দেশের বাস্তব অবস্থা দেশি-বিদেশি জনগণ যাতে জানতে না পারে, সেজন্য সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করেছিল। আরোপিত হয়েছিল সেন্সরশিপ। তাদের নৃশংস তৎপরতাকে ধামাচাপা দিতে যতই কলাকৌশলের আশ্রয় নিক না কেন তাতে কামিয়াব হয়নি। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেসব প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা ছিল শক্তাশক্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী, ভারতের চর, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের দুশমন অভিধা দেওয়া হতো সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে। দখলদার পাকিস্তানিরা সারা দেশে গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি নিধনে মত্ত থাকলেও সেসব খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, বেতার-টিভিতে প্রচার হতো না। অবরুদ্ধ দেশে বাঙালি এসব খবরাখবর মোটেই বিশ্বাস করেনি। বরং স্বাধীনতাকামী বাঙালিই বাঙালির কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশেষ করে বেতার এ সময় হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির তথ্যচাহিদা পূরণের নির্ভরযোগ্য উপায়। ভারতসহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবরও বেতার থেকে উদ্বৃত করা হতো। সেসব সংবাদপত্র এদেশে না এলেও বিদেশি বেতারের কল্যাণে তা জানা হয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গন তখন হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পঁচিশে মার্চ গণহত্যা শুরুর পরদিনই ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর সারা দেশের মানুষ জনযুদ্ধে নেমেছিল। সেসময় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে পারেনি বেশ কিছুকাল। যুদ্ধকালে দেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সেসময় পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এসব মাধ্যমে কর্মরত শব্দসৈনিকরা মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতাবোধ ও চেতনাকে সংহত ও শানিত করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে হানাদারমুক্ত করার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। দখলদার বাহিনীর প্রোপাগান্ডা ও মিথ্যাচার প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গণহত্যা, জনগণের ঘোরতর দুর্দশা, মুক্তির জন্য লড়াই, আর প্রতিরোধের খবর বা তথ্য সম্পর্কে কোনো পত্রিকা বা জার্নাল কিংবা সাময়িকী বাংলাদেশের দখলীকৃত অঞ্চলের মধ্যে রাখাটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায় অসম্ভবই ছিল বলা যায়। তথাপি কেউ কেউ গোপনে সাইক্লোস্টাইলে বুলেটিন বের করেছে, তা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থাকা বিশ্বস্ত স্বজনদের কাছে বিতরণ করেছে। তবে কেউ তা সংগ্রহ করে রাখত না। হানাদারের দৃষ্টি এড়াতে ছিঁড়ে বা পুড়ে ফেলেছে।

মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করত নিয়মিত। বাংলার বাণীও সেসময় প্রকাশ হতে থাকে। কলকাতায় বাংলা ইংরেজি পত্রিকায়ও মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর থাকত। সেসব পত্রপত্রিকা যাতে দেশের ভেতরে না আসতে পারে, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দলখদার হানাদার বাহিনী। যে কোনো আকারে এসব খবর প্রচারও ছিল নিষিদ্ধ। খবরের ছিটেফোঁটাও বিদেশে প্রচার করার বিষয়ে বিদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলোর ওপর রাখা হয়েছিল কড়া নজর। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপরে ছিল কঠোর কড়াকড়ি ও নজরদারি। বেতার শুনতে হতো গোপনে লুকিয়ে, নিম্ন ভলিউমে। এত কড়াকড়ির মধ্যেও লুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করত।

> মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সেসময় পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এসব মাধ্যমে কর্মরত শব্দসৈনিকরা মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতাবোধ ও চেতনাকে সংহত ও শানিত করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে হানাদারমুক্ত করার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১১০নং সামরিক বিধি জারি করে। এই সামরিক বিধিতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।' উল্লেখ করার বিষয় এখানে যে, এসব বিধিনিষেধ, কালাকানুন–সবই একপর্যায়ে এসে এদেশের সাংবাদিকরা ভঙ্গ করেছেন। এর আগে ১৯৫৮ সালের সামরিক অধ্যাদেশে সংবাদপত্রের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, 'এই আইন অমান্য করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং সেজন্য সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।' আরেক ধারায় বলা হয়, 'কোনো লিখনীর সাহায্যে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে তা সামরিক আইনে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।' এরপরও বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশ জারি করে সংবাদপত্রের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। পূর্ববাংলার সাংবাদিকরা এসব আইনের বিরুদ্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদীও হয়েছিলেন। পূর্ববাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। জাতীয় চেতনাকে শানিত করার এই অস্ত্রটিকে দখলে আনার জন্য পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সংবাদপত্র কেবল মানুষকে তথ্য দেয় না, জনগণকে শিক্ষিত করে, জনচৈতন্য এবং জনমতকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সংবাদপত্র যাতে বিকশিত না হয়, সেজন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

করতে চেয়েছে পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই। পাকিস্তানি উপনিবেশ আমলে চব্বিশ বছরে এদেশে সাংবাদিকতা বিকাশের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কাল পর্যন্ত প্রথম পর্ব। সামরিক শাসনের কাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় পর্ব এবং ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। প্রতিটি পর্বেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধিকারের জন্য সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকার ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আপস ও আঁতাতের কলঙ্ক। পূর্ব বাংলা গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রত্যেকবার নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। জনমত সৃষ্টি, জনমতের বিশ্বস্ত বাহন হিসাবে সংবাদপত্রকে জনতার সামনে উপস্থাপিত করার কাজে সাংবাদিকরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাই পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকরা বারংবার কারাবরণ করেছেন এবং স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রত্যক্ষ ছিল। তবে দু-একটি পত্রিকা সামরিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার পর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিল না ইত্তেফাক ছাড়া প্রধান ধারার অন্য কোনো পত্রিকা। তবে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বিপুল সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ ও তার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সমান্তরালে এগিয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন। আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে, সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দলকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে–সর্বোপরি তাঁকে এদেশের মুক্তিকামী জনগণের নামে অবিসংবাদিত জননেতা হিসাবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অমূল্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছে। দেখা গেছে, পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে যখনই গণ-আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাদের ওপর আরোপিত সব নিয়ন্ত্রণ, হুমকি, জেলের ভয় অতিক্রম করে ছাত্র, জনতা এবং রাজনীতিবিদদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত এদেশে সাহসী সাংবাদিকতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, সাংবাদিকরা সংগ্রামী যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর প্রথম আঘাতেই তা ভেঙে যায়। হানাদারদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সংবাদপত্র অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মী ও সাংবাদিক। হানাদারদের গোলার আঘাতে একের পর এক আক্রান্ত হয় স্বাধীনতার সপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকরা।

২৫ মার্চ রাতেই কামানের গোলায় ধ্বংস করা হয় দ্য পিপল ও গণবাংলা পত্রিকার অফিস। গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দ্য পিপল অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক। ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ দৈনিক সংবাদের অফিস পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস–২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সংবাদপত্র ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেই যাত্রা খুবই করুণ, মর্মান্তিক।

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে আসছে যে, যে কোনো যুদ্ধে প্রথম মৃত্যু ঘটে সত্যের। সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ এবং সাংবাদিকদের হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরবর্তী নয় মাসের জন্য সংবাদপত্র অফিস 'সত্যের কসাইখানা' হওয়ার পথ খুলে দেয়।

২৬ মার্চ পাকিস্তানি জান্তা শাসক নরঘাতক ইয়াহিয়া সামরিক বিধি জারি করে বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নির্দেশ দেওয়া হয়, সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আগে পেশ না করে এবং কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিষয় সংবাদপত্রে মুদ্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এই আদেশ লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সামরিক শাসন প্রয়োগ এবং তা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনার চেষ্টা নিষিদ্ধ করা হয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, সংবাদপত্রের সার্বিক কণ্ঠরোধ করা হয়। শুধু এই বিধি নয়, এরপর নাজিল হতে থাকে একের পর এক সামরিক আইনের আদেশ। প্রত্যেকটি বিধি ও আদেশ ছিল দেশের জনগণ, সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদপত্র, বেতার ও টিভির বিবেকী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এক নখরযুক্ত থাবা।

দখলদার বাহিনীর কাছে সংবাদপত্র দুটি কারণে ছিল অপরিহার্য। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, এই তথ্য দেশে-বিদেশে প্রচার এবং যুদ্ধ প্রচারণার মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রকে প্রাত্যহিক অনুষঙ্গ করে তোলা। দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, এটি প্রমাণ করার জন্য সামরিক জান্তা দিনতিনেকের মধ্যেই পত্রিকা মালিকদের নির্দেশ দেয়–সব পত্রিকা আবার প্রকাশ করতে হবে। ২৯ ও ৩০ মার্চ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে মর্নিং নিউজ, পূর্বদেশ, অবজারভার, দৈনিক পাকিস্তান। ইত্তেফাক প্রকাশিত হয় ২১ মে থেকে। সংবাদপত্রের মালিকরা বন্দুকের নলের মুখে নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই দখলদার হানাদারদের গুণকীর্তনে এগিয়ে আসে। অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। হানাদাররা 'সেন্সরশিপ হাউস' চালু করে। সব খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ছাপানোর আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো এই সেন্সরশিপ হাউসে।

ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস বিভাগ তথা আইএসপিআর নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্রিয় ছিল। সরাসরি এর দায়িত্বে ছিল মেজর সিদ্দিক সালিক। একাত্তরের ভয়ংকর সেই দিনগুলোয় মেজর সালিক ছিলেন সংবাদপত্র অফিসের ত্রাস। কোনো স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন ছাপানো হয়নি কোনো পত্রিকায় মাসখানেকের বেশি। অ্যাসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান বা এপিপির দেওয়া প্রতিবেদনই ছাপা হতো। সাংবাদিকরা দখলদার বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে সত্য যা কিছু লেখার ছিল, তা লিখতে পারেননি। তারপরও এর মধ্য দিয়েও সাংবাদিকরা সংযমের আড়ালে সত্য প্রকাশে ছিলেন সচেষ্ট। যে কারণে সিরাজুদ্দীন হোসেন, সৈয়দ নাজমুল হক, শহীদুল্লা কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, আ ন ম গোলাম মোস্তফা, শেখ আবদুল মান্নান (লাডু ভাই), শিবসাধন চক্রবর্তী, শহীদ সাবের, সেলিনা পারভিনসহ বহু সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হয়েছে হানাদার বাহিনীর হাতে।

পঁচিশে মার্চের পর অবরুদ্ধ দেশের সংবাদপত্রকে চরিত্র বিচারে সংবাদপত্র বলা অবশ্যই যাবে না। সেগুলো ছিল দখলদার হানাদার বাহিনীর মুখপত্র। অধিকাংশ পত্রিকায় পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার, আলবদরদের তৎপরতা, যুদ্ধে তাদের সাহস, জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও সামরিক কর্তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর, শান্তিবাহিনীর কাজ ফলাও করে প্রকাশ করা হতো। পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় চর, দুষ্কৃতকারী, ইসলামের শত্রু হিসাবে উল্লেখ করা হতো। বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারে ব্যাপক জায়গা ব্যয় করেছে সংবাদপত্রে। অপরদিকে দেশে নির্বিচারে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ সাফল্য সম্পর্কে নীরব থেকেছে। সেই সময়

সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করেছিলেন, নয়তো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে আবার কর্মরত থেকে দখলদারদের অন্যায় প্রতিরোধ করতে না পারলেও প্রতিবাদ করে জেল, জুলুম সয়েছেন। তৎকালীন পিপিআই-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হককে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দুবার রাওয়ালপিন্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। রাজি হননি বলে পরিণামে ১০ ডিসেম্বর রাতে একজন কর্নেলের নেতৃত্বে হানাদাররা বাসা ঘেরাও করে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি। যুদ্ধের শেষদিকে কয়েকজন সাংবাদিক আলবদর ও রাজাকারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। অবশ্য সাংবাদিকরা যুদ্ধ করেছিলেন ভেতরে-বাইরে।

যারা দেশ ছাড়তে পেরেছিলেন, তারা মুক্তাঞ্চল থেকে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম নিয়েছিল বেশকিছু সংবাদপত্র। একাত্তরে দু-ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দেশের ভেতর থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে থাকত যুদ্ধ সম্পর্কে অসত্য তথ্য। উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করা। অপরদিকে মুজিবনগর থেকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সাফল্যের সংবাদ পরিবেশন করে মুক্তিকামী বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করা। একই সঙ্গে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ব্যানারেই মূলত সংবাদগুলো প্রকাশিত হতো। কখনো কখনো কিছু ছবি, কবিতা-গল্প, সাক্ষাৎকার, যুদ্ধ, নেতাদের বিবৃতি, বক্তব্য ছাপা হয়েছে। আবার দুই-একটি পত্রিকায় বেশকিছু বিদ্রুপাত্মক কার্টুনও প্রকাশ হয়েছিল। পত্রিকার পাতায় পাতায় থাকত মুজিবনগর সরকার গঠন; সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিকল্পনা-পরিচালনা, কূটনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন-স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং তাঁকে ঘিরে স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়। যুদ্ধকালীন পত্রিকা বলেই এর সবটুকু জুড়ে থাকত যুদ্ধের খবরাখবর এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্বব্যাঞ্জক তৎপরতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার বর্ণনা প্রাধান্য পেত।

'পত্রিকাগুলোর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা। এসব পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বেশি না থাকায় সেগুলো জনগণের চাহিদা মেটাতে পারত না। এগুলোর একটি কপি সংগ্রহ করা কিংবা এতে এক ঝলক চোখ বোলানোর জন্য এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যেত সবাই। প্রধানত অল্পবয়সি ছেলেরাই এগুলো বিলি করত। যুদ্ধের সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, খবরের কাগজসহ ধরা পড়ার পর পাকিস্তানিরা এসব কিশোরকে ঘটনাস্থলেই বিনা বিচারে হত্যা করেছে।' (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে: মেজর রফিকুল ইসলাম)

যুদ্ধকালে জন্ম নেওয়া এসব পত্রিকার নাম এবং সংবাদ শিরোনামে স্বদেশপ্রেম ও যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল। মুক্তাঞ্চলে এবং অবরুদ্ধ দেশে এসব পত্রিকা বাঙালিকে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হাতেগোনা কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া বাকি সব পত্রিকাই ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, সাময়িকী, বুলেটিন অথবা নিউজ লেটারধর্মী। পত্রিকাগুলো সাইক্লোস্টাইল করে, হাতে লিখে কিংবা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছে। পত্রপত্রিকাগুলোর স্থান হিসাবে ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নওগাঁ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, তেঁতুলিয়া, মুক্তাঞ্চল ও মুজিবনগরের নাম থাকলেও এর অধিকাংশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন: পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, বিহার, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হতো। এসব পত্রিকা প্রকাশনায় বিপুলসংখ্যক শরণার্থী ও স্থানীয় বাঙালি জনগণের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ছিল। যুদ্ধকালে জন্ম নেওয়া এসব পত্রিকার নাম এবং সংবাদ শিরোনামে স্বদেশপ্রেম ও যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল। মুক্তাঞ্চলে এবং অবরুদ্ধ দেশে এসব পত্রিকা বাঙালিকে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। পরিস্থিতি, সময়ের দাবি, স্থানীয় চাহিদা ও যুদ্ধজয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব পত্রপত্রিকার বিষয়বস্তু যুদ্ধ, প্রতিরোধ, হানাদান বাহিনী আর রাজাকারদের লাঞ্ছনা, পরাজয়, যুদ্ধাক্রান্ত মানুষের কষ্ট, স্বপ্ন প্রভৃতি। সেসময়ের পত্রিকাগুলোয় প্রতিবেদন ফিচার, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রভৃতি বিষয়ের

মুক্তিকামীদের প্রকাশিত পত্রিকার পাতায় থাকত মুজিবনগর সরকার গঠন, সরকারের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিকল্পনা-পরিচালনা, কূটনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন-স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং তাঁকে ঘিরে স্বাধীনতাযুদ্ধ। বিশ্ব জনমত তৈরি করা, স্বাধীনতার লক্ষ্যে যুদ্ধকে ত্বরান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত করে মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। বাস্তবতা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সামান্য তথ্য পাওয়ার জন্য বাঙালি হন্যে হয়ে ফিরত। হাতে লেখা দেওয়ালপত্রিকা এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি, ও বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পৌঁছাতে গিয়ে অনেক কিশোর, যুবা ধরা পড়ে নির্যাতন ভোগ করেছে। তাদের উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এদেশের মাটি।

যুদ্ধের সময় সংবাদপত্র অন্য রণাঙ্গনের যোদ্ধার ভূমিকাই পালন করেছে। একদিকে স্বদেশ ও প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়কে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা এবং বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করা এর প্রধান এবং আদর্শ লক্ষ্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে ছত্রিশটিরও বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় দৈনিক জয়বাংলা। নওগাঁ থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি সংখ্যা পাওয়া গেছে। শত্রুকবলিত হওয়ায়

পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর এক মাস পর প্রবাসী সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (রেজিস্ট্রেশন নং-১) প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে জয়বাংলা, যা মূলত আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল। আট পাতার পত্রিকাটিতে বিজ্ঞাপনও ছিল। পত্রিকাটির লেটার হেড এঁকেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ করে 'মুক্তিযুদ্ধ' নামক সাপ্তাহিক। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক নতুন বাংলা নিয়মিত বেরিয়েছে। পত্রিকার লেটার হেডের নিচে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লেখা হতো পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পর এরা পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে 'বাংলাদেশ' লেখা শুরু করে।

২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে ২৬ ও ২৭ তারিখে বিদেশি পত্রপত্রিকাগুলো বাংলাদেশ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করতে পারেনি। শুধু ২৭ তারিখে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় ও বেতারে মুক্তিযুদ্ধ ও হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের কথা ফলাও করে প্রচার করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মুদ্রণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রণমাধ্যম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে গেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে আকাশবাণী, অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো, বিবিসি এবং বয়েস অব আমেরিকার নাম স্মরণীয়। আকাশবাণীর খবর ও কথিকা মুক্তিযোদ্ধা, অবরুদ্ধ দেশের মানুষ আর শরণার্থীদের লড়াই করার আর বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। বিবিসির যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশবিষয়ক খবর ছিল সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। বিদেশি রেডিয়োর পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

বিশ্বের যেসব সাংবাদিক বাংলাদেশের পক্ষে তাদের পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনগণ, জনপ্রতিনিধি ও সরকারকে সহানুভূতিশীল করে তোলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিডবি এইচ স্কেনবার্গ, জন ই উডাফ, এস হ্যারিসন, চেষ্টার বাউলেস, জিন ভিনসেন্ট, পিটার আর ক্যান, হেনরি এস রেডসিয়ার, মিলান জে কুবিক, ট্যাড সুজলক, ডব্লিউ ব্রাউন, আদাম ক্লাইমার, এনট্যারো পিটিলা, ডুবিয়াস হেভেন, বেঞ্জামিন ওয়েলস, এলভিন টফলার, সি এস সুলজবারগার বেঞ্জামিন ওয়েলস, জনই ফ্রেজার, জন কেনিথ গলব্রেথ, ক্রসবি এ নায়েস, এনথনি এসটারসন, মেলকম এম ব্রাউন, বার্নার্ড গাটজম্যান, উইলিয়ম ডায়মন্ড, লি লেসক্যাজ, কায়াস বিচ, প্রান সাহারওয়াল, পিটার সারকান, জেস পিস্টেরাসহ আরও অনেকে। নিজ নিজ দেশে প্রথিতযশা এসব সাংবাদিক একের পর এক সংবাদ ও প্রতিবেদন ছেপে বিশ্ব জনমতকে পক্ষে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। অবশ্য তাদের সংবাদসমূহ ছিল ঘটনা সম্পর্কে সত্য বিবরণ এবং এসব সত্য ও নিরপেক্ষ সংবাদ এবং প্রতিবেদনই বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানার সুযোগ করে দেয়। সাংবাদিকদের মধ্যে ভারতীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল পুরোপুরি বাংলাদেশের পক্ষে।

যেসব বিশ্বখ্যাত পত্রিকা বাংলাদেশের খবর যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করেছিল, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো ছিল–নিউইয়র্ক টাইম, পোস্ট, বল্টিমোর সান, নিউজউইক, টাইম, ইভেনিং স্টার, ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল, সেটারডে রিভিউ, শিকাগো সান টাইম, ওয়াশিংটন স্টার, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর, সানডে স্টার, নিউজডে, দ্য গার্ডিয়ান, আল-আহরাম, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, সিডনি মর্নিং হেরাল্ড, দি এজ-ক্যানবেরা, নিউ হেরাল্ড-কাঠমান্ডু, ওয়াং ওয়া ইট পো-পেনাং, জাকার্তা টাইম, ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড, অটোয়া সিটিজেন, পালাভার-আক্রো, ব্যাংকক পোস্ট, দ্য কমনার-কাঠমান্ডু, সানডে অস্ট্রেলিয়ান বিউনো এয়ারস হেরাল্ড, স্টেইটস ইকো-মালয়েশিয়া, স্টেইটস টাইমস-মালয়েশিয়া, ন্যাশনাল জাইটুংও-বার্নি, জাম্বিয়া ডেইলি মেইল, গায়ানা ইভেনিং পোস্ট, সানডে টাইমস-ওয়েলিংটন, দাগেনস নাইহেটার-স্টকহোম, ম্যানিলা ক্রনিলা ক্রনিকল, ভে সার্নজে নভস্তি-যুগোশ্লাভ, পালাভার উইকলি-ঘানা, জা রুবেজম রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়ান অবজারভার, লা সেলেইল-সেনেগাল, দাগরডেট-নরওয়ে, টরেন্টো টেলিগ্রাম-কানাডা, অটোয়া সিটিজেন, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ফ্রাঙ্কফুর্টার আলমেইন জাইটুং-প জার্মানি, ওয়েস্টার্ন মেইল (কার্ডিফ) ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ, ইয়াঙ্কি-আঙ্কারা, অ্যাডভান্স, মাইনিটি ডেইলি নিউজ টকিও, লা লিবর বেলজিক-ব্রাসেলস (নিরপেক্ষ), গ্লোব অ্যান্ড মেইল-টরেন্টো, আল সাওরা দামেস্ক (নিরপেক্ষ), সানডে পোস্ট-নাইরোব, হেল সিনজিন সারোমাত-হেলসিংকি, দে ভক্সক্রান্ত-নেদারল্যান্ডস, নেপাল টাইমস, সানডে পোস্ট নাইরোবি, হেল সিজিন সারোমাত হেলসিংকি, নেপাল টাইমস, সানডে টাইমস অব জাম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া বায়া, মাদারল্যান্ড কাঠমান্ডু, নিউজ ডেসল্যান্ড-পূর্ব বার্লিন, নানইয়াং সিয়াং পু-মালয়েশিয়া, ইজতে স্তিয়াপ হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, কালান্তর, নিউ এজ, দ্য স্টেটসম্যান, দর্পণ, টাইমস অব ইন্ডিয়া, পেট্রিয়ট, দ্য হিন্দু প্রভৃতি। এছাড়া বিশ্বের নামকরা পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার ছিল দীর্ঘ নয় মাস। এ হতে অনুমেয়, বাংলাদেশের আন্দোলন বিশ্বব্যাপী কীভাবে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে উঠলে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকায় আসতে থাকেন। ২৫ মার্চ রাতে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে গণহত্যা চালানোর সময় বন্দুকের মুখে সব বিদেশি সাংবাদিককে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে রাখে এবং ধরে নিয়ে ঢাকা থেকে বিমানে করাচি পাঠিয়ে দেয়। দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তল্লাশি অভিযান এগিয়ে সেখানে রয়ে যেতে সমর্থ হন ২৬ বছর বয়সি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সায়মন ড্রিং। তিনি যুদ্ধ

উপদ্রুত ঢাকার লড়াইয়ের চাক্ষুষ বিবরণ জানাতে সমর্থ হন। একপর্যায়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। ব্যাংকক থেকে বাংলাদেশে সশস্ত্র যুদ্ধের ওপর যে প্রতিবেদন পাঠান, তাতে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারেন বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার ঘটনা। ৩০ মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিস্তারিত বিবরণ ছিল। যার ফলে গণহত্যার বিষয়টি দখলদারদের পক্ষে আর চেপে রাখা সম্ভব হয়নি।

লন্ডনের সাপ্তাহিক 'ইকোনমিস্ট' নামক সাময়িকী ৩০ এপ্রিল লিখেছিল 'বন্দুকের মুখে ঐক্য' শিরোনাম। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গৃহযুদ্ধের পথ বেছে নিলেও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন না। সাময়িকী পত্রের মধ্যে টাইম, নিউজউইক, ইকোনমিস্ট, নিউজ ভারতম গ্লোব অ্যান্ড মেইল (টরেন্টো), ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার পাশাপাশি কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ, সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকাও পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট নিয়ে অনেক প্রতিবেদন ছেপেছে। কলকাতা থেকে অনেক লিটল ম্যাগাজিনও বেরিয়েছে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক। প্রথম প্রকাশিত হয় একাত্তরের এপ্রিলে আশিস সান্যাল সম্পাদিত 'ঘোড়সওয়ার'। সেখানে সব কবিতাই ছিল বাংলাদেশকেন্দ্রিক, হানাদারদের বর্বরতার উল্লেখে কলকাতায় শিল্পী, সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকরাও ছিলেন সক্রিয়। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুদ্ধরত অঞ্চল সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন লিখতেন কলকাতার সাংবাদিকরা।

বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অবরুদ্ধ দেশে অনেক সাংবাদিকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষাবলম্বন করে। বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িত ছিল দুই সাংবাদিক। বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড হলেও তারা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ও অবদান হাতেগোনা। দালাল আইনে অনেক সাংবাদিক গ্রেফতার ও সাজা পেয়েছেন। চীনাপন্থি সাংবাদিকরা পাকিস্তানি জান্তা শাসকের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল। দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও কতিপয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখায় সচেষ্ট ছিল। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভাবাদর্শের প্রতিফলন স্বাধীনতা-পরবর্তী সংবাদপত্রেও দেখা যায়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালে যদি ফিরে তাকাই দেখব, একাত্তরে আমাদের সাংবাদিকদের একটা অংশের মনোজগতে পাকিস্তানি চিন্তাচেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান কোনোভাবেই সংকুচিত হয়নি। বরং দিনদিন তা বেড়েছে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা কিংবা পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার প্রকল্প এসব সংবাদপত্র ও সাংবাদিককে তাড়িত করে।

মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের এই সুবর্ণ সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সগর্বে বলতে পারি–ষাটের দশকে আমাদের সংবাদপত্র স্বাধিকার প্রশ্নে সোচ্চার ছিল। শেখ মুজিবের ছয় দফার সমর্থন না করলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণী না ছেপে পারেনি পাঠকবিমুখতার আতঙ্কে। ৫০ বছর আগে বিদেশি সংবাদ সাময়িকী পত্র এবং সাংবাদিকরা যে ভূমিকা রেখেছেন স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে, তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তারা বাঙালির অহংকার ও গৌরবকে মহিমান্বিত করেছেন।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

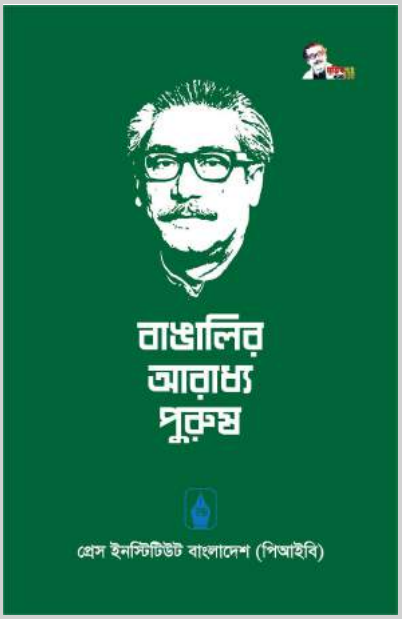

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা